পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভর করিয়া ইহারা জয়ী হইলেন, যার বলে বিজ্ঞান আজ বলিতেছেন, "বর্ত্তমানকালে সকল জীবই পূর্ব্ববর্ত্তী জীব হইতে উৎপন্ন হয়, কোন জীব যে কেবল মাত্র মৃত জড় পদার্থ হইতেই উৎপন্ন হয়, তার প্রমাণ নাই"— এই পরীক্ষাটী কি রূপে করিতে হয়? সের টাক জল ধরে এমন দুইটী ফ্ল্যাস্কের * (flask) আবশ্যক। এদের প্রত্যেকটীর মধ্যে পো দেড়েক খড় পচা কি শুষ্ক ঘাস পচা জল কিম্বা কোন শাক শবজী বা মাংসের যুষ রাখ। তারপর ঐ দুই ফ্ল্যাস্কের মধ্যস্থিত ঐ জল কি যুষকে আধঘণ্টাটাক ধরিয়া ভাল করিয়া অগ্নির উত্তাপে ফুটাও। ফুটাইবার প্রয়োজন এই যে, ঐ জল কিম্বা যুষে এবং ফ্ল্যাস্ক দুটীর ভিতরে শূন্য অংশে যা কিছু জীব বা জীবের বীজ আছে, তা মরিয়া যাইবে। (আবশ্যকীয় উত্তাপে সকল প্রকার জীব ও জীবের বীজ মরিয়া যায়।) তার পর জীব-শূন্য একটু পরিষ্কার তুলা ঐ দুইটীর মধ্যে একটী ফ্ল্যাস্কের মুখে সাবধানে সংন্যস্ত কর। অপরটীর মুখ খোলাই রহিল। এখন ফ্ল্যাস্ক দুটীকে চার পাঁচ দিন ধরিয়া কোন স্থানে রাখিয়া দাও। চার পাঁচ দিন পরে দেখা যাইবে যে, যে ফ্যাস্কের মুখে তুলা ছিল, সে ফ্ল্যাস্কের অভ্যন্তরস্থ জল কিম্বা যুষে কোন জীবেরই আবির্ভাব হয় নাই; কিন্তু যেটীর টেরিয়ার (ব্যাকটেরিয়া অতিক্ষুদ্র চক্ষের অগোচর আনুবীক্ষণিক উদ্ভিদ; ইহাদের অতিক্ষুদ্র, অদৃশ্য, আনুবীক্ষণিক বীজ— spores—রাশি রাশি ঘরে দ্বারে বাহিরে সকল স্থানের বায়ুতে আছে) সঞ্চার হইয়াছে। এরূপ বিভিন্ন ফল কেন ফলিল? একটু তুলার যোগাযোগ ছাড়া ঐ দুইটী ফ্ল্যাস্ককে সর্ব্বতোভাবে সমান অবস্থায় প্রথম থেকেই রাখা হইয়াছে। আর ঐ তুলার ভিতর দিয়া ফ্ল্যাস্কের ভিতর বায়ু বেশ গমনাগমন করিতে পারে, তবুও কেন যে ফ্ল্যাস্কের মুখে তুলা ছিল, তার ভিতর কোন জীবের আবির্ভাব হইল না, আর যে ফ্লাস্কের মুখে তুলা দেওয়া যায় নাই, তার ভিতর জীবের সঞ্চার হইল? ইহার কারণ আর কিছুই নয়, কেবল এই যে, তুলার ভিতর দিয়া যদিও বায়ু যাইতে পারে, তথাপি ব্যাকটেরিয়ার বীজ—যদিও আনুবীক্ষণিক—যাইতে পারে না, তারা আটকাইয়া যায়। সুতরাং যে ফ্ল্যাস্কের মুখে তুলা ছিল, তার অভ্যন্তরে তুলার ভিতর দিয়া বাহিরের বায়ু যাইতে পারিত, কিন্তু বাহিরের বায়ুতে যে অসংখ্য ব্যাকটেরিয়ার বীজ আছে, সে বীজ যাইতে পারিত না, আটকাইয়া যাইত; তুলা এখানে উক্ত বীজ সম্বন্ধে ঠিক যেন ছাকনি বা চালুনীর মত কাজ করে। ইহার ফল এই হইল যে, যে ফ্ল্যাস্কের মুখে তুলা দেওয়া হইয়াছিল,

এই পরীক্ষাটী হইতে পাঠক কি সিদ্ধান্ত করিতে পারেন? কেবল এই সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে, যদি কোন জল, যূষ, বা স্বেদ, ক্লেদ পূর্ব্বে সম্পূর্ণরূপে জীব এবং জীব-বীজ শূন্য করা যায় এবং পরেও তার মধ্যে বহির্দ্দেশ হইতে কোন জীব বা জীব-বীজের প্রবেশ-পথ সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ করা যায়,তাহা হইলে উক্ত জল, যূষ বা স্বেদ, ক্লেদে কোন জীবের উৎপত্তি হয় না। পরীক্ষাটী এবং পরীক্ষোপরি সংস্থিত যুক্তির মূল প্রণালী অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইল। কিন্তু পরীক্ষাটী যত মনে হয়, তত সহজ নয়। এতে কৃতকার্য্য হইতে হইলে, এ সম্বন্ধে অতি সামান্য সামান্য বিষয়ে (detailsএ) বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। ব্যাষ্টিয়ানের এ সতর্কতা ছিল না, তাই তিনি ভ্রমে পড়িয়াছিলেন। যাহা হউক, আমরা দেখিতেছি, ... উদ্ভিদ; সুতরাং ... নিকৃষ্টতম

"আমরা যতদূর জানি, তাহাতে বর্ত্তমান কালে পূর্ব্ববর্ত্তী জীব হইতেই জীবের উৎপত্তি দেখিতেছি। বর্ত্তমানে মৃত জড় পদার্থ হইতে যে কোন জীবের উৎপত্তি হয়, তার প্রমাণ নাই।"

পাঠক দেখিবেন, কি সতর্কতার সহিত বিজ্ঞান ঐ কথাগুলি বলিতেছেন। 'যতদূর জানি তাহাতে', 'বর্ত্তমানকালে', 'প্রমাণ নাই' এ কথাগুলি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াই বিজ্ঞান ব্যবহার করিতেছেন। পাঠক বিশেষ করিয়া দেখিবেন যে, বিজ্ঞান এ কথা বলিতেছেন না যে, বর্ত্তমানে মৃত জড়পদার্থ হইতে জীবের উৎপত্তি হয় না; খালি বলিতেছেন যে, বর্ত্তমানে মৃত জড়পদার্থ হইতে যে জীবের উৎপত্তি হয়, তার প্রমাণ নাই। এ দুই কথা ঠিক এক নয়। পাঠক আরও দেখিবেন, বর্ত্তমানকালে জড় হইতে জীবের উৎপত্তি দেখা যায় না বলিয়া বিজ্ঞান কিছু এ কথা বলিতেছেন না যে, পৃথিবীর জন্ম হওয়া অবধি কোন কালে কখন জড় হইতে জীবের উৎপত্তি হয় না। না, এ কথা বলিবার বিজ্ঞানের কোন অধিকার নাই, ... বলেনও না। বিজ্ঞান বরং ঐ দিকেই ... ইঙ্গিত করিতেছেন

[illegible]

মূহের [illegible]

নয়, কিন্তু একটা অমূল্য বৈজ্ঞানিক সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে; যে ক্রমবিকাশবাদ মানবের চিন্তা জগতে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে, এবং প্রত্যেক উচ্চ চিন্তার অস্থি মজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে; সেই ক্রমবিকাশবাদ দেখাইতেছে যে, এ পৃথিবী চিরদিনই পশু পক্ষী, বৃক্ষ লতায় সুশোভিত রমণীয় ধরা ছিল না, কিন্তু একদিন কেবল উত্তপ্ত বাষ্পরাশি ছিল। সে উত্তপ্ত বাষ্পরাশিতে জীবন অসম্ভব। এ উত্তপ্ত বাষ্পময় পৃথিবী অপেক্ষাকৃত শীতল হইল, জলের প্রথম আবির্ভাব হইল, তবে পৃথিবী জীব আবাসের উপযোগী হইল। প্রথম আদি জীব বোধ হয় একবিন্দু স্বচ্ছজেলির মত অণুবীক্ষণিক জীব যে 'অ্যামিবা' (Amœba) সেইরূপ এক প্রকারের জীব ছিল। সে যাহা হউক, এ আদি জীব পৃথিবীতে কোথা হইতে আসিল? আকাশ হইতে আসিল, না ঈশ্বর একদিন পৃথিবীতে আসিয়া মাটীতে ফুৎকার দিয়া নিমেষে জীবের সঞ্চার করিয়া গেলেন? আমরা এ সব অমূলক কল্পনায় বিশ্বাস করিতে পারি না। ক্রমবিকাশবাদে বিশ্বাস করিয়া আমরা এ বিশ্বাস করিতে বাধ্য যে, একদিন নিশ্চয়ই জড় হইতেই জীবের উৎপত্তি হইয়াছিল। পাঠক শুনুন, জীবনতত্ত্ব-বিশারদ সত্য-প্রাণ হক্সলি এ সম্বন্ধে কি বলিতেছেন:—"If the hypothesis of evolution is true, living matter must have arisen from not-living matter; for by the hypothesis the condition of our glove was at one time such that living matter could not have existed in it, life being entirely incompatible with the gaseous state" ইহার মর্ম্ম এই:—"ক্রমবিকাশবাদ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে জীবন্ত পদার্থ একদিন নিশ্চয়ই জড়পদার্থ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। কেন না, ঐ ক্রমবিকাশবাদই বলিতেছে, আমাদের এ পৃথিবীর অবস্থা একদিন এরূপ ছিল যে, তাহাতে জীবন্ত পদার্থ কখন থাকিতে পারিত না, যেহেতু নিরবচ্ছিন্ন বাষ্পময়গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব।"

পৃথিবীতে প্রথমে মৃত জড়পদার্থ হইতেই যে জীবের উৎপত্তি হইয়াছিল, এ বিশ্বাস আরও দৃঢ়ীভূত হয়, যখন আমরা এ বিষয়ের আরও আলোচনা করি। পাঠক দেখুন, বিচিত্রলীলা-পূর্ণ এই যে জীবজগৎ, এ জীবজগতের মূলে প্রোটোপ্ল্যাজম (Protoplasam)। তরুলতা, পশু পক্ষী সকল জীবদেহের মূলে ঐ আদি জীবন্ত উপাদান—প্রোটোপ্ল্যাজম। এই যে আপনার, আমার দেহ, এ দেহ আজ যেন অপরিবর্ত্তিত, বিশুদ্ধ প্রোটোপ্ল্যাজম (যেমন রক্তের শ্বেত কণিকা) রূপান্তরিত প্রোটোপ্ল্যাজম (যেমন মাংসপেশী,) এবং প্রোটোপ্ল্যাজম-প্রসূত দ্রব্য (যেমন চুল, নখ, অস্থি প্রভৃতি) এই সকলের সমষ্টি; কিন্তু এমন সময় ছিল, যখন (মাতৃগর্ভে) এ দেহ কেবল একটু অপরিবর্ত্তিত বিশুদ্ধ প্রোটোপ্ল্যাজম ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। এই বর্ত্তমানকালে এমন শত শত নিকৃষ্টতম জীব আছে, যাদের দেহ জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত আর কিছুই নহে, কেবল একটু বিশুদ্ধ প্রোটোপ্ল্যাজম মাত্র। আরও দেখুন, জীবের আহার, পরিপাককরণ, চলন, জনন, চিন্তন এ সকল ক্রিয়াও মূলতঃ ঐ প্রোটোপ্ল্যাজমেরই ক্রিয়া। তাই আমরা বলিতেছিলাম, জীবজগতের মূলে প্রোটোপ্ল্যাজম। সেই জন্যই পৃথিবীতে জীবের প্রথম আবির্ভাব, আর পৃথিবীতে প্রোটোপ্ল্যাজমের প্রথম আবির্ভাব, এ দুই কথা সম্পূর্ণরূপে এক কথা। পৃথিবীতে জীবের উৎপত্তি প্রথমে কোথা হইতে হইল, এ অনুসন্ধানও যা, আর পৃথিবীতে প্রোটোপ্ল্যাজমের উৎপত্তি প্রথমে কোথা

হইতে হইল, এ অনুসন্ধানও ঠিক তাই। এখন দেখুন, এই প্রোটোপ্লাজম অনুবীক্ষণে দেখিতে স্বচ্ছ জেলির মত; তবে চর্ম্মচক্ষে ভাল ঘৃত যেমন দানা দানা (granular) দেখায়, প্রোটোপ্ল্যাজমও অনুবীক্ষণে দেখিলে সচারাচার সেইরূপ দানা দানা দেখায়। যাহা হউক,এই প্রোটোপ্ল্যাজমে এমন কোন ভূত অর্থাৎ মৌলিক উপাদান (element) দেখা যায় না, যা পৃথিবীর অন্যত্রে ভূরি পরিমাণে নাই। রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা জানা গিয়াছে যে, প্রোটোপ্ল্যাজম প্রধানতঃ অঙ্গার, অম্লজান, যবক্ষারজান, উদজান, একটু গন্ধক ও একটু ফস্‌ফরস্ এই কয়েকটী মৌলিক উপাদানে নির্ম্মিত। আরও, ইহাতে এমন কোন শক্তির কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না,যা প্রাকৃতিক শক্তি নয়। তবে এ কথা সত্য যে, ঐ প্রাকৃতিক শক্তি নিচয় ইহাতে অতি জটিল ভাবে কার্য্য করে। যদি তাহাই হইল—যদি প্রোটোপ্ল্যাজমের মৌলিক উপাদান পৃথিবীর সর্ব্বত্র সচারাচার পরিদৃষ্ট হয়, এমন কতকগুলি মৌলিক উপাদান হইল; যদি ইহা কেবল প্রাকৃতিক শক্তি নিচয়েরই জটিল ক্রিয়া-ভূমি হইল, তাহা হইলে ইহা যে একদিন মৃত জড়পদার্থ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল, তা আর বিন্দুমাত্র অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। এখানে পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যদি প্রোটোপ্ল্যাজম কি কি ভূতে নির্ম্মিত, তা জানা গিয়াছে, এমন কি কোন্ ভূত কত পরিমাণে আছে, তাও জানা গিয়াছে, তবে সেই সকল ভূত হইতে রসায়ণশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত তাঁর ল্যাবরেটরিতে প্রোটোপ্ল্যাজম প্রস্তুত করিতে পারেন না কেন? প্রশ্নটী অতি সঙ্গত। উত্তর এই যে, কোন জৈবিক যৌগিক পদার্থ (Compound organic substance) কি কি মৌলিক উপাদানে নির্ম্মিত, এটা জানিলেই, সে পদার্থ টীকে উহার উপাদান হইতে ল্যাবরেটরিতে প্রস্তুত করা যায় না। ঐ যৌগিক পদার্থের উৎপত্তির অন্যান্য অবস্থা, বিশেষতঃ উহার মৌলিক উপাদানগুলির পরমাণু নিচয় উহাতে কি প্রকারে সন্নিবিষ্ট, এই সন্নিবেশের একটা প্রকৃত ভাব জানা চাই। তবে ঐ যৌগিক পদার্থকে উহার মৌলিক উপাদানগুলি হইতে প্রস্তুত করা যাইতে পারে। প্রোটোপ্ল্যাজম একটা অতি জটিল যৌগিক পদার্থ। ইহাতে ইহার মৌলিক উপাদান নিচয়ের পরমাণুগুলি কিরূপে সন্নিবিষ্ট, তৎসম্বন্ধে কোন আভাস এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সেই জন্যই রসায়ণশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত তাঁর ল্যাবরেটরিতে বসিয়া প্রোটোপ্ল্যাজম প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। মনে করুন, একটী অতি প্রকাণ্ড বাটী—যাতে সর্ব্বতোভাবে এক প্রকারের, কিন্তু রাজমিস্ত্রীর নানা কারুকার্য্যযুক্ত, অতি বিচিত্র শত শত ঘর আছে—এমন একটী প্রকাণ্ড বাটী নির্ম্মাণার্থে দুই কোটী, সচরাচার ব্যবহৃত এগার ইঞ্চি ইট, পঁচিশ লক্ষ সচরাচার ব্যবহৃত টালি, সহস্র মণ শেগুণ কাঠ, আর পাঁচ শত মণ লোহার বণ্টু লাগিয়াছে,—শুধু এইটী জানিলেই বাটী নির্ম্মাণের অন্যান্য অবস্থা বিশেষতঃ একটী ঘরে ('একটী', কেন না সব ঘরগুলি সর্ব্বতোভাবে সমান) তার ইট, টালি, কাঠ, বণ্টু কিরূপে সন্নিবিষ্ট, ইহা না জানিয়া, কি ঠিক ওরূপ আর একটী বাটী নির্ম্মাণ করা যায়? কখনই না। প্রোটোপ্ল্যাজম সম্বন্ধেও ঠিক তাই।

রসায়ণশাস্ত্র প্রোটোপ্ল্যাজ্‌মের মৌলিক

উপাদানগুলি হইতে প্রোটোপ্লাজ্‌ম প্রস্তুত করণে আজ অসমর্থ। কিন্তু কে বলিবে, উহা চিরদিন অসমর্থ থাকিবে? কে বলিতে পারে যে, সহস্র বৎসর পরেও রসায়ন শাস্ত্র প্রোটোপ্ল্যাজ্‌মের মৌলিক উপাদান গুলি হইতে প্রোটোপ্ল্যাজম প্রস্তুত করিতে পারিবে না? বিগত পঞ্চাশ বৎসর মধ্যে রসায়ণ বিদ্যা এ সম্বন্ধে যে সকল বিজয়কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছে, তাহা দেখিয়া সকলেই বলিবেন যে, একদিন যে উক্ত বিদ্যা বর্ত্তমানের এই অলৌকিক কার্য্য সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তা অসম্ভব নয়। পাঠক দেখুন, সিট্রিক অ্যাসিড্ (citric acid) নামক একটী যৌগিক পদার্থ পাতি, কাগজী ও কমলা লেবুর রসে পাওয়া যায়। ঐ সকল ফলের অম্লত্ব ঐ পদার্থেরই দরুণ। ঔষধাদিতে ব্যবহৃত হয় বলিয়া উক্ত অ্যাসিড্, ইক্ষুরস হইতে যেমন মিশ্রী প্রস্তুত হয়, সেইরূপ কাগজী লেবুর রস হইতে বহু পরিমাণে প্রস্তুত হয়। ইহা দেখিতে অনেকটা মিশ্রীর দানার মত। যাহা হউক, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে সকলে মনে করিত যে, উক্ত অ্যাসিড্ কেবল উদ্ভিদ জগৎ বা প্রাণীরাজ্য হইতেই উৎপন্ন হইতে পারে; তখন সকলেই মনে করিত যে, রসায়ণ-বিদ্যা উক্ত আসিড্ কেবলমাত্র উহার মৌলিক উপাদান নিচয় (অঙ্গার, অম্লজান, উদজান) হইতে, কোন লেবুর রস বা অন্য কোন ঔদ্ভিদিক বা জান্তব রস বা দ্রব্য না লইয়া প্রস্তুত করণে অসমর্থ। আজ কিন্তু বিজয়ী রসায়ণ-শাস্ত্র উক্ত অ্যাসিড্, কেবলমাত্র উহার মৌলিক উপাদান নিচয় হইতে, অর্থাৎ অঙ্গার আর অম্লজান, উদজান নামক তুটী গ্যাস হইতে প্রস্তুত করণে সমর্থ। আরও দেখুন, নীল (Indigo) একটী উদ্ভিদজাত যৌগিক পদার্থ। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কে ভাবিত যে,রসায়ণশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ঠিক ঐ নীল কোন তরু লতা বা অন্য কোন জীবের কোন অংশ বা সাহায্য না লইয়া, কেবলমাত্র উহার মৌলিক উপাদান সমুহের অর্থাৎ অঙ্গার আর অম্লজান, উদজান, যবক্ষারজান নামক তিনটী গ্যাসের সংযোগে নিজের ল্যাবরেটরিতে বসিয়া প্রস্তুত করিবেন? আজ কিন্তু তাহা করিতে পারেন। এইরূপে সিট্রিক অ্যাসিড্, নীল প্রভৃতি শত শত জৈবিক যৌগিক পদার্থ (Organic oubstances)—যা পঞ্চাশ বৎসর পুর্ব্বে সকলেই মনে করিত, কেবল তরু লতা, পশু পক্ষী হইতেই উৎপন্ন হইতে পারে; যা পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে সকলেই মনে করিত, উহাদের স্ব স্ব মৌলিক উপাদান নিচয় হইতে প্রস্তুত করণে রসায়ণ শাস্ত্র অসমর্থ—এইরূপ শত শত জৈবিক যৌগিক পদার্থ আজ উক্ত শাস্ত্র কেবলমাত্র উহাদের মৌলিক উপাদান নিচয় হইতে, কোন জীবজ পদার্থের কোন অংশ না লইয়া, কোন সাহায্য না লইয়া অনায়াসে প্রস্তুত করণে সক্ষম। এই সে দিন রসায়ণ বিদ্যা দ্রাক্ষা শর্করা (grape sugar, যে চিনি দ্রাক্ষা ফলে পাওয়া যায়, আর যার জন্য ঐ ফলের মিষ্টতা) উহার মৌলিক উপাদান নিচয়—অঙ্গার, অম্লজান, উদজান—হইতে কোন দ্রাক্ষার, কোন ঔদ্ভিদিক বা জান্তব কোন পদার্থের কোন অংশ বা সাহায্য না লইয়া ল্যাবরেটরিতে প্রস্তুত করিল। এই সকল দেখিয়া কে বলিতে সাহসী হইবেন যে, রসায়ণ শাস্ত্র একদিন প্রোটোপ্ল্যাজ্‌মও, ঐরূপে, অর্থাৎ কেবলমাত্র উহার মৌলিক উপাদানগুলি হইতে, কোন জীবের কোন

অংশ বা কোন সাহায্য না লইয়া প্রস্তুত করিতে পারিবে না?

আরও দেখুন যে অদ্ভুত কার্য্য—মৌলিক উপাদান হইতে প্রোটোপ্লাজ্‌ম প্রস্তুত করণ—আজ মানবজ্ঞানের অতীত, যা আজ মানবের সুতীক্ষ্ণ জ্ঞানদৃষ্টিকে পরাভব করিয়াছে—বর্ত্তমানের সেই অলৌকিক কার্য্য উদ্ভিদ জগৎ এই মুহূর্ত্তে আমাদের চক্ষের সম্মুখে সংসাধন করিতেছে। মাটী, জল, বায়ু হইতে এই মুহূর্ত্তে উদ্ভিদ-জগৎ শত শত মণ প্রোটোপ্লাজ্‌ম প্রস্তুত করিতেছে। *এই যে সম্মুখস্থ প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ,* ইহাতে অন্ততঃ দুই তিন মণ বিশুদ্ধ অরূপান্তরিত প্রোটোপ্লাজ্‌ম উহার জৈবনিক কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। কিন্তু ঐ বৃক্ষস্থ এত *প্রোটোপ্লাজ্‌ম কোথা হইতে আসিল?* পাঠক একবার ভাবুন দেখি। শত বৎসর পূর্ব্বে ঐ বৃক্ষ একটী অতি ক্ষুদ্র বীজ ছিল। ঐ ক্ষুদ্র বীজাভ্যন্তরস্থ বিন্দুপ্রায় প্রোটোপ্লাজ্‌ম ধীরে ধীরে চতুষ্পার্শ্বস্থ মাটী, বায়ু, জল হইতে অযুত, অগণ্য পরামাণু সংগ্রহ করিয়া, তাহাদিগকে স্বীয় গূঢ় প্রণালীতে এক অনবগাহ্য ভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়া নূতন প্রোটোপ্লাজ্‌মে পরিণত করিয়াছে। এইরূপে আমরা দেখিতেছি, মাটী, জল, বায়ু হইতেই পূর্ব্বোক্ত দুই তিন মণ প্রোটোপ্লাজ্‌মম নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে পূর্ব্ববর্ত্তী বীজাভ্যন্তরস্থ বিন্দুপ্রায় প্রোটোপ্লাজ্‌মের কর্ত্তৃত্ব থাকুক, কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, মাটী, জল, বায়ুর পরমাণুই এক গূঢ়ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়া প্রোটোপ্লাজ্‌ম হইয়াছে। ইহা দেখিয়া ঘোর ভূত কালে অনবগাহ অবস্থা সমূহের সমাবেশে এক সময়ে মাটী, জল, বায়ু হইতেই যে প্রথমে পৃথিবীতে আদি প্রোটোপ্লাজমের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা অসম্ভব, কে বলিবে?

সকল কুসংস্কার, অমূলক বিশ্বাস দূরে ফেলিয়া দিয়া, সত্য-প্রাণ হইয়া আমরা যখন দেখি, এ পৃথিবীর উত্তপ্ত শৈশবাবস্থায় ইহাতে কোন জীব ছিল না, থাকিতে পারে না; যখন দেখি, তার পর পৃথিবী অপেক্ষাকৃত শীতল হইলে ইহাতে প্রোটোপ্ল্যাজমের বা নিকৃষ্টতম জীবের প্রথম সঞ্চার হইল; যখন দেখি, ঐ প্রোটোপ্ল্যাজমে এমন কোন *মৌলিক উপাদান নাই যা পৃথিবীর অন্যত্র* প্রচুর পরিমাণে নাই, এবং ঐ প্রোটোপ্লাজম এমন কোন শক্তির ক্রিয়া ভূমি নয় যা প্রাকৃতিক শক্তি নয়; যখন দেখি, রসায়ণবিদ্যার উন্নতির সহিত ভবিষ্যতে এক দিন ঐ প্রোটোপ্লাজম উহার মৌলিক উপাদান নিচয় হইতে কোন জীবের কোন অংশ বা সাহায্য ব্যতীত ল্যাবরোটরিতে প্রস্তুত হইতে পারে; যখন দেখি, এই মুহূর্ত্তে আমাদের চক্ষের সম্মুখে উদ্ভিজ্জগতে মাটী, জল, বায়ু এক গূঢ় অনবগাহ্য **সন্নিবেশন** প্রভাবে প্রোটোপ্লাজমে পরিণত হইতেছে;—যখন এই সকল দেখি, তখন আমরা বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারি না—বাস্তবিক বিশ্বাস করিতে বাধ্য হই যে, ঘোর ভূতকালে বিশেষ অবস্থা সমূহের সমবায়ে একদিন জড় হইতেই এ পৃথিবীতে আদি প্রোটোপ্লাজমের বা জীবের উৎপত্তি হইয়াছিল।

প্রিয় পাঠক, এখন আমরা একি দেখিতেছি! বিজ্ঞানের স্বাতন্ত্র্য-বিনাশী সুতীব্র আলোকে এ বিশ্ব সংসার যে রূপান্তরিত প্রতীত হইতেছে! আমরা যে দেখিতেছি, প্রকৃতির অন্তস্তলে জীব জগৎ ও জড় জগৎ

একীভূত! দেখিতেছি এক অতি গভীর সার্ব্বভৌমিক একত্ব এ বিচিত্র বৈষম্যপূর্ণ বিশ্বের সমস্ত খণ্ড অস্তিত্বকে এক অতি গূঢ়, অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে বাঁধিয়া রাখিয়াছে!!

শ্রীশশি ভূষণ মিত্র।

স্বদেশ-প্রেম।

কি সভ্য কি অসভ্য, পৃথিবীর প্রায় সমুদয় জাতির ইতিহাসে স্বদেশ-প্রেমিকতার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। মানুষের অন্যান্য বৃত্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই বৃত্তিটিরও বিকাশ স্বাভাবিক। কিন্তু অপ্রকৃত অবস্থায় পড়িলে ইহার ব্যতিক্রমও লক্ষিত হয়। আনুষঙ্গিক অবস্থার প্রতিকূলতা ও অনুকূলতার উপর যেমন মানবের অন্যান্য বৃত্তির সম্যক বা আংশিক পরিস্ফুটন, অথবা একবারেই অবিকাশ নির্ভর করে, স্বদেশ-প্রেম-বৃত্তির ক্রম-বিকাশও তদ্রূপ। যে জাতি চিরদিন স্বাধীনতার মুক্ত বায়ুতে জাতীয় জীবন পরিগঠিত ও পরিবর্দ্ধিত করিতেছে, তাহার অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে স্বদেশ-প্রেম জাগ্রত। স্বদেশের জন্য ধন মান জীবন পর্য্যন্ত অকাতরে দান করিতে কখনই কেহ বিমুখ হয় না। স্বদে- [illegible] স্বার্থ যদি প্রতিহত হয়, স্বদে- [illegible] গৌরব যদি ক্ষুণ্ণ হয়, স্বদেশের [illegible]দি "একটু চূণ খসিয়া পড়ে," [illegible]র হৃদয়ে অমনি ব্যথা লাগে। [illegible]তা বাস্তবিকই কল্পনার কথা [illegible]ন দয়া, দাক্ষিণ্য, ভক্তি, শ্রদ্ধা, [illegible]গ, স্নেহ, মমতা মনুষ্য হৃদয়ের [illegible]দেশ-প্রেমও তেমনি একটি। [illegible]য়ত আমাদের জাতীয় জীবনে [illegible] বিকাশ দেখিতে পাই না। [illegible] উত্তেজনায় আত্ম বিসর্জ্জন, এ দৃষ্টান্ত আমাদের জাতির মধ্যে একেবারেই বিরল। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা কখনই মনে করিতে পারি না, স্বদেশপ্রেম আমাদের হৃদয়ের একটি ধর্ম্ম নহে। তবে কালে ও নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থায় আমাদের সেই বৃত্তিটিকে মুসড়াইয়া দিয়াছে। তাই আমরা স্বদেশের হিত তরে আত্ম বিসর্জ্জন জানি না। স্বদেশের তরে স্বার্থত্যাগ জানি না, স্বদেশের তরে ত্যাগ স্বীকার জানি না। স্বদেশের প্রতি একটা কর্ত্তব্য জ্ঞান, স্বদেশের প্রতি একটা স্বাভাবিক অনুরাগ, স্বদেশের মঙ্গল ও উন্নতির একটা প্রবল বাসনা, আমাদের হৃদয়ের কোন অংশকে কখন স্পর্শ করে কি না, সন্দেহ। আমরা ক্রমে শিক্ষিত হইতেছি, আমাদের মস্তিষ্কের জাতীয় গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেছি, অপহৃত জ্ঞান-রত্নের যথাসাধ্য উদ্ধার সাধনের জন্য আমরা এখন সচেষ্টিত; কিন্তু আমাদের হৃদয়ের সংকীর্ণতা এখনও মোচন করিতে পারিতেছি না। তাই আমাদের দেশে স্বদেশ-হিতৈষী লোক এত বিরল। তাই দেশ-হিতৈষণা বৃত্তি ফুটিয়ায় পরিস্ফুটিত হইতে পারিতেছে না। তাই যৌবনে যাঁর একটু দেশানুরাগ দেখা গেল, প্রৌঢ়ে তিনি একজন দেশ বিরাগী হইয়া বসিয়া রহিলেন।

অন্যূন সাতশত বৎসর আমরা স্বাধীনতা-রত্ন হারাইয়াছি। পরাধীনতা ও অত্যাচারের অধীনে, আজ এই এত শতাব্দী হইল, আমা-

দিগকে কোন এক প্রকারে আমাদের জীবন রক্ষা করিয়া আসিতে হইতেছে। এই সুদীর্ঘ কালে প্রতি একশত বৎসরে তিন তিন (যদিও প্রকৃততঃ প্রতি পঞ্চবিংশ বৎসরে নূতন বংশ জন্মগ্রহণ করে) ধরিলেও একবিংশ বংশ পর্য্যায়ক্রমে চলিয়া গিয়াছে। ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে ইহা কখনই সম্ভবপর বলিয়া বিবেচিত হইবে না যে, যে স্বদেশপ্রেম কেবল প্রশস্ত ও উদার হৃদয়ের ধর্ম্ম এবং যে হৃদয়ের প্রশস্ততা ও উদারতা স্বাধীনতায় প্রমুক্ত ও স্ফূর্ত্তভাবের ভিতরেই কেবল সম্ভব হয়, সে স্বদেশ-প্রেম স্ফূর্ত্ত হইবার অবকাশাভাবে, সে উচ্চ বৃত্তির আলোচনার সুবিধা বিনা, বংশ পরম্পরায় লোপ না পাইয়া মনুষ্য হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিবে। তাই আমরা আমাদের মধ্যে স্বদেশ প্রেমের অভাব দেখিয়া নিরাশ হই না। আমাদের আশা হয়, মস্তিষ্কের প্রসরতার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের প্রসরতা বর্দ্ধন করিতে পারিব। যে প্রেম এখন কেবল নিজের পুত্র কলত্র, পরিবার, স্বজন, নিজের সুখ সাচ্ছন্দ্য, স্বার্থ ও উন্নতি-স্পৃহার অতি সংকীর্ণ চতুঃসীমার ভিতরেই আবদ্ধ থাকিয়া আমাদিগকে পশু অপেক্ষা একপদ উন্নত হইতে দিতেছে না, সেই প্রেমকে ইচ্ছা ও অধ্যবসায় বলে ব্যাপক করিয়া বংশানুক্রমে অচিরে আবার স্বদেশ-প্রেমের অত্যুজ্জ্বল দেবভাবে পরিণত করিতে পারিব।

আমাদের বিশেষ দুর্ভাগ্য বশতঃ পরাধীনতার বন্ধন হইতে কখন যে মুক্ত হইব, তার সম্ভাবনা অতি সুদূরপরাহত। যাহা হউক, যখন আমরা এখন আমাদের প্রকৃত দুর্দ্দশার মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেছি, যখন পাশ্চাত্য অধিবাসীদের সংসর্গে আসিয়া স্বদেশ প্রেমের অতি উচ্চ ও সুন্দর ভাবের ছবি দেখিয়া মুগ্ধ-প্রাণ হইতেছি; তখন আমরা একদিকে জ্ঞানী ও শিক্ষিত বলিয়া পরিচয় দিয়া অপর-দিকে স্বদেশ-বিরাগী হই কিরূপে? আমাদের সে দিন চলিয়া গিয়াছে, যখন আমরা অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার সমাচ্ছন্ন ছিলাম। এখন আমরা শিক্ষিত বলিয়া অভিমান করি, কিন্তু এই অভিমান মূল্যহীন হইয়া পড়ে, যদি ইহার সহিত শিক্ষার অবশ্য-সম্ভব গুণগুলির সমবায় না হয়। আমরা এইরূপ শূন্যগর্ভ শিক্ষার অভিমান করি বলিয়াই কি নয় প্রকৃত শিক্ষিত জাতির বিদ্রূপের পাত্র হই?

পরাধীন হইলেও, প্রকৃত শিক্ষা কখনই হৃদয়ের উচ্চ বৃত্তিগুলিকে অপরিস্ফুট রাখিতে পারে না। আয়র্লণ্ড-বাসীগণ ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থল। আজ অষ্ট শত বর্ষ ব্যাপিয়াও যে হতভাগ্য আইরিশ জাতি স্বজাতির রুধিরপাতে অক্লান্ত উদ্যমে নিরত হইল না, ইহার প্রধান কারণ এই যে, আইরিশগণ প্রকৃত শিক্ষার রসাস্বাদন করিয়াছে। তাই স্বদেশের উন্নতি কল্পে সহস্র সহস্র জীবন উৎসাহ ও উত্তেজনাপূর্ণ প্রেমে প্রদীপ্ত। আমাদের এই হতভাগ্য দেশেও কি প্রকৃত শিক্ষার ফল কিছু দেখিতে পাই না? অবশ্য পাই। কিন্তু তাহা এতই অসন্তোষকর, এতই নিরাশাময় যে, আমরা বিষাদিত চিত্তে না ভাবিয়া থাকিতে পারি না, সে অগ্নিময় স্বদেশ-প্রেম এখনও ঢের দূরে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যুবকগণ যখন সংসারে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখন স্ব স্ব স্বার্থ চিন্তাতে এমনিই জর্জ্জর-প্রাণ হইয়া পড়েন যে, কেবল আপনার ও পরিজনের সুখ শান্তির পন্থোদ্ভাবন বই আর কোন ভাবনার রেখা কপালে পড়িতে

হইতে দেন না। দেশের কথা ভাবিবে কে, দেশের জন্য কাঁদিবে কে, দেশের জন্য শরীর পাত করিবে কে? যে কোন প্রকারে অর্থাগমের সুবিধা করিয়া স্বীয় ও স্বকীয় স্ত্রী পুত্রের সুখ স্বচ্ছন্দ নিরাপদে সম্পন্ন হইলেই জীবনের সার্থকতা হইল! যে দেশে এমন শিক্ষা, যে দেশে এমন উপাদানের লোকের অধিবাস, সে দেশে যে প্রকৃত স্বদেশ প্রেম বিরল হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি?

কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, কেবলি স্বার্থচিন্তায় নিমজ্জিত-প্রাণ হইয়া স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর প্রতি কর্ত্তব্য অবহেলা করা কি প্রকৃত মনুষ্যত্বের, প্রকৃত শিক্ষার অগৌরব করা হয় না? পরকবলিত দেশের শ্রীহীন, শোভাহীন সহস্র অভাবে নিপেষিত অবস্থা কি আমাদের মর্ম্মকে স্পর্শ করে না? কবির

"সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"

এই মর্ম্মস্পর্শী অনাহত ভেরী নিনাদে এখনও কি আমরা অসাড় থাকিব? সংকীর্ণ নীচ স্বার্থের পাশে আবদ্ধ হইয়া চিরদিন অধোগতি লাভ করিব? দেশ রসাতলে যাইবে? কেন না আমরা একটু স্বার্থত্যাগ করিয়া দেশের জন্য এক বিন্দু শোণিতপাত করিতে পারি? ইহা আমাদেরই দেশ; এখানে আমাদেরই জন্ম; এখানে আমাদেরই পূর্ব্ব পুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং এখানেই আমাদের ভাবী বংশধরগণও জন্মগ্রহণ করিবে। পূর্ব্বপুরুষগণের গৌরব ও সম্মান রক্ষার জন্য এবং ভবিষ্য বংশের কল্যাণ জন্য, আমরা কেন না এক বিন্দু প্রশস্তচেতা ও স্বার্থত্যাগী হইয়া দেশের মঙ্গল সাধনের জন্য যত্নপরায়ণ হইব? দূর দূর দেশে স্বদেশের হিত ও উন্নতি সাধনার্থ কত শত বীর প্রাণ অম্লান বদনে স্ত্রী পুত্র ধনজনের মায়া অকাতরে পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব জীবন দান করিতেছেন। এ দৃশ্য কত সুন্দর, এ দৃশ্য কত উপকারী।

কিন্তু আমরা এমনি কাপুরুষ ও অস্থির-প্রতিজ্ঞ, এতই নীচ স্বার্থ পাশে এবং এই অসার ক্ষণভঙ্গুর জীবনের মায়ায় বিজড়িত যে, দেশের কার্য্য সাধনে কৃত-সংকল্প ও বদ্ধপরিকর হইয়াও যদি কাহারও ভ্রূকুটি দেখি, অমনি সভয়ে স্বকার্য্য সাধন হইতে বিরত হই। কঠোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, উচ্চ কর্ত্তব্য-সাধন-জনিত সুবিমল আত্মপ্রসাদ কি আমাদের অনিত্য জীবনের মহামূল্য পুরস্কার স্বরূপ মনে করিতে পারি না? তুচ্ছ জীবনের মায়া, লোকের ভ্রূভঙ্গী এতই কি হইল? তবে আর স্বদেশ-প্রেম কোথায়? তবে আর স্বদেশ হিতৈষণা কি? তবে আর মনুষ্যের মনুষ্যত্ব কোথা?

ঐ শোন স্বদেশ প্রেমিক সংগীত তুলিয়াছেন—

"বধ্য মঞ্চপরে কিংবা রণস্থলে
মরি না যেখানে কি ভয় মরণে
মরিব যখন প্রিয় জন্মভূমি তরে।"

আমরাও কি একদিন স্বদেশ-প্রেমে উন্মত্ত-প্রাণ হইয়া এই উত্তেজনাপূর্ণ সংগীতের সহিত স্বর মিলাইয়া, এমনি মুক্ত কণ্ঠে, এমনি মুক্ত হৃদয়ে, এমনি উৎসাহ ভরে, এমনি জলন্ত প্রাণে, এমনি জীবনকে তুচ্ছ করিয়া এই অগ্নিময় অমর গান গাহিতে পারিব না?

এ দেশে স্বদেশের জন্য স্বার্থত্যাগ ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত নিতান্তই বিরল। আমরা স্বার্থপর জাতি; স্বার্থের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিয়া ঘুরিয়াই মরিয়া যাই। পরার্থপরতা, স্বদেশ-

হিতৈষণা, আমরা মনুষ্যের কর্ত্তব্যের মধ্যে করি না। নানা অপরিহার্য্য কারণে স্বদেশ-প্রেম আমাদের ভিতরে এখন নির্ব্বাপিত, কিন্তু সে বৃত্তি প্রস্ফুটিত করার নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের জন্য নিঃস্বার্থ অথচ অদম্য অনুরাগে প্রজ্বলিত হইতে না পারিলে, দেশের কোন মঙ্গল নাই, বিশেষ পরাধীন দেশের।

তাই আমরা প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে সানুনয়ে এই অনুরোধ করি, যেমন স্বকীয় পরিবার মধ্যে দয়া, স্নেহ, বাৎসল্য, প্রেম প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের সৎবৃত্তি গুলিকে সম্যক রূপে পরিচালনা করিয়া,উহাদের পূর্ণ বিকাশ সাধন করিয়া থাকেন,তেমনি স্বদেশ-প্রেম-প্রেমরূপ এই একটি উচ্চ ও সাধু বৃত্তিকে সম্যক পরিস্ফুট করিবার জন্য তাঁহারা যেন প্রতিদিন এক একবার দেশের দুরবস্থার কথা চিন্তা করেন। যার যতটুকু সাধ্য, ততটুকু পরিমাণেও যদি এদেশের জন্য করিয়া যাইতে পারি, ইহাতে যদিও সমগ্র দেশের কোন প্রত্যক্ষ উপকার নাও ঘটে, ইহাতে এই এক প্রধান লাভ হইবে যে, আমাদের জাতীয় এক উচ্চ বৃত্তির বিকাশ সাধন হইবে। যে বৃত্তি হারাইয়া আমরা আজ জগতের চক্ষে নিতান্ত হেয় ও অপদার্থ, যে বৃত্তিটির অবকাশ নিবন্ধন স্বাধীন ও স্বদেশ-প্রেমিক জাতির চক্ষে আমরা নিন্দনীয় ও উপহাসের পাত্র, যে বৃত্তির অভাব জন্যই আমরা দাসত্বের বোঝা অম্লান বদনে বহিতেছি, সেই স্বদেশপ্রেম, সেই স্বজাতি-বাৎসল্য আবার আমাদের হৃদয়ে জাগরূক হইবে এবং আমরা তখনই প্রকৃত উন্নতির সোপানে অবরোহণ করিতে পারিব।

আমরা তাই প্রত্যেক শিক্ষিতা মহিলাকে এই অনুরোধ করি, যখন জননী ফুল্ল-ফুল প্রফুল্ল-আনন কোমল শিশুকে স্তন-ধারা পান করাইবেন, তখন হইতে যাহাতে শিশুর প্রাণে অপর সদ্বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশ প্রেমও স্ফূর্ত্ত হয়, তদ্বিষয়ে যত্নশীলা হন। দয়া, ধর্ম্ম, জ্ঞান, নীতি, স্নেহ, প্রীতি প্রভৃতি সাধু বৃত্তিগুলি যেমন মানুষকে দেবতার মত করে, স্বদেশ-প্রেমও মানুষকে দেবভাব বই অন্য ভাবে ভূষিত করে না। সবাই জানেন, বীর প্রসবিনী রোমীয় মাতা-গণ সন্তানদিগকে যখন স্বদেশের জন্য রণ-ক্ষেত্রে প্রেরণ করিতেন, তখন স্নেহবৎসলা জননী স্বহস্তে পুত্রকে বর্ম্ম-ফলক অর্পণ করিয়া বলিয়া দিতেন, "বৎস! ইহা লইয়া ফিরিও, নতুবা ইহার উপরে শায়িত হইয়া আসিও।" অর্থাৎ হয়, রণে জয়ী হইয়া বর্ম্ম ফলক হস্তে ধারণ করিয়া বিজয়ীর মত সগর্ব্বে গৃহে প্রত্যাগমন করিও, নতুবা রণে আহত হইয়া ফলকোপরি শায়িত হইয়া চরম সৎকারের জন্য গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিও। সে বীরাঙ্গনাদিগের স্বদেশ-রাগ কত, যাঁহারা অকাতরে স্নেহের প্রতিমূর্ত্তি, বাৎসল্যের পরাকাষ্ঠারূপী আপন সন্তানদিগকে স্বদেশের জন্য কঠোর মৃত্যুর সদনে প্রেরণ করিতেও কাতর হইতেন না! স্বদেশ-প্রেমের এমন উজ্জ্বল, গভীর ও উন্মাদকারী ভাব কোমল-প্রাণা, সন্তান-বৎসলা রোমীয় জননীর হৃদয়ে যেমন সম্যক্ বিকাশ লাভ করিয়াছিল, হায় বিধি, কবে এই মৃত-প্রায় বঙ্গদেশে আবার সেইরূপ সুন্দর ভাবের দৃশ্য পরিদর্শিত হইবে! কবে শিক্ষিতা জননী সন্তানদিগকে দেশ-হিতত্তরে জীবন দান করিতে দিবেন, কবে শিক্ষিত সুসন্তান-গণ স্বদেশ প্রেমের অগ্নিময় উত্তেজনায়

উত্তেজিত হইয়া স্বদেশের জন্য জীবন শোণিত পাত করিতে মুহূর্ত্তের তরেও পশ্চাৎপদ হইবেন না! কবে আবার আমরা, স্ত্রী পুরুষ, স্বদেশের জন্য, স্বদেশবাসীর জন্য স্বার্থ-শূন্য, পবিত্র প্রাণে এই অসার জীবন পাত করিতে করিতে সহাস্য বদনে ও উৎসাহপূর্ণ প্রাণে গাহিতে পারিব।

মরিনা যেখানে কি ভয় মরণে
মরিব যখন জন্মভূমি তরে!

শ্রীশ্রীপতিচরণ রায়।

কেন কাঁদ ?

১

বহিল বসন্ত অনিল বঙ্গেতে
আহা কি মধুরতর!
বাজিল বাঁশরী বঙ্কিম অধরে
কি সুন্দর মনোহর!
কল্পনা-প্রসূত প্রসূন কতই
স্বর্গের সুষমা ধরি,
ফুটিতে লাগিল অতুল ছটায়
বঙ্গ প্রাণ মন হরি।
উল্লাসে উৎসাহে মাতিয়া উঠিল
বঙ্গ নরনারীগণ।
ছিল মরুময় বঙ্গের সাহিত্য
হ'ল সে নিকুঞ্জবন!

২

যাদুকর যেন কৌশলে দেখায়
কতই বিচিত্র ছবি,
তেমতি বিচিত্র চিত্র নব নব
ভাষায় আঁকিল কবি।
প্রতিভা-ছটায় অপূর্ব্ব শোভায়
গাঁথিয়া ঘটনাবলি,
'নভেলে'র ছলে নব রসে খেলে
করে কত চতুরালি!
কখন(ও) হাসায় কখন(ও) কাঁদায়
কখন(ও) আশার ছলে,
মাতাইয়া প্রাণ গায় বীরগান
"বন্দে-মাতরং"-ব'লে॥

৩

কভু ধর্ম্মসার— কভু কর্ম্মভার—
নিগূঢ় তত্ত্বের কথা—
বাখানে সুচারু সরল ভাষায়
ধরিয়ে নূতন প্রথা।
বাখানে আবার ইতিহাসবাণী
ভারত নির্ঘণ্ট করি—
কিবা অকলঙ্ক পূর্ণ নরদেব
ভারত কাণ্ডারী হরি।
নাহিক এমন সাহিত্য ভাণ্ডার
সুদৃষ্টি ছিল না যায়,
একা ছিল এক সহস্র জিনিয়া
ধীরেন্দ্র বীরেন্দ্র প্রায়।

৪

কোথা আজ তুমি কোথা সে তোমার
জ্ঞান পারিষদ যত,
গেলে কি ছাড়িয়া প্রিয় জন্মভূমি
পূরণ না হ'তে ব্রত?
কে পারিবে তব রাজদণ্ড নিতে
তিলক ধরিতে ভালে?
তোমার মতন সাধক রতন
পা'ব আর কত কালে?
বিহনে তোমার করে হাহাকার
বঙ্গ নর নারী আজ,
হে বঙ্গভূষণ প্রিয় অতুলন
বঙ্গের সাহিত্য-রাজ!

৫

ধন্য ক্ষণজন্মা জনমিলে ভাই
আজন্ম দুখিনী কোলে,
ভুলালে বঙ্গের নর নারীগণে
অমিয়া মধুর বোলে ;—
গেলে কীর্ত্তি রাখি চিরদিন তরে
এ ভারত মহীতলে !
দিয়ে জীবদান বাঙ্গালীর দেহে
জ্বালাইলে শিখা তায়,
জাগ্রত করিয়া বঙ্গ নারী নরে
ভাতিলে নব বিভায়।
আপনি গঠিলে আপনার দল
সোদর সদৃশ প্রেমে,
শত ডোর দিয়া হৃদয়ে বাঁধিলে
কত রবি চন্দ্র হেমে !

৬

সে মলয়ানিল সহসা থামিল
করাল বঙ্কিম-আয়ু,
সমূহ বাঙ্গালা কাঁদিয়ে আকুল
যেন হারা প্রাণ-বায়ু !
কেন কাঁদো বঙ্গ এ প্রাণীর তরে
এঁর যে মরণ নাই,
ধরার বিজলি এ জীবমণ্ডলী
এ নহে এঁদের ঠাঁই !
যে দেবমণ্ডলে মহাপ্রাণী দলে
জ্বলে চির জ্যোতির্ম্ময়,
হের কি শোভায় সেই দেবধামে
বঙ্কিম উদয় হয় !
পেয়ে যাঁর সঙ্গ পবিত্র এ বঙ্গ
গাও তাঁর চির জয়।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নব্যবঙ্গ।

নব্যবঙ্গ—সামাজিক উপন্যাস—কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রে শ্রীবিশ্বনাথ নন্দী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, বঙ্গাব্দ ১৩০০। গ্রন্থকারের নাম অপ্রকাশিত।

নব্যবঙ্গ একখানি সামাজিক উপন্যাস। উপন্যাস বলিয়া ইহার সকল অংশই ঠাকুরমার উপকথার ন্যায় অমূলক ঘটনা-সম্বদ্ধ নহে এবং বঙ্গের সাধারণ নভেলের ন্যায় মান্ধাতার আমলের রাজপুতানার বকেয়া রাজা রাণী রাজকন্যাদির আজগুবি গল্পে পূর্ণ নয়। ইহা বর্ত্তমান বঙ্গীয় সমাজাংশের একখানি চিত্র, সুতরাং অধিকাংশই সমূলক ঘটনা-সম্বদ্ধ। গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে এইরূপ প্রকাশও করিয়াছেন।

যাঁহারা আমাদের বর্ত্তমান সমাজের ভিতরে প্রবেশ করত দৈনিক ঘটনাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা অতি সহজে দেখিতে পাইবেন, গ্রন্থকার নিত্য-সংঘটিত অনেক জীবন্ত ব্যাপার অবলম্বন করিয়া উজ্জ্বল চিত্র আঁকিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কোন সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ দৃশ্য পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে ; যিনি যতটুকু পারেন, যদি এই ভাবে দেখাইতে যত্ন করেন, বিশেষ উপকার আশা করা যাইতে পারে। অনেকে মনে করিতে পারেন, এরূপ গ্রন্থ দ্বারা সুফলের সম্ভাবনা কোথায় ? পাঠকবর্গ মধ্যে কেহ আমোদের জন্য, কেহ সময় কাটাইবার জন্য, কেহ বা গ্রন্থকারের লিপিচাতুর্য্য পরীক্ষার্থ, কেহ বা গ্রন্থের দোষানুসন্ধান হেতু এই

শ্রেণীর পুস্তক পাঠ করিয়া থাকেন; আসল উদ্দেশ্যে কয়জন অধ্যয়ন করেন? যাঁহারা এরূপ ভাবেন, তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত যে, হৃদয়ের ভাব যাহা সমগ্র ইন্দ্রিয়াদির অগোচর, মুখের কথা যাহা শ্রুতমাত্র বায়ুতে বিলীন হইয়া যায়, তাহাও এ সংসারে বৃথা নষ্ট হয় না, তাহারও ছাপ অনন্তকাল পর্য্যন্ত বিশ্বসংসারে স্থায়ী; সে স্থলে সাদার উপর কালার আঁচড় কখনই বিফলে যাইবার জিনিস নয়; সহস্র পাঠকের মধ্যে একজনেরও হৃদয়ে একটু দাগ বসিলেই অনেক কাজ হইল, বুঝিতে হইবে। এক্ষেত্রে যিনি যাহা ভাল বুঝেন, তাঁহার উচিত সে বিষয় সরলভাবে অকুতোভয়ে লোক সমক্ষে প্রচার করিয়া যান; তারপর ফলাফল-দাতা বিশ্বভুবনের হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা ভগবান।

উপন্যাসের যে সকল উপকরণ চাই, তন্মধ্যে প্রকৃতি, স্থান, ঘটনা, নরনারী ও লোক-চরিত্রের বর্ণনা প্রধান। মধ্যে মধ্যে বর্ণনার কারিগরি দ্বারা চিত্ত আকৃষ্ট না হইলে, পাঠক উপন্যাস পড়িয়া সুখ পান না। সমালোচিত গ্রন্থখানিতে তাহার অভাব নাই। পাঠকগণের বিচারার্থ স্থান বিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। শব্দবিন্যাস ও রচনা-কৌশলে বর্ণনাগুলি কোন অংশে প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস-লেখকগণের লেখনীর নিকট নিতান্ত খাটো নয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ, ১-২ পৃষ্ঠা :—

"মধ্যাহ্ন কাল—চৈত্র মাসের মধ্যাহ্ন কাল। প্রখর রবিতাপে চতুর্দ্দিক প্রতপ্ত। দক্ষিণ বায়ু মধ্যে মধ্যে প্রবাহিত হইয়া তাপরাশিকে তীব্রতর করিয়া তুলিতেছে। পথিকদের কেহ তরুতল আশ্রয় করিতেছে, কেহ চটিতে গিয়া বিশ্রাম করিতেছে। রাখাল বৃন্দ আপন আপন গোপাল পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষছায়ায় উপবেশন করিতেছে, কেহ গান গাইতেছে, কেহ নিদ্রা যাইতেছে, এবং কেহ বা তরুতলাশ্রিত পথিককে তামাক সাজিয়া খাওয়াইতেছে। শকুনি ও চিল ভিন্ন বিহঙ্গ বংশের সকলেই এখন আলয়োপবিষ্ট। শকুনি ও চিল ভারি বাস্ত,—এই কারণ তাহারা আপন আপন প্রশস্ত পক্ষপুট ধীরে ধীরে সঞ্চালিত করিয়া কখন সমানভাবে, কখন বক্রভাবে এবং কখন বা উচ্চাবনত ভাবে আকাশে উড়িতেছে। আলয়োপবিষ্ট বিহঙ্গ দলের প্রায় সকলেই তন্দ্রান্বিত। কিন্তু কোকিলের তন্দ্রা নাই—নিদ্রাও নাই—সে বিরহবিধুরা কুলবধূর মত নবপল্লবপরিবৃত বৃক্ষশাখা হইতে মধ্যে মধ্যে ঝঙ্কার তুলিয়া রাজ পথকে প্রতিধ্বনিত করিতেছে। তাহার দেখাদেখি দুই একটা বাঙ্গালচরিত্র বিহঙ্গও ডাকিয়া উঠিতেছে। রাজ মার্গের উভয় পার্শ্ব নবমুঞ্জরিত মহীরুহদলে পরিশোভিত। মহীরুহদলের নবোদ্গত হরিদ্বর্ণ পত্রাবলী সূর্য্যকিরণ সম্পাতে কচিৎ ঝলসিত, এবং মলয়ানিলের মন্দ মন্দ সঞ্চারে কচিৎ স্পন্দিত হইতেছে।"

কলিকাতার অধিবাসীগণ মধ্যে যাঁহারা কখন জন্মস্থান ত্যাগ করেন নাই, হুগলি যাঁহাদের পক্ষে ইংলণ্ড ও বর্দ্ধমান যাঁহাদের নিকট আমেরিকা কিম্বা যাঁহারা কেবল মাত্র সখের খাতিরে রেলপথে, বজরা বা ষ্টীমার যোগে দুই চারি বার দেশান্তরের হাওয়া খাইয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা এই দুরন্ত চৈত্র মাসের মফস্বল রাজপথের মধ্যাহ্নকালীন অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না, চন্দ্রলোকের কোন স্থান বিশেষের অবস্থার মত বোধ হইবে। কিন্তু আমাদের এরূপ বর্ণনা বড় মিষ্ট বোধ হয়, কারণ আমরা অনেক সময় এরূপ অবস্থায় পড়িয়াছি। প্রকৃতির ক্রোড়ে জন্মিয়া প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত পালিত ব্যক্তিগণের নিকট ধাত্রী মাতার কোন অবস্থার স্বরূপ বর্ণনা অতি উপাদেয়, বিশেষ যখন বাধ্য হইয়া তদবস্থা হইতে দূরে রাজধানীর ঐশ্বর্য্য মধ্যে অপ্রা-

কৃতিক ভাবে কপট কৃত্রিম জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। এই জন্য আর এক বার বলি, বর্ণণাটী বেশ হইয়াছে; কেবল এক জায়গা বুঝিতে পারিলাম না "বিরহ-বিধুরা কুলবধূর ঝঙ্কার।" যদি "নব পল্লব পরিবৃত অবস্থা" মাত্র কুলবধূর মত হয়, তাহা হইলে শব্দের সামান্য দোষ হইয়াছে। যাহা হউক, ছিদ্রানুসন্ধান আমাদের কাজ নয়, ওরূপ ভুল সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষণীয়; কিম্বা হয়ত আমারই বুঝিবার ভুল। তবে কেবল নিরপেক্ষ সমালোচনার খাতিরে যাহা কিছু বলিতে হইল। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—২১ পৃষ্ঠায় হরিশ্চন্দ্রের বিধবা শ্যালি ওরফে গৃহিণী বিমলার বর্ণনা বেশ হইয়াছে।

বিমলার ন্যায় বাল বা যৌবন বিধবা আত্মীয় কুটুম্ব অনেক মৃতদার ব্যক্তির গৃহে থাকিয়া যে সর্ব্বদা নানাপ্রকার অনিষ্টোৎপাদন করে, তাহা বোধ হয় বেশী কাহাকেও বলিতে হইবে না। এবং এরূপ চরিত্রের বিধবার সংখ্যাও যে সমাজে কম নয়, তাহাও বলা বাহুল্য। তবে একবার কোন দেশীয় রাজপুরুষ প্রকাশ্যভাবে একথার উল্লেখ করায় দেশে হুল স্থুল পড়িয়া গিয়াছিল, এই জন্য উহার আলোচনা করিতে ভয় হয়। গ্রন্থকার বিমলার চরিত্র আঁকিতে গিয়া আর একটী সমাজ-কলঙ্কের ইঙ্গিত করিয়াছেন। সেটীও কম গুরুতর নয়। আমাদের বাসর দেশের একটী প্রাচীন অন্তর্ব্যবস্থান (Institution) হইলেও বর্ত্তমান শতাব্দীতে একটু ভীষণ ভাব ধরিয়াছে বলিতে হইবে। প্রতিপোষকগণ বৈজ্ঞানিক যুক্তি সহ তর্ক করিতে আসেন যে, প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী সব দিক বন্ধ করিয়া চাপ দিলে ফাটিয়া বাহির হইবার সম্ভাবনা, সেই জন্য, এক দিকে এই একটু ছিদ্র রাখিয়া চলিতেই হইবে। মন্দ কথা নয়। সব দিক ওরূপ ভাবে বন্ধ রাখিবার আদৌ দরকার দেখিতে পাওয়া যায় না; যাহা হউক, চিরাগত প্রথা ভগবান স্থানীয়, তাহাতে হাত দিবার কাহারও অধিকার নাই। আর তাহাই যদি করিতে হয়, বিশেষ বিবেচ্য বিষয় এই যে, প্রকৃতির ইহাও অখণ্ডনীয় নিয়ম যে, বার মাস চাবি তালায় আটক রাখিয়া এক দিন ষোল আনা স্বাধীনতা দিয়া ছাড়িয়া দিলে বিষম কাণ্ড ঘটিয়া থাকে। মনোরাজ্যের সেই প্রাকৃতিক নিয়মের বাসর একটী জীবন্ত দৃষ্টান্ত। সমাজ-পরিচালক মহোদয়গণ স্বীকার করুন বা নাই করুন, উক্ত স্বেচ্ছাচারিতার লীলা-ক্ষেত্রে অনেক সময় মহা অনর্থের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বাধা গরু ছাড়িয়া দিলে যথেচ্ছব্যবহার অবশ্যম্ভাবী। আর এক কথা, ধামা ঢাকা কি আছে, মা বারণ করিয়াছেন খুলিয়া দেখিতে হইবে; শিশু আর থাকিতে পারে না, মাতার গোপনে ধামা খুলিবে, তন্ন তন্ন করিয়া সব দেখিবে, এবং যে প্রকারে হউক, যতদূর পারে সম্ভোগ করিতে ক্রটী করিবে না। শুধু তাই নয়, চুরি করিয়া অন্যায় সম্ভোগের স্বভাব বদ্ধমূল হইয়া যাইবে। আমাদের পুরুষ ও স্ত্রীলোকের পক্ষে ঠিক তাই:—কখন যাহাকে মুখ তুলিয়া দেখিতে পাই না, তফাৎ হইতে যাহার একটা কথা শুনিবারও অধিকার নাই, এরূপ পরপুরুষ ও পরনারীর সঙ্গে কথা-বার্ত্তা, আলাপ-পরিচয়, আদর-অভ্যর্থনা, আচার-ব্যবহার করিবার সম্পূর্ণ ছুটি পাওয়া গিয়াছে, এখন কর্ত্তব্য

কায়মনোবাক্যে পরস্পরের ভিতর প্রবেশ করা; এবং সে বিষয়ে বিশেষ তৎপরতা চাই, যে হেতু অবকাশ অল্প, দেখিতে দেখাইতে, বলিতে ও শুনিতে হইবে অনেক, এরূপ স্থলে সাক্ষাৎমাত্রে একেবারে ষোল আনা খোলাখুলি না হইলে কার্য্য শেষ হয় কৈ, সময়ে যে কুলায় না।

অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন, ইউরোপীয় সভ্যতার হিসাবে নারীকুলের, বিশেষতঃ সীতা সাবিত্রীর জাতীয়া রমণীগণের কলঙ্ক এ প্রকারে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করা সুরুচি-বিরুদ্ধ। তাঁহাদিগকে বলিতে হয় যে শারীরিক রোগ যেমন, সমাজের ব্যাধিও সেইরূপ, চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া না দেখাইলে প্রতিকারের আশা কম। আর ওবিষয়ে লজ্জা বোধ করা আমাদের অন্যায়:—যে দেশে অষ্টমবর্ষীয়া শিশু কন্যাকে পিতা মাতা জোর করিয়া যুবা স্বামীর শয়নগৃহে নিশি-যাপনার্থ প্রেরণ করত মহা কর্ত্তব্য সম্পাদন-জনিত বিমলানন্দ উপভোগ দ্বারা আপনা-দিগকে কৃতার্থ বোধ করেন, সে দেশে লজ্জা শরম রুচি নীতির কথা তোলা বাতুলতা মাত্র।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ—৬৬ পৃষ্ঠা—"বসন্তের রাত্রি,—রাত্রি চন্দ্রমাশালিনী—সুতরাং রাত্রি মনোহারিণী। রাত্রি মালতী যূথি মল্লিকাদি ফুল কুসুমদল-শোভিনী, রাত্রি কচিৎ পিককুল কলরব-বিস্তারিণী, রাত্রি—মন্দ মন্দ মলয়ানিলবাহিনী,—সুতরাং রাত্রি প্রমোদিনী। রাত্রি—গন্ধামোদিতা, বৃক্ষব্রততীর শ্যামল সুন্দর পল্লব-বিকাশে মোহনবেশ বিভূষিতা, রাত্রি—কন্দর্পানুগতা,—সুতরাং রাত্রি বিরহোৎপাদিকা। রাত্রি শীতাধিকা নহে, গ্রীষ্মাধিকাও নহে,—সুতরাং রাত্রি মধুরা।"

প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে বর্ণনার অভাব নাই, বিশেষ "চন্দ্রমাশালিনী বাসন্তী রাত্রির" বর্ণনা বোধ হয় ভূরি ভূরি আছে। উপরোক্ত বর্ণনা যদি তাহার কোন একটীর অনুবাদ না হয়, উহাতে অভিনবত্ব ও মধুরতা আছে। আমাদের দেশের কোন বিভাগে বাহাদুরীর ক্রটি নাই। সাহিত্য জগতে অনেক ধুরন্ধর নভেলকার নাটককার অন্য ভাষা হইতে ভাব অবিকল নকল করিয়া "টাট্‌কা মৌলিক মাল" বলিয়া বাজারে ছাড়িতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। শেষে কিন্তু ধরা পড়িয়াছেন। বহুবার এইরূপ হইয়াছে, তাই উল্লিখিত রূপ বলিলাম, গ্রন্থকার যেন কিছু মনে না করেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ—৭১ পৃষ্ঠা—"সংসারে সূর্য্যের গতি নিরূপিত হয়, চন্দ্রের গতি নিরূপিত হয়, তরঙ্গাবর্ত্তিতা তটিনীর গতিও নিরূপিত হয়,—হয় না কেবল ভ্রষ্টাচারিণীর গতি। ভ্রষ্টাচারিণীর ঈক্ষণ, পদ-ক্ষেপণ, কথোপকথন সমস্তই দুর্ভেদ্য, দুরবগাহ্য। ভ্রষ্টাচারিণী-চরিত্রের আদ্যোপান্তই রহস্যাত্মক। মদা-কুলিত মাতঙ্গকে বিশ্বাস করিতে পারি, দংশনোদ্যতা কালভুজঙ্গিনীকেও বিশ্বাস করিতে পারি, কিন্তু ভ্রষ্টা-চারিণীকে কোন মতেই বিশ্বাস করিতে পারি না। ভ্রষ্টাচারিণী চরিত্রে যিনি বিশ্বাস করেন, তিনি বিপদাপন্ন হন।"

গ্রন্থকার কখন এরূপ বিপদাপন্ন হইয়া-ছিলেন কিনা, জানি না; কিন্তু যেরূপ চোটের সহিত কলম চালাইয়াছেন, তাহাতে যেন ঠিক প্রাণের পর্দ্দা পর্দ্দা ভেদ করিয়া কথাগুলি বাহির হইতেছে। ব্যক্তিগত বিষয়ের আলোচনা দূষণীয়, কিন্তু এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, এ স্থানে কলমের বড় জোর। ঠেকিয়া শিখা ও দেখিয়া শিখাতে অনেক তফাৎ, যিনি দেখিয়া ঠেকিয়া শিখার মত জ্ঞান পান, তিনি ধন্য। ভরসা করি। গ্রন্থকার সেই শ্রেণীর লোক, আর আমরা, আমরা আজ পর্য্যন্ত ওরূপ

ভাবে বিপদাপন্ন হই নাই। তবে চল্লিশের পর "A man is either a fool or a physician" ইংরাজীতে বলে, সেই আইনে যদি fool হইয়া বুঝিতে অক্ষম হই, বলিতে পারি না।

গ্রন্থের অন্যান্য অংশের বিষয়ে অধিক বলিয়া পুঁথি বাড়াইতে ইচ্ছা করি না। শেষটা মোটামুটী দুই চারি কথায় সারিতে চাই।

গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র, কিন্তু গ্রন্থকার যাহাতে হাত দিয়াছেন, তাহা ঢোঁড়া বা হেলে সাপ নহে, ভয়ানক বিষধর অজাগর। সুতরাং হস্তদাতার দিকে না দেখিয়া, বিষয়টীর দিকে তাকাইয়া কাজ করিতে হইবে। অনেক শিশু অজ্ঞানতা বশত গোক্ষুরা ফণিধরের গায়ে হাত দিতে কিছুমাত্র শঙ্কা করে না; হয়ত সর্প তাহার নিরীহতা ও সরল প্রেম দেখিয়া তাহাকে কিছু না বলিতে পারে, (এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে)। কিন্তু তাই বলিয়া শিশু শিশুই, বিষধর বিষধরই। তাই এ শিশুকে বলিহারি যাই।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

বাক্‌টিরিয়া।

রোগ নিদান-শাস্ত্রের চর্চ্চায় বাক্‌টিরিয়া বাসিলি প্রভৃতি জীবাণুগণের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। কচ সাহেবের কলেরা বাসিলি, জলাতঙ্ক রোগ চিকিৎসার জন্য পাস্তর সাহেবের টীকার ব্যবস্থা, সংবাদপত্রের বহুল প্রচারে কাহারও অজ্ঞাত নাই। বিশেষ বিশেষ জীবাণু দ্বারা বিশেষ বিশেষ রোগোৎপত্তি হয় কি না, তাহা আধুনিক রোগ নিদানের বিচার্য্য বিষয় হইয়াছে। উক্ত জীবাণুগণের জীবন পুষ্টি জনন প্রভৃতি জীবনেতিহাস, জীববিদ্যারও আলোচ্য বিষয়। তাহাদের দ্বারা বিশেষ বিশেষ রোগোৎপত্তি জীবাণুগণের জীবনেতিহাসের একাঙ্গ মাত্র। বিগত ১৪।১৫ বৎসরের মধ্যে বাক্‌টিরিয়াতত্ত্ব এতদূর আলোচিত হইয়াছে যে, তাহার অল্প মাত্র বর্ণনা করিতে গেলে একখানা প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে। সাধারণ পাঠকের অবগতির জন্য তাহার কয়েকটী স্থূল স্থূল বিষয় এখানে প্রকটিত করা গেল।

(১) জীবনেতিহাস।

কিঞ্চিৎ জলে বৃক্ষের পত্র বা এক খণ্ড মাংস ভিজাইয়া রাখিলে কয়েকদিবস মধ্যে উহার উপরিভাগে একটা পাতলা সর পড়িতে দেখা যায়। এই সরের একটুকু অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিলে, তাহাতে অসংখ্য ছোট বড় জীবাণু দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে বড় গুলিও খালি চক্ষে দেখা যায় না। ছোটগুলির ত কথাই নাই। যে অণুবীক্ষণ দ্বারা দৃষ্ট বস্তু চারি পাঁচ শত গুণ বড় না দেখায়, তাহাতেও তাহারা প্রায় অদৃশ্য থাকে। যাহা হউক, উক্ত সব দেখিলে তাহাতে সচরাচর দুই প্রকার জীব দেখিতে পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত বড়গুলিকে সহজেই জীব বলিয়া প্রতীতি হইবে; কেন না, তাহারা যেন ব্যস্ত হইয়া এদিক্‌ ওদিক্‌ গমনাগমন করিতেছে। এ গুলি অপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণীস্থ প্রাণী। চমৎকারজনক হইলেও এখন উহাদের

কথা থাক্‌। যেগুলি ছোট, সে গুলিও নিশ্চেষ্ট নহে। উহাদের দুই প্রকার গতি দেখা যাইবে; (১) দ্রুতকম্পন, (২) স্থানান্তর সরণ। দ্রুত কম্পন দ্বারা জৈবক্রিয়া বুঝায় না। কেন না, জৈব বা অজৈব, কোন প্রকার সূক্ষ্ম চূর্ণ জলে নিক্ষিপ্ত হইলে সেই চূর্ণ-কণার এই প্রকার গতি দৃষ্ট হয়। এই গতি প্রথমতঃ ব্রাউন সাহেব বর্ণনা করেন। তদনুসারে ইহার নাম ব্রাউনীয় বা ব্রুনীয় গতি হইয়াছে। কারণ, বিচার করিলে জানা যায় যে, ইহা আণবিক ব্যাপার মাত্র। যাহা হউক, অন্যবিধ গতি দ্বারা সহজেই বুঝা যায় যে, উহারা জীব বিশেষ। এই অতীব ক্ষুদ্র জীবগুলির নাম বাক্‌টিরিয়া।

পক্ব অন্ন আলু মৎস্য মাংস ডিম্ব প্রভৃতি সামগ্রী কয়েক দিবস রাখিয়া দিলে তাহাদের স্থান বিশেষের বর্ণ পরিবর্ত্তন দ্বারা তথায় বাক্‌টিরিয়ার সঙ্ঘের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। ইহারা সমুদায় সামগ্রীতে ক্রমশঃ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই সকল স্থানে একটা সূচী বিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা খোলা শূন্য সিদ্ধ ডিম্ব স্পর্শ করিলে দুই এক দিনের মধ্যে তথায় অগণ্য বাক্‌টিরিয়া জন্মিতে দেখা যায় এবং উক্ত ডিম্ব হইতে পূতিগন্ধ বহির্গত হয়। গলিত জৈব পদার্থের উৎকট পূতিগন্ধ দ্বারা তথায় বাক্‌টিরিয়ার অস্তিত্ব সহজেই জানা যায়।

বাক্‌টিরিয়া সকলের নানাবিধ আকার। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত তিন প্রকার আকারে সকলগুলি বর্ণিত হইতে পারে। যথা,— (১) গোলাকার গুটিকা সদৃশ। (২) দণ্ডসদৃশ, এবং (৩) কুণ্ডল সদৃশ। (১) আকারানুসারে বাক্‌টিরিয়াগণের জাতীয় নাম প্রদত্ত হইয়াছে। যাহাদের গোল গুটিকা সদৃশ আকার, তাহাদের বৈজ্ঞানিক নাম মাইক্রোককাই (২) বা অণুগুটিকা। দণ্ডাকার বাক্‌টিরিয়ার দৈর্ঘ্যানুসারে দুইটী জাতীয় নাম হইয়াছে। যাহারা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, তাহারা বাক্‌টিরিয়া (৩) নামক বিশেষ নামে এবং যাহারা দীর্ঘ তাহারা বাসিলি (৪) নামে কথিত হয়। বাক্‌টিরিয়া ও বাসিলি শব্দের অর্থ যষ্টি ও দণ্ড। তৃতীয় প্রকার আকার বিশিষ্ট বাক্‌টিরিয়ার নাম স্পাইরিলি (৫)। ইহার অর্থ আবর্ত্তিত কুণ্ডল। পাঠক দেখিবেন, বাক্‌টিরিয়া এই সমুদায় জীবাণুর সামান্য নাম হইলেও, ইহা কয়েক প্রকার জীবাণুর বিশেষ নামও বটে। বিশেষ না করিলে বাক্‌টিরিয়া শব্দ দ্বারা আমরা সমুদায় জীবাণুবর্গ বুঝিব।

নিম্নলিখিত প্রণালীতে বাক্‌টিরিয়ার বংশ বৃদ্ধি হয়। কোন একটি বাক্‌টিরিয়া দুই ভাগে বিদীর্ণ হয়, এই দুই ভাগের প্রত্যেকটি এক একটি বাক্‌টিরিয়া হয়। আবার এই দুইটির প্রত্যেকটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এইরূপ একটি হইতে দুইটি, দুইটি হইতে চারিটি, চারিটি হইতে আটটি, এই ক্রমে বাক্‌টিরিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। বিজ্ঞানের ভাষায় ইহাকে "বিদারণ প্রণালী" বলা যায়। অধ্যাপক ফ্রাঙ্কলাণ্ড বলেন যে, এইরূপে প্রায় প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টায় বাক্‌টিরিয়ার এক এক পুরুষের জন্ম হয়। একটি বাক্‌টিরিয়া হইতে ২৪ ঘণ্টায় এত বংশ বৃদ্ধি হয় যে, তাহা লণ্ডন নগরের লোক সংখ্যার চতুর্গুণ। ৪৮ ঘণ্টায় একটির সন্তান সংখ্যা

(১) Spiral.

(২) Micrococci. (৩) Bacteria. (৪) Baccilli. (৫) Spirilli. ইহারা বহুবচনান্ত।

২৮,০০,০০,০০,০০,০০,০০০ আটাইশ লক্ষ অর্ব্বুদ হয়। এইরূপে দ্রুত বৃদ্ধি বশত ইহাদিগকে এক এক স্থানে অগণনীয় দলে দলে দেখা যায়। এই বিদারণ-প্রণালীর দ্বারা সমুদায় বাক্‌টিরিয়ার বংশ বৃদ্ধি হয়।

বাসিলি নামক বাক্‌টিরিয়া অন্যবিধ প্রণালীতেও বৃদ্ধি পায়। এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। বীজ হইতে বৃক্ষ জন্মে, একথা সকলেই জানেন। ফলের বীজ, সন্তান ব্যতীত অন্য কিছু নহে এবং তাহার উৎপাদন জন্য স্ত্রী পুরুষের সংযোগ আবশ্যক। নিম্ন জাতীয় কতকগুলি উদ্ভিদ্ আছে, তাহাদের বীজরূপ সন্তান হয় না। কতকগুলির উল্লিখিত বিদারণ প্রণালীতে বংশবৃদ্ধি হয়। কতকগুলির বীজবৎ কার্য্যকারী এক প্রকার অঙ্কুর জন্মে। ইহাদের উৎপাদন নিমিত্ত স্ত্রী পুরুষের সংযোগ আবশ্যক হয় না। যাঁহারা ফারণ্ (১) বা পর্ণ গাছ (পাষাণ-ভেদী ঢেঁকি প্রভৃতি) চেনেন, তাঁহারা পর্ণ গাছের পাতার নিম্ন পৃষ্ঠে পিঙ্গল বর্ণের পুষ্প রেণুবৎ পদার্থ বিশেষ দেখিয়া থাকিবেন। সেই রেণু হইতে পর্ণ গাছের উৎপত্তি। এই পদার্থকে আমরা বীজ রেণু (২) বলিব। ঐ নাম যাহাই হউক, কথাটা এই যে, বাসিলির এই প্রকার অযৌন বীজ উৎপন্ন হয়। পুষ্ট হইলে বাসিলির বীজ-রেণু দেখিতে অণ্ডাকার। বাসিলির উদরে তাহার জন্ম। বাসিলির বীজ-রেণু উপেক্ষণীয় নহে। কেন, তাহা পরে বলা যাইবে। যে জলে কোন প্রকার জৈব পদার্থ মিশ্রিত থাকে, তাহাই বাক্‌টিরিয়ার আবাস ভূমি। উদ্ভিদ বা প্রাণী দেহ জলে ভিজাইয়া রাখিলে তাহাতে বাক্‌টিরিয়া বিলক্ষণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ কি জলে, কি স্থলে, কি বায়ুতে এই সকল জীবাণু সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে। এই জন্যই ব্যাধিকর বাক্‌টিরিয়া-তত্ত্ব চিকিৎসক ও নগরের স্বাস্থ্যরক্ষকগণের এতদূর মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে।

উপরে আমরা এক প্রকার বলিয়াছি যে, বাক্‌টিরিয়া উদ্ভিদ বিশেষ। উহারা উদ্ভিদ না প্রাণী, এই তর্কের মীমাংসা করিতে কত কত অভিজ্ঞ জীব-বিজ্ঞানবিৎ হতবুদ্ধি হইয়াছেন। এই তর্কের শেষ না পাইয়া ফরাসী জীববিজ্ঞানবিৎ সেডিলট সাহেব খ্রীঃ ১৮৭৮ অব্দে উহাদের "মাইক্রোব (১)" বা অণুজীব নামকরণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ বাক্‌টিরিয়া নামের পরিবর্ত্তে আজ কাল অনেকেই মাইক্রোব বা অণুজীব নাম ব্যবহার করিতেছেন।

বাক্‌টিরিয়া উদ্ভিদ না প্রাণী? অনেক পাঠক হয়ত ইহার উত্তর সহজ মনে করিতেছেন এবং বৈজ্ঞানিকগণ এটা গাছ কি জন্তু, তাহা নির্ণয় করিতে এত কোলাহল করিয়াছেন শুনিয়া হয়ত বিস্মিত হইতে পারেন। কিন্তু জীববিদ্যার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, উক্ত প্রশ্নের উত্তর সহজ নহে। প্রকৃতির মধ্যে যিনি জীব জাতির সৃষ্টির পরিচ্ছেদ অনুসন্ধান করেন, তিনি নিতান্ত ভ্রান্ত। এই পর্য্যন্ত প্রাণী, তাহার পর উদ্ভিদ, এ কথা বলিতে যিনি চাহেন, তাঁহার বিবর্ত্তবাদ শিক্ষা করা হয় নাই। খনিজ, উদ্ভিদ ও প্রাণী, এই তিন রাজ্যে যাবতীয় পদার্থ শ্রেণীবদ্ধ

(১) Ferns. (২) Spores. ইহাদিগকে বীজ-রেণু বলা গেল। পাঠক "বীজ" শব্দ দ্বারা যৌনবীজ বুঝিবেন না।

(১) Microbes

করা গিয়া থাকে। বড় বড় গাছের ও বড় বড় জন্তুর মধ্যে বিলক্ষণ প্রভেদ আছে, এমন কি, তাহাদিগকে এক বলিয়া ভ্রম জন্মাইবার কোন সাদৃশ্যই দেখা যায় না। কিন্তু ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে বৈসাদৃশ্য কম, সাদৃশ্যই বেশী। এজন্য অনেকে এই সকল জীবগণের এক সাধারণ নাম (১) দিয়াছেন।

স্বাভাবিক হউক, বা অস্বাভাবিক হউক, শ্রেণী বিভাগ না করিলে জ্ঞানবৃদ্ধি হয় না। অমুকটা বানর, অমুকটা বনমানুষ, এক এক শব্দ দ্বারা কত অর্থ ব্যক্ত হইতেছে। চেতন ও উদ্ভিদের যে লক্ষণ পাঠকের স্মরণ আছে, তাহা এখানে চলিবে না। কেন না, অনেক প্রকৃত উদ্ভিদ সময় বিশেষে গমনাগমন করে। উচ্চ জাতীয় বৃক্ষাদির পত্র, কাণ্ড, মুকুল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অংশেরও গতি আছে। ইহারা স্থানান্তরে গমন করে না সত্য, কিন্তু সেইরূপ অনেক প্রাণীও আছে। উদ্ভিদের হরিদ্বর্ণ পত্র যে রঙ্গের (২) জন্য হরিৎ দেখায়, তাহা প্রাণীদিগের নাই। সে রঙ্গ কোন প্রাণীর নাই, আর সকল উদ্ভিদেরই আছে, এই দুইটী বলা ভুল। বেঙের ছাতি হরিদ্বর্ণ নহে, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। হরিদ্বর্ণ প্রাণীর দৃষ্টান্ত সকলের তত জানা নাই। যাহা হউক, নিম্ন-জাতীয় উদ্ভিদ ও প্রাণীকে হরিদ্‌ বর্ণ দ্বারা প্রভেদ করিতে পারা যায় না। আর একটি লক্ষণ আছে, ইহা অপেক্ষাকৃত সন্তোষ-প্রদ। উদ্ভিদগণের খাদ্য একরূপ, প্রাণী-গণের খাদ্য অন্যরূপ। উদ্ভিদগণ সামান্য খনিজ বা অজৈব পদার্থ হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে, প্রাণীগণের সে ক্ষমতা নাই। প্রাণী-গণ অপর প্রাণী বা উদ্ভিদ দেহ না পাইলে বাঁচে না। অণুজীব সকল গলিত জৈব পদার্থের সঙ্গে দেখা যায় সত্য, কিন্তু নানা-বিধ পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, তাহারা অচেতন অজৈব পদার্থ হইতেও আহার সংগ্রহ করিতে পারে এবং আমোনিয়া ঘটিত লবণাদি হইতে সোরাজনক (১) পদার্থ লইয়া দেহ পুষ্টি করে। বাস্তবিক, এই লক্ষণ ও অন্যান্য কয়েকটী যুক্তি দেখিলে বাক্‌টিরিয়াকে আর প্রাণী বলিতে পারা যায় না।

যদি বাক্‌টিরিয়া উদ্ভিদই হইল, উহাদের জ্ঞাতিগণ কাহারা? কোন্ বংশের উদ্ভিদের সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ? এখন ইহার উত্তর সংক্ষেপে প্রদত্ত হইতেছে।

সপুষ্পক ও অপুষ্পক ভেদে যাবতীয় উদ্ভিদকে দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়। অর্থাৎ কতকগুলি উদ্ভিদের পুষ্প হয়, আর কতকগুলির পুষ্প হয় না। পুষ্প কাহাকে বলে? প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে গেলে, পুষ্পের অন্তর্গত পুং ও স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ই তাহার সার অংশ। তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য এবং তাহা-দিগের উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা করিবার অভি-প্রায়ে পুষ্প সকলের সুগন্ধ, সৌন্দর্য্য যুক্তদল প্রভৃতি চিত্ত-বিনোদক অঙ্গগুলির আবির্ভাব। অতএব পুষ্পের সঙ্কীর্ণ অর্থ ত্যাগ করিয়া যাহাতে পুং বা স্ত্রী জননেন্দ্রিয় আছে, তাহা-কেই পুষ্প বলা যায়। জননেন্দ্রিয়ের অভি-প্রায় সন্তানোৎপাদন। স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের সার অঙ্গ গর্ভ, গর্ভের প্রধান ব্যাপার বীজো-ৎপাদন, বীজের অর্থ সন্তান অর্থাৎ পিতা

(১) Protista.

(২) Chlorophyl,

(১) Nitrogen.

মাত্রার সদৃশ ক্ষুদ্রাবয়ব জীব মাত্র। এই বিশ্লেষণ দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, কতকগুলি উদ্ভিদের বীজরূপ সন্তান তাহাদের দেহে প্রত্যক্ষ করা যায়। তাহারাই সপুষ্পক। বাক্‌টিরিয়ার পুষ্প হয় না, তজ্জন্য তাহারা অপুষ্পক উদ্ভিদ্ শ্রেণীর অন্তর্গত।

অপুষ্পক উদ্ভিদ সকলের কতকগুলির আদৌ বীজ হয় না। অপর কতকগুলির বীজরূপ সন্তান প্রসব গূঢ় ব্যাপার। এজন্য তাহাদের বীজ হয় না, এরূপ সচরাচর বলা যায়। তবে কিরূপে তাহাদের জন্ম ও বংশ বৃদ্ধি হয়? পূর্ব্বে বাক্‌টিরিয়ার বংশ বৃদ্ধি বলিবার সময় ইহার উত্তর কতকটা দেওয়া গিয়াছে। নানাজাতীয় ফারণ্ বা পর্ণ, শৈবাল প্রভৃতি জলজ গাছ, বেঙের ছাতি ইত্যাদি দেখিলেই অপুষ্পক শ্রেণীর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। পর্ণ ও শৈবালের কাণ্ড পত্র মূল দৃষ্টিগোচর হয়। এজন্য ইহাদের সাধারণ নাম সকাণ্ডক। ছত্রাকের কাণ্ড পত্র ভেদ নাই। সেইরূপ দোয়াতের কালিতে, ভিজা দেওয়ালে, নষ্ট দুগ্ধে, গলিত ফলে, বৃক্ষের বল্কলে, আর্দ্র বস্ত্রে, পুষ্করিণীর জলে হরিৎ ও কপিল বর্ণের কণাবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সকল উদ্ভিদ দেখা যায়, তাহারা অকাণ্ডক। অকাণ্ডক উদ্ভিদ সকলকে আবার দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। কতকগুলি হরিদ্বর্ণ, অপরগুলি হরিদবর্ণ নহে। এই শেষোক্ত অহরিদ্বর্ণ নিম্নশ্রেণীস্থ উদ্ভিদগণকে ইংরাজীতে ফাঙ্গী বলে। বাক্‌টিরিয়া এই ফাঙ্গী শ্রেণীর অন্তর্গত। উপরে উদ্ভিদগণের যে শ্রেণী বিভাগ করা গেল, তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

উদ্ভিদ
- সপুষ্পক
- অপুষ্পক
  - সকাণ্ডক
  - অকাণ্ডক
    - হরিদ্বর্ণ — আল্গী (১)
    - অহরিদবর্ণ — ফাঙ্গী (২)

নানাবিধ উদ্ভিদ লইয়া ফাঙ্গী শ্রেণী। ইহাও নানাবিধ গণে বিভক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে বাক্‌টিরিয়া নিজ দেহ বিদারণ করিয়া বৃদ্ধি হয় বলিয়া ইহারা বিদারক ফাঙ্গী (৩) নামে অভিহিত হইয়াছে।

বাক্‌টিরিয়া সকলের আকার এত ক্ষুদ্র যে, উহাদের আভ্যন্তরিক গঠন সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে কিছু বলা দুরূহ। সাধারণ পাঠকের অবগতির নিমিত্ত বলা আবশ্যক যে, কি প্রাণী কি উদ্ভিদ, যাবতীয় জীবদেহ ক্ষুদ্র বৃহৎ কোষ দ্বারা নির্ম্মিত। শৈশবাবস্থায় পরিপুষ্ট কোষের এই তিনটি অংশ থাকে, যথা—(১) আবরণ (Cellwall) (২) জীবনাধার (৩) (Protoplasm) এবং (৪) জীবকেন্দ্র (Nucleus)। অনেক জীবকোষের আবরণ থাকে না। অতএব জীবনাধারই জীবগণের দেহ নির্ম্মাণের সর্ব্বপ্রধান উপকরণ।

বাক্‌টিরিয়ার দেহ এক একটি কোষ মাত্র। সেই কোষের আবরণ আছে, কিন্তু কোষ মধ্যস্থিত জীবনাধার পদার্থে জীবকেন্দ্র দৃষ্টিগোচর হয় না।

সকল বাক্‌টিরিয়ার স্থানান্তর সরণের ক্ষমতা নাই। যে গুলির এক বা দুইটি

(১) Algæ. (২) Fungi.

(৩) Schizomycetes. (৪) ইহাকে কেহ কেহ জীবনাঙ্কুর ও জৈবনিক বলিয়াছেন। কোন নামই সুস্পষ্ট হয় নাই।

শুঁয়া (৩) আছে, তাহারাই দ্রুতবেগে আবাস-রসে সঞ্চরণ করে। যে পাত্রে বাক্‌টিরিয়া জন্মে, তাহা স্থির না রাখিলে, তাহাদের জননের ব্যাঘাত হয়। কোন কোন বাক্‌টিরিয়া বায়ু ব্যতীত জন্মে না, কোন কোনটী তদ্ব্যতীতও স্বচ্ছন্দে জন্মে। শেষোক্ত বাক্‌টিরিয়াগণ খাদ্যস্থিত অম্লজনক শোষণ করিয়া জীবিত থাকে। বলা বাহুল্য, উপযুক্ত খাদ্য ব্যতীত বাক্‌টিরিয়া জন্মিতে পারে না। খাদ্যের মধ্যে জল অত্যাবশ্যক পদার্থ। ফুটন্ত জলের উষ্ণতায় অধিকাংশ বাক্‌টিরিয়া মরিয়া যায়। অনেকগুলি তাহার অর্দ্ধেক উষ্ণতায় জীবিত থাকে না। বিশেষতঃ যে সকল বাক্‌টিরিয়া দ্রব পদার্থ ব্যতীত জীবিত থাকে না, তাহারা এইরূপে অপেক্ষাকৃত অল্প উষ্ণতায় মরিয়া যায়। বাসিলির বীজরেণু বিনষ্ট করা সহজ নহে। যে উষ্ণতায় বাসিলি মরিয়া যায়, তাহাতে বীজরেণুর কিছুই হয় না। শুষ্ক করিলে বাক্‌টিরিয়া মরিয়া যায়, কিন্তু বীজরেণু এরূপ অবস্থায় অনেক বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। পাস্তর সাহেব বলেন যে, বীজরেণু অবিমিশ্র সুরাসারে জীবিত থাকিতে পারে। বিফেণ্ড সাহেব দেখিয়াছেন যে, খাদ্য মিশ্রিত দ্রব পদার্থস্থিত বীজরেণু ১৫ মিনিট পর্য্যন্ত ফুটাইলেও সকলেই জীবিত ছিল, অর্দ্ধ ঘণ্টা ফুটাইতে অনেকগুলি, এক ঘণ্টা ফুটাইতে অত্যল্প জীবিত ছিল। তিন ঘণ্টা ফুটাইবার পর একটিও জীবিত ছিল না। কিন্তু ফুটন্ত জলের উষ্ণতার অধিক উষ্ণতায় কয়েক মিনিটের মধ্যেই বীজরেণু মরিয়া যায়। এদিকে জল জমাইলে অনেক বাক্‌টিরিয়া মরিয়া যায়, কিন্তু বীজরেণুর কিছুই হয় না। ক্রিসচ্ সাহেব দেখিয়াছেন যে, যে সকল বাক্‌টিরিয়া গলিত দ্রব্যে জন্মিয়া থাকে, তাহারা—১১১°শ উষ্ণতাতেও জীবিত ছিল।

কোন্ দ্রব্যে সকল প্রকার বাক্‌টিরিয়া মরিয়া যায়, তাহা অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে কার্বলিক, সালি-সাইলিক প্রভৃতি অম্লরসে অধিকাংশ বাক্‌টিরিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অনেক বাক্‌টিরিয়া তাহাতে মরিয়াও যায়। রসকর্পূর নামক পারদ-ঘটিত বিষাক্ত পদার্থ বাক্‌টিরিয়ার পরম শত্রু।

১৫০০০ ভাগ জলে এক ভাগ মাত্র রসকর্পূর মিশ্রিত করিলে তাহাতে বাক্‌টিরিয়ার বৃদ্ধি নিরুদ্ধ হয়। কিন্তু ইহাতেও বাক্‌টিরিয়া সকল ধ্বংস হয় না। যদ্দ্বারা বাক্‌টিরিয়া বিনষ্ট হইতে পারে, এমন ঔষধ আবিষ্কৃত হইলে চিকিৎসায় পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইবে।

জীবনোপায় ক্রমভেদে বাক্‌টিরিয়া সকল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। কতকগুলি মৃত ও গলিত জৈব পদার্থে জন্মে, তাহাই তাহাদের আবাসভূমি। তাহাদিগকে মৃত-জীবি বলা যায়। অপর কতকগুলি বাক্‌টিরিয়া জীবিত পদার্থে জন্মে, তাহাদিগকে পরজীবী বলা যায়। (১) মৃতজীবী বাক্‌টিরিয়ার মধ্যে অনেকগুলি নানাবিধ সন্ধানের (২) কারণ, অনেকগুলি মৃতজীব দেহ পচাইয়া

(৩) Cilia.

(১) অনেক প্রাণী ও উদ্ভিদ এইরূপ মৃতজীবী (Saprophytes) ও পরজীবী (Parasites)। ছত্রাক গলিত জৈব পদার্থে ও অর্কিড প্রভৃতি পর গাছা অন্য জীবিত বৃক্ষে জন্মে। প্রাণীবর্গের মধ্যে কীট প্রভৃতি মৃতজীবী, উৎকুণাদি পরজীবী।

(২) Fermentation.

তাহাকে গলিত পদার্থে পরিণত করে। পরজীবী বাক্‌টিরিয়াগণ আশ্রয় দাতার শরীরাভ্যন্তরে বাস করে। আক্রমণ প্রণালী-ভেদে তাহাদের জন্ম প্রণালী পরিবর্ত্তিত হয়। বীজরেণুরূপে কিম্বা স্বাভাবিক আকারেই বাহির হইতে মুখ কিম্বা ক্ষত পথে শরীরে প্রবেশ করে। তথায় তাহারা নিজের পুষ্টি ও বৃদ্ধি সাধন করিতে গিয়া নানাবিধ রোগ উৎপাদন করে। ইহাদের কয়েকটির বিষয় পরে বলা যাইতেছে।

(২) অণুজীবগণ কি সংক্রামক রোগের কারণ ?

আজ কাল অনেক পাশ্চাত্য ডাক্তার বিশেষ বিশেষ বাক্‌টিরিয়া বিশেষ বিশেষ সংক্রামক রোগের মুখ্য কারণ বলিয়া অনুমান করিতেছেন। অনেক ডাক্তার বাক্‌টিরিয়াকে অধিকাংশ রোগের কারণ বলিয়া তদনুসারে চিকিৎসা প্রণালী উদ্ভাবনে ব্যস্ত হইয়াছেন। যাহা হউক, সকল রোগের না হউক, ইহারা যে কতকগুলি রোগের কারণ, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। রোগগ্রস্ত জীবদেহে বাক্‌টিরিয়া দেখিতে পাইলেই যে তাহা সেই রোগের কারণ, এমন অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত নহে। উক্ত রোগের ও বাক্‌টিরিয়ার নিত্য সম্বন্ধ থাকিলেও উভয়ের মধ্যে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ না থাকিতে পারে। বস্তুতঃ এ সকল বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে কচ সাহেবের উপদেশ কয়েকটি স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। ইহাদের কোন একটি অসিদ্ধ হইলে সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। উপদেশগুলি এই (১) রোগাক্রান্ত জীবদেহে বাক্‌টিরিয়া থাকা আবশ্যক। (২) উক্ত বাক্‌টিরিয়া নীড় হইতে সংগ্রহ করিয়া স্বতন্ত্র কৃত্রিম বাস ভূমিতে জন্মাইতে হইবে। এইরূপে পুনঃ পুনঃ জন্মাইয়া রোগীর দেহের ক্লেদাদি দূরীভূত করিতে হইবে (১)। (৩) অনেক পুরুষ পর্য্যন্ত সেই সকল বাক্‌টিরিয়া এইরূপে জন্মাইয়া সুস্থকায় জন্তুদেহে প্রবিষ্ট করিলে সেই জন্তু সেই রোগে আক্রান্ত হয় কি না, তাহা দেখিতে হইবে। এবং (৪) এই শেষোক্ত রোগাক্রান্ত জন্তু শরীরে সেই প্রথম দৃষ্ট অণুজীব পাওয়া যায় কি না, তাহা দেখিতে হইবে। অনেক লোকের বিশ্বাস যে, ডাক্তারগণ মূলভিত্তি দৃঢ় না করিয়াই অণুজীব হইতে রোগোৎপত্তিবাদ পোষণ করিতেছেন।

কিরূপে ব্যাধিকর অণুজীবের অনুসন্ধান করিতে হয় এবং কিরূপেই বা কৃত্রিম খাদ্যে তাহাদিগকে রোপণ করিয়া তাহাদিগকে পরিদর্শন করিতে হয়, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। এখানে কয়েকটি অণুজীবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া তদ্দ্বারা রোগোৎপত্তির আধুনিক মত বলা হইতেছে। পূর্ব্বে বাক্‌টিরিয়ার যে শ্রেণী ভাগ করা গিয়াছে, তাহা এখানে অবলম্বিত হইবে।

(১) অণুগুটিকা বা মাইক্রোককী। ইহারা গোল বা ডিম্বাকার। ইহারা এত ক্ষুদ্র যে, বার সহস্র হইতে পঞ্চাশ সহস্র একত্র করিলে এক ইঞ্চির অধিক হইবে না। কতকগুলি গুটিকা দল বাঁধিয়া বাস করে, কতকগুলি পুঁতির মালার ন্যায় পরস্পর সংলগ্ন থাকে।

(১) এখানে বলা আবশ্যক যে নীড় (nidus) হইতে বাক্‌টিরিয়া সংগ্রহ করিবার সময় রোগীর দেহের বিষময় ক্লেদাদি তৎসঙ্গে সংগৃহীত হয়। তদ্ভিন্ন, উক্ত বাক্‌টিরিয়া তাহার সহিত মিশ্রিত থাকিতে পারে। এইরূপে শঙ্কা বাক্‌টিরিয়াকে পৃথক করিবার অভিপ্রায়েই এই নিয়ম।

বায়ুতে ইহারা প্রচুর পরিমাণে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। প্রাণীদেহের কোন অংশ গলিত বা মৃত হইলে ইহারা অসংখ্য পরিমাণে তথায় আশ্রয় ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সুস্থ অবস্থায় জিহ্বার উপর পৃষ্ঠের রসে, সামান্য সর্দির শ্লেষ্মায়, পুঁজ রক্তে, এই সকল অণুজীব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারাই প্রস্রাবের বিকৃত অবস্থার কারণ। ক্ষত, ফোঁড়া প্রভৃতির পুঁজে, উদরাময় রোগের বিষ্ঠায়, বসন্তের বীজে, প্রভৃতি নানাস্থানে ইহারা বিদ্যমান। পাগলা কুকুরের মুখের লালাতে পাস্তর সাহেব এক প্রকার অণুগুটিকা দেখেন। কৃত্রিম খাদ্যে রোপণ করিয়া সেই অণুগুটিকাময় বীজে জলাতঙ্ক রোগীর টীকা দিতেছেন। তিনি মনে করেন যে, এই অণুজীবই জলাতঙ্ক রোগের কারণ। (১) ইরিসিপেলাস রোগের কারণ এক প্রকার অণুগুটিকা, তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, ডিপ্‌থিরিয়া, নিউমোনিয়া, গণোরিয়া প্রভৃতি রোগেও বিশেষ বিশেষ অণুগুটিকা দৃষ্ট হয়। ইহাদের নিত্য সম্বন্ধ দৃষ্ট হইলেও কার্য্য কারণ সম্বন্ধ প্রমাণিত হয় নাই।

(২) বাক্‌টিরিয়া। ইহারা কিঞ্চিৎ দীর্ঘাকৃতি। এক একটী দৈর্ঘ্যে এক ইঞ্চির প্রায় দ্বাদশ সহস্র অংশ মাত্র। সকলগুলির দৈর্ঘ্য সমান নহে। এক প্রকার মৃতজীবী বাক্‌টিরিয়া জৈব পদার্থের পচিবার কারণ। দধ্যম্ল (২), শুক্তাম্ল (৩) প্রভৃতির কারণও বিশেষ বিশেষ বাক্‌টিরিয়া। গলিত মাংসের রস দিয়া শশকেরে টীকা দেওয়াতে কচ সাহেব তাহার মৃত্যু ঘটিতে দেখিয়াছেন। তিনি বলেন যে, তন্মধ্যস্থ এক প্রকার বাকটিরিয়াই মৃত্যুর কারণ। পাস্তর সাহেব বলেন যে, পাখীদিগের ওলাউঠা রোগের কারণও আর এক প্রকার বাকটিরিয়া। (১)

(৩) বাসিলি। বাসিলি সকল দণ্ডাকার। ইহাদের দৈর্ঘ্যের বিস্তর প্রভেদ দেখা যায়। ইহাদের দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির দুই তিন শতাংশ হইতে দ্বাদশ সহস্রাংশ পর্য্যন্ত দেখা যায়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, অবস্থা বিশেষে বাসিলির বীজরেণু উৎপন্ন হয়। জলে খড় মাংস মৃতদেহ পচাইলে তথায় অগণ্য বাসিলি দেখা যায়। কয়েক প্রকার ব্যাধিকর বাসিলি জানা গিয়াছে। কয়েকটী বাস্ত-

---

(১) সুস্থ কুকুরের ও মানুষের লালা দ্বারা ও শশকের দেহে টীকা দেওয়াতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। যাহা হউক, এই অণুজীবময় বীজের টীকা দিয়া পাস্তর সাহেব যে জলাতঙ্ক রোগ চিকিৎসা করিতেছেন, তাহা অনেক ডাক্তার অনুমোদন করেন না। সম্প্রতি তাঁহার চিকিৎসালয়ের যে কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে তাঁহার অবলম্বিত চিকিৎসা প্রণালীর উপকারিতা দূরে থাক, অপকারিতাই প্রমাণিত হয়। ডাঃ বুইসন আবিষ্কৃত উষ্ণ জলের বাষ্প-সেবন বিধি জলাতঙ্ক রোগে কেন প্রযুক্ত হইতেছে না, তাহা বুঝা যায় না। শুনিয়াছিলাম, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বরাহনগরে এক ব্যক্তি উক্ত প্রণালীমতে জলাতঙ্ক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির চিকিৎসা করিতেছেন। তাঁহার চিকিৎসার পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক।

(২) Lactic acid. (৩) Acetic acid.

(১) অষ্ট্রেলিয়া ও নবজীলণ্ডে অসংখ্য শশকের উপদ্রবে তথায় কৃষিকার্য্যের অত্যন্ত ব্যাঘাত জন্মিতেছে। এই কৃষিকণ্টক সমূলে উৎপাটন করিবার জন্য পাস্তর সাহেব পাখীদিগের ওলাউঠার বীজ দিয়া কয়েকটি শশককে টীকা দিবার প্রস্তাব করেন। এই রোগ শশক-জাতীর মধ্যে বিলক্ষণ সংক্রামক। সুতরাং তাহা তথাকার অগণ্য শশক বংশ নির্ম্মূল করিতে পারিবে, এই তাঁহার অভিপ্রায়। তাঁহার মতে এই বাকটিরিয়া পাখীর ও শশকের পক্ষে ব্যাধিকর, কিন্তু অপর জন্তু ও মানুষের পক্ষে নহে।

বিকই ব্যাধিকর কি না, তাহা এখনও নিশ্চিতরূপে জানা যায় নাই। কচ সাহেবের কলেরা বাসিলির নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। এগুলি কিঞ্চিৎ বক্রাকার। এজন্য ইহাদের বাসিলি নাম না দিয়া "স্পাইরিলি" দিলে ভাল হইত। ওলাউঠা রোগীর মলে এই বাসিলি কখন অসংখ্য, কখন অত্যল্প পরিমাণে দেখা যায়। যাহা হউক, এই বাসিলি যে ওলাউঠা রোগের কারণ, তাহা এখনও প্রমাণিত হয় নাই। জলের সহিত ওলাউঠা রোগীর মল মিশ্রিত হইয়াছিল। সেই জল অনেক লোক পান করিয়াও উক্ত রোগগ্রস্ত হয় নাই (১)। এইরূপ ম্যালিরিয়া, (২) ক্ষয়কাশ, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তির রক্তে বিশেষ বিশেষ বাসিলি দৃষ্টিগোচর হয়। গরুদিগের আনথাক্স (anthrax) নামক রোগের কারণ যে এক প্রকার বাসিলি তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। এই বাসিলি লইয়া বিস্তর পরীক্ষা হইয়াছে। সিদ্ধান্তে কোন প্রকার ভ্রম দৃষ্ট হয় না। (৩)

আমরা এইখানেই ক্ষান্ত হইলাম। উপরের দৃষ্টান্ত হইতে এই অণুজীব তত্বের আবশ্যকতা উপলব্ধ হইবে। অণুজীবগণের জীবনেতিহাস ও রোগোৎপাদিকা শক্তি আলোচনা করিলে আমাদের দেহ শত সহস্র অণুজীবের ক্রীড়া ভূমি হইয়াও কেন নষ্ট হয় না, তাহা বিস্ময়কর মনে হয়। জলে, স্থলে, বায়ুতে, সর্ব্বত্র অণুজীব। নিশ্বাসের সঙ্গে (১)

---

(১) See Klein's Micro-organisms and disease. 3rd edition P. 180.

(২) ম্যালেরিয়া রোগে বঙ্গদেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। কিন্তু উহার নিদান নিরূপণে সকলেই উদাসীন। অল্প দিনের পরীক্ষায় নাকি আসামের কালাজ্বরের নিদান বাহির হইয়াছে। আজ বিশ বাইশ বৎসর ব্যাপিয়া ম্যালেরিয়া ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছে, তাহার কিছুই হইল না। রাজা দিগম্বর মিত্রের ভ্রান্ত মত আলোচনা করিতেই কি এত দিন গেল? ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্ত ব্যক্তির শোণিতের রক্তকোষাণুতে (red corpuscles) নাকি এক প্রকার অণুবীজ জন্মে। বাস্তবিক,কোন অণুজীব ম্যালেরিয়া রোগের কারণ কি না, তদ্বিষয় পরীক্ষা করা হয় না কেন?

(৩) জলাতঙ্ক ও আনথ্রাকস রোগ চিকিৎসার টীকা দিবার ব্যবস্থা পাস্তর সাহেব আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাতেই তাঁহার নাম বিখ্যাত হইয়াছে। Anthrax গো মহিষাদির পক্ষে মারাত্মক। ইহার ও জলাতঙ্ক রোগের বীজ জন্তু শরীর হইতে মনুষ্য দেহে সংক্রামিত হইতে পারে। মানুষের বসন্তের রসে ও গোবসন্তের রসে টীকা দেওয়ার যে প্রভেদ, তাহা অনেকেই জানেন। উভয়ের অণুজীব এক নহে। তবে তাহারা পরস্পর নিকট সম্পর্কিত। যাহা হউক, মানুষের বসন্তের রস দিয়া টীকা দেওয়াও যেমন, পাগলা কুকুরের লালা দিয়া জলাতঙ্ক রোগে পাস্তর সাহেবের অবলম্বিত টীকার ব্যবস্থা প্রায় তেমনই। তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে, পাগলা কুকুরের লালার অণুজীব দিয়া একবারে জলাতঙ্ক রোগীর দেহে টীকা না দিয়া, প্রথমতঃ কৃত্রিম খাদ্যে ও অপর প্রাণীর দেহে তাহাকে তিনি জন্মাইতেছেন। ইহাতে সেই অণুজীবের উগ্রতা কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হয়।

ডাঃ হাফকিন কলিকাতা ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনেককে কলেরা টীকা দিয়া তাহাদিগকে উক্ত রোগ হইতে রক্ষা করিতেছেন। সে দিন কাগজে দেখিতেছিলাম, তিনি নাকি বিশ ত্রিশ হাজার লোককে টীকা দিয়াছেন। এত পরীক্ষার মধ্যেও কি উক্ত টীকার কার্য্যকারীতা প্রমাণিত হইল না? সুখের বিষয় এই যে,পাস্তর সাহেবের টীকার ন্যায় ডাঃ হাফকিনের টীকায় তত বিপদ নাই।

(১) সমুদ্র জলসীমা হইতে ৪০০০ হইতে ৮০০০ হাত উচ্চে একটিও অণুজীব কিংবা ছত্রাকের বীজরেণু দৃষ্ট হয় নাই। পারীস নগরের রিভোলি নামক পথের দশ ঘন হিস্ত পরিমিত বায়ুতে ৫৫০০° অণুজীব দেখা গিয়াছিল। বার্লিন নগরের একটা পথের উন্মুক্ত চত্বরের ২৫ সের (মাপের) বায়ু হইতে ৩ সহস্র ব্যাকটিরিয়া ও

ভক্ষ্য দ্রব্যের সঙ্গে তাহারা শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে। নিরন্তর দেহ মধ্যে কি ভয়ঙ্কর সংগ্রাম চলিতেছে! কিন্তু পূতিকর অণুজীবের মধ্যে অধিকাংশই আমাদের কোন অনিষ্ট করে না। জীব শরীরে প্রবিষ্ট করাইলে তাহারা সেখানে বৃদ্ধি হয় না, এজন্য শরীরের কোন অনিষ্টও ঘটে না।

যদিও এই সকল পূতিকর বাক্‌টিরিয়া সাধারণতঃ দেহের কোন অনিষ্ট করে না, অবস্থা বিশেষে তাহাদের রূপ ও গুণের প্রভেদ ঘটে। বস্তুতঃ যাবতীয় বাক্‌টিরিয়াই একেরই রূপান্তর, কি তাহার ভিন্ন ভিন্ন জীবজাতি, এ প্রশ্নের এখনও সদুত্তর পাওয়া যায় নাই। আম্, জাম, গো, মেষ প্রভৃতি জীবগণ বিভিন্ন জাতীয়। নানাবিধ বাক্‌টিরিয়া কি এইরূপ বিভিন্ন জাতীয়? বাক্‌টিরিয়া কেন, অবস্থাবিশেষে অন্যান্য নিকৃষ্ট জীবের এত রূপান্তর ঘটে, যে উহারা একেরই বংশ মাত্র, এ কথা অস্বীকার করা সহজ নহে। অধিকাংশ বাক্‌টিরিয়া ক্ষুদ্র, প্রায় একই প্রকার আকৃতি বিশিষ্ট, এবং অনেক জাতি একত্রে দৃষ্টিগোচর হয়। বাহ্য কারণের প্রভেদে বাকটিরিয়ার আকৃতির প্রভেদ ঘটিতে পারে। যাহা হউক, প্রমাণাভাব বলিয়া এই মত এখন প্রায় পরিত্যক্ত হইয়াছে।

যাবতীয় জৈব পদার্থ পচিবার কারণ তবে বাক্‌টিরিয়া। বাকটিরিয়া সংস্পর্শে আসিতে না পারে, এমনভাবে জৈবপদার্থ রাখিলে তাহা পচে না। জৈব পদার্থ হইতে বাকটিরিয়া নিজ দেহ নির্ম্মাণোপযোগী সোরাজনক, অঙ্গারক প্রভৃতি পদার্থ বহিষ্কৃত করিয়া লওয়াতে তাহা বিশ্লিষ্ট হয়। ইহার ফল স্বরূপ তথায় নূতন সামগ্রীও উৎপন্ন হয়। এই সকল নূতন পদার্থের অধিকাংশই গরল বিশেষ। এই জন্যই গলিত জৈব পদার্থ শোণিতের সঙ্গে মিশ্রিত হইলে স্থল বিশেষে সাংঘাতিক হইয়া উঠে। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, বাকটিরিয়ার বৃদ্ধিতে খাদ্য বস্তুতে এমন পদার্থ নিচয় উৎপন্ন হয় যে, তাহাতে তাহাদের বৃদ্ধি অবাধে ঘটিতে পারে না।

আর একটী কথা। এত প্রকার ব্যাধিকর বাকটিরিয়া শরীরে প্রবেশ করিতেছে, তথাচ শরীর সুস্থ থাকে কিরূপে? সুস্থ দেহের রক্ত মাংসে একটীও অণুজীব দৃষ্ট হয় না, অথচ অসুস্থ বা মৃত হইলে সেই দেহের স্থান বিশেষে বা সর্ব্বত্র তাহারা ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ফল কথা, সুস্থ দেহের অণুজীব ধ্বংসকারী এমন কি গুণ আছে যে, তাহা শত শত্রুর আক্রমণ অনায়াসে প্রতিরোধ করিতে পারে? এই জটিল প্রশ্ন লইয়া অনেক বাক বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে। বিগত খ্রীঃ ১৮৯২ অব্দে মেচনি কফ সাহেব এ সম্বন্ধে যে অভিনব সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, যদিও তাহা বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীতে এখনও তাদৃশ সমাদর পায় নাই, কিন্তু শীঘ্রই তদ্দ্বারা প্রাচীন মতের বিপর্য্যয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। মেচনি কফ সাহেব পূর্ব্বে ওডেসা নগরে প্রাণীবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। সম্প্রতি ইনি পারিস নগরে পাস্তর চিকিৎসালয়ের একজন প্রধান ডাক্তার। ইনি যে তত্ত্বের আবি-

১৬ জাতীয় ছত্রাক উৎপন্ন হয়। কিন্তু স্কুলের ছুটী হইবা মাত্র স্কুল ঘরের ২ সের বায়ু হইতে ৩৭টি বাক্‌টিরিয়ার সত্ত্ব এবং ৩৩ জাতীয় ছত্রাক জন্মে। স্কুল ঘরে বায়ু গমনাগমনের আবশ্যকতা অনেকে বুঝেন না।

ক্রিয়া করিয়াছেন, তাহাকে অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তি ডারবীনের আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বাদের সমতুল্য মনে করেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে তিনি এই তিনটী প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। (১) দেহের কোন স্থানে অণুজীবগণের সংগ্রাম, (২) কাহার সহিত তাহাদের সংগ্রাম এবং (৩) কি ভাবে সংগ্রাম চলিতেছে। তাঁহার যুক্তি প্রণালী এক কথায় বলিতে পারা যায় না। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে,দেহের শোণিতা দিতে যে এক প্রকার শ্বেত-কোষাণু * নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহারাই বাক্টিরিয়াগণকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। তাহারা যে বাক্‌টিরিয়াকে গ্রাস করে, তাহা তাহাদের উদরস্থ বাক্‌টিরিয়া দেখি লেই প্রতীতি হইবে। যাবতীয় বাক্‌টিরিয়া উপযুক্ত খাদ্য না পাইলে জন্মে না বা বলবান হয় না। যে দেহে তাদৃশ খাদ্য থাকে, তথায় তাহারা তাহাদের চিরশত্রু শ্বেত-কোষাণুকে পরাজয় করে এবং তাহার ফলস্বরূপ সেই দেহ ব্যাধি-পীড়িত বা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। †

বড় লোকের কথা সহসা খণ্ডন করিলে ধৃষ্টতা প্রকাশিত হয়। কিন্তু-নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং—হাস্‌কিন, বুচনার প্রভৃতির মত এখনও অপ্রমাণিত হয় নাই। অনেক রোগ একবার হইলে তাহা আর প্রায় হয় না, কিম্বা হইলেও তাহার আক্রমণ তাদৃশ ভয়াবহ হয় না। এই যে রোগ হইতে নির্ভয়ত্ব কিরূপে প্রতিপন্ন হয়? যিনি যাহাই বলুন, যতদিন রোগগ্রহণশীলতার সম্যক কারণ বুঝা না যায়, ততদিন সকল মতই প্রায় সমান হিতকর। শরীরে কোন বিশেষ রাসায়নিক পদার্থের অস্তিত্ব বশতঃই হউক, বা শ্বেত কোষাণুর প্রবল পরাক্রম বশতঃই হউক, ফল একই দাঁড়াইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন জন্তুর শরীরের উপাদান কখনও ঠিক এক বলিতে পারা যায় না। আপনাকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা সুস্থ দেহের আছে। দেহ বিকৃত হইলেই তাহা নানা জীবের আশ্রয় স্থান হয়।

নবাবিষ্কৃত আর একটী কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হওয়া যাইতেছে। কলিকাতা ঢাকা প্রভৃতি নগরের দুর্গন্ধময় নর্দ্দমা হইতে উত্থিত গ্যাসে অণুজীব সংখ্যা অধিক কি? পূর্ব্বে লোকে মনে করিত যে, নর্দ্দমার দুর্গন্ধের সঙ্গে সঙ্গে অনিষ্টকর অণুজীব সকলও বায়ুর সহিত যথেষ্ট মিশ্রিত হয়। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান নিতান্ত দুরূহ। শরীরের "ধাতুভেদে" ইহার অনেক বিষয়ের বৈলক্ষণ্য ঘটে। যাহাতে এক ব্যক্তির স্বাস্থ্যের অনিষ্ট হয়, তাহাতে অপরের কিছুই না হইতে পারে। আবার স্বাস্থ্য বিষয়ে ইচ্ছা শক্তি, অভ্যাস গুণ প্রভৃতির প্রভাবও অল্প নহে। এই সকল কারণে স্বাস্থ্য বিষয়ক অবলম্বনীয় নিয়ম সকলের পক্ষে. প্রকটন করা দুঃসাধ্য। নর্দ্দমা পায়খানার পূতিগন্ধময় গ্যাস মেথরদিগকে আঘ্রাণ করিতে হয় তাহাদের

* White corpuscles or Leucocytes. ইনি ইহাদের নাম দিয়াছেন phagocytes। ডাঃ কচ সাহেব ইহার মতের পোষকতা করেন।

† মেচনি কফের মত প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে আর এক মত প্রচারিত ছিল। প্রায় অধিকাংশ জীববিজ্ঞানবিৎ এই মত পোষণ করেন। মতটি এই যে, দেহ মধ্যে অণুজীবগণের পুষ্টি ও বৃদ্ধি হেতু তথায় এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। এই পদার্থ উক্ত অণুজীবগণের গরল স্বরূপ। সুতরাং যত দিন ইহার প্রভাব থাকে, ততদিন সেই দেহে উক্ত অণুজীব জন্মিতে পারে না।

মৃত্যুর সংখ্যা অধিক, একথা বলা যায় না। তাহারা যে বস্ত্র পদাদি কার্বলিক সাবান দিয়া পরিষ্কার করে, তাহাও দেখা যায় না। "অভ্যাস গুণ" এই কথাটায় অনেক অজ্ঞানতা আচ্ছাদিত হয়। যাহা হউক, প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে লণ্ডনগরে নর্দ্দমার গ্যাসে অণুজীব সংখ্যা নিরূপণ করিবার জন্য বিস্তর পরীক্ষা করা হইয়াছে। পরীক্ষকগণের রিপোর্ট দেখিলে হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, নর্দ্দমার গ্যাস হইতে ব্যাধিকর অণুজীব বায়ুতে বিক্ষিপ্ত হয় না।

এই প্রবন্ধে অনেক কথার অবতারণা করা গিয়াছে। অনেকে হয়ত মনে করিবেন যে, একটাও "কাজের কথা" নয়। বিপদ্ দেখাইয়া তাহার উদ্ধারের পথ না বলিলে বিপদ্ প্রদর্শনে ভয়েরই সঞ্চার হইল মাত্র। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা পর্য্যালোচনা না করিলে উদ্ধারের আকাঙ্ক্ষা হইবে কেন? যাবতীয় ব্যাধিকর অণুজীবের ধ্বংসকারী ঔষধাদির আবিষ্কার হইতে কালবিলম্ব আছে। তবে আলোক যে অণুজীবের প্রধান শত্রু, তাহা সম্প্রতি পরীক্ষিত হইয়াছে। বহুকাল হইতে জীববিদ্যাবিদেরা অবগত ছিলেন যে, আলোক অনেক বাক্‌টিরিয়ার বৃদ্ধির অনুকূল নহে। অন্ধকারেই তাহারা সমধিক পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়। সূর্য্যের আলোক ইহাদের শত্রু, সূর্য্যের তাপ শত্রু নহে। সূর্য্যের অলোকে নানাবর্ণ কিরণ আছে। সেদিন অধ্যাপক মার্শেল ওয়ার্ড সাহেব এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, নীলবর্ণের আলোক পাইলে বাকৃটিরিয়া মরিয়া যায়। স্বাস্থ্য বিষয়ে আলোকের প্রভাব আমরা বিস্মৃত হই। অণুজীব পূর্ণ জলে তড়িৎ সঞ্চালিত করিলেও নাকি তাহারা নিস্তেজ হইয়া পড়ে। ফট্‌কিরিও অণুজীবগণের শত্রু, এ কথাও অনেকে বলেন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

কৃষি-কার্য্যের উন্নতি। (৯)

দ্বিতীয় ভাগ।

শিক্ষা ঘটিত উন্নতি।

প্রথম অধ্যায়।

শিক্ষক।

কৃষি সম্বন্ধে রীতিমত শিক্ষা করিতে গেলে অনেক গুলি বৈজ্ঞানিক বিষয়ের কিছু না কিছু জ্ঞান আবশ্যক। কৃষি শিক্ষার আনুষঙ্গিকরূপে কোন্ কোন্ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আবশ্যক, তাহা বিলাতের কৃষিবিদ্যালয় গুলির পাঠ্য বিষয় সকল পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। বিলাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি কৃষিবিদ্যালয়ে অধীত হইয়া থাকে।—(১) কৃষি-তত্ত্ব। (২) ভূতত্ত্ব। (৩) উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান। (৪) প্রাণি বিজ্ঞান। (৫) রসায়ন শাস্ত্র। (৬) জরিপ ও পরিমিতি। (৭) জমীদারীর তত্ত্বাবধারণ। (৮) জঙ্গল মহলের তত্ত্বাবধারণ। (৯) প্রাণি-চিকিৎসা। (১০) হিসাব-শিক্ষা (Book keeping)।

উল্লিখিত বিষয়ের প্রায় সকল গুলিরই স্থানীয় জ্ঞান মাত্র বিশেষরূপে দেওয়া কৃষিবিদ্যালয় গুলির উদ্দেশ্য; অর্থাৎ, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান, প্রাণি-বিজ্ঞান, জমীদারীর তত্ত্বাবধারণ ইত্যাদি বিষয়গুলি এমন করিয়া বিলাতে শিক্ষা দেওয়া হয়, যেন ছাত্রেরা বিলাতের কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ্ বা খনিজ

পদার্থ ইত্যাদি দেখিলেই তাহাদের কৃষি সম্বন্ধে উপকারিতা বা অপকারিতা, সহজেই বলিতে পারে। অন্যান্য দেশে জমীদারী কিরূপে চালাইতে হইবে, অন্যান্য দেশের জঙ্গলে বা ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ বৃক্ষ বা ওষধি জন্মে, এ সকল বিষয়ে বিলাতে কার্য্যকারী (Practical) শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নহে বলিয়া এ সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় না। যাহা কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়, সমস্তই কার্য্যে পরিণত হইতেছে বা হইয়াছে, এমন অবস্থা সমস্ত প্রত্যক্ষ দেখাইয়া তবে শিক্ষা দেওয়া হয়। বিলাতের কৃষিবিদ্যালয়ের ছাত্রগণ স্থানীয় গাছ ও আগাছা সমস্তেরই নাম ও ব্যবহার জানে। আমরা কেহ কেহ এ দেশেও উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছি, বিলাতে কৃষি-বিদ্যালয়েও উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছি। এদেশের অতি অল্প পরিমাণ বৃক্ষ, গুল্ম বা ওষধির নাম ও ব্যবহার আমরা অবগত আছি,অথবা শিক্ষকদিগের নিকট অবগত হইবার আমাদিগের সুবিধা জন্মিয়াছে। বিলাতে দুই চক্ষে যে সকল গাছ, আগাছা বা ঘাস দেখিতাম, তাহাদেরই চিনিতাম। উদ্ভিদ্ বিজ্ঞান এদেশে বৈজ্ঞানিক ভাবেই শিক্ষা হইয়া থাকে, ব্যবহারিক ভাবে শিক্ষা হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অথবা চিকিৎসা বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যখন এদেশে ব্যবহারিক ভাবে উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানের শিক্ষা পাইবে, তখন কৃষি-শিক্ষার আনুষঙ্গিক ভাবে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকও পাওয়া যাইবে। আপাততঃ কৃষি বিষয়ে শিক্ষা দানের উদ্যোগ করিতে গেলেই দেখা যাইবে, শিক্ষা নিতান্ত অঙ্গহীন হইবে। উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানের বিষয় যাহা বলা হইল, ভূতত্ত্ব এবং প্রাণি-বিজ্ঞান সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা যাইতে পারে। পুস্তক পাঠ করিয়া ভূতত্ত্ব ও প্রাণি-বিজ্ঞানের জ্ঞানলাভ করিয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য সেই জ্ঞান ব্যবহার করা অসম্ভব। ভারতবর্ষীয় ভূতত্ত্ববিৎ ও প্রাণিবিজ্ঞানবিৎ যে কয়েক জন পণ্ডিত আছেন, তাঁহারাই ছাত্রগণকে সঙ্গে সঙ্গে মাঠে ঘাটে লইয়া গিয়া এ সকল বিষয়ের ব্যবহারিক শিক্ষা দিতে পারেন। আমরা প্রায় যে সমস্ত উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান, প্রাণি-বিজ্ঞান অথবা ভূতত্ত্ববিষয়ক শিক্ষক এদেশে দেখিতে পাই, তাঁহাদের মাঠে ঘাটে লইয়া গিয়া যে সে উদ্ভিজ্জ, প্রাণিজ বা খনিজ পদার্থের নাম জিজ্ঞাসা করিলে প্রায় তাঁহারা হাঁ করিয়া থাকেন। বিলাতের কোন উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের শিক্ষককে যদি যে সে একটী গাছ বা পাতা দেখাইলে তিনি তাহার নাম তৎক্ষণাৎ না বলিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি মর্ম্মান্তিক লজ্জিত হয়েন। এদেশে বৈজ্ঞানিক তথ্য (Scientific theories) সম্বন্ধে ব্যুৎপত্তির আদর যতদিন না হ্রাস হইয়া বৈজ্ঞানিক ব্যবহারের (Scientific practices) আদর বাড়িবে, ততদিন কৃষি শিক্ষার আনুষঙ্গিক বিজ্ঞান বিষয়ের উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যাইবে না। উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যাউক বা না যাউক, উপরিলিখিত কয়টী বিষয়েরই শিক্ষা দিবার জন্য এক প্রকারের শিক্ষক পাইবার যে এদেশে উপায় হইয়াছে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। বিষয় বিশেষের অধ্যাপনায় ব্যাপৃত থাকিয়া যে তাঁহারা ক্রমশঃ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন, তাহারও সন্দেহ নাই।

বিলাতের কৃষিবিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষকই কার্য্যক্ষেত্রেও ব্যাপৃত থাকেন। অর্থাৎ যিনি ভূম্যধিকার প্রভৃতি কৃষি সম্ব-

ক্রীয় ব্যবস্থা (Agricultural law) বিষয়ে উপদেশ দেন, তিনি একজন আদালতের উকিল। যিনি জমীদারী ও জঙ্গল মহলের তত্ত্বাবধারণ সম্বন্ধে উপদেশ দেন, তিনি এক-লর্ড্‌এর জমীদারীর তত্ত্বাবধারক। যিনি কৃষিতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দেন, তাঁহার নিজের প্রায় ১০০০ বিঘা চাষের জমী আছে। যিনি কৃষি ইমারত প্রস্তুতের শিক্ষা দেন, তিনি একজন সর্দ্দার-মিস্ত্রি। যিনি রসায়ন শাস্ত্রের উপদেশ দেন, তিনি কৃষকদের জন্য মৃত্তিকা, সার, প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া দিয়া, পৃথক্ অর্থ উপার্জ্জন করেন। এদেশেও কৃষি বিদ্যালয় সংস্থাপন করিতে হইলে শিক্ষক-দিগের বিদ্যালয়ের বাহিরেও স্ব স্ব বিষয়ে কার্য্য করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে তাঁহাদিগের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা আরও গভীর ভাবে জন্মিয়া, অধ্যাপনা সম্বন্ধে সবিশেষ সুবিধা ঘটিবে। কার্য্যক্ষেত্রে ব্যাপৃত থাকিয়া কোন বিষয়ে যেরূপ ঠিক্ ঠিক্ জ্ঞান জন্মে, কেবল পরীক্ষা দ্বারা অথবা ছাত্র-অধ্যাপনায় সেরূপ জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা কথনই থাকে না। কৃষিবিষয়ক আইন ও জমীদারীর তত্ত্বাবধারণ সম্বন্ধে যিনি শিক্ষক হইবেন, তিনি উকীল বা মোক্তার হইলে এবং জমীদারী সেরেস্তায় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে যেরূপভাবে শিক্ষা দিতে পারিবেন, কেবলমাত্র শিক্ষকতা করিয়া সেরূপভাবে কথনই তিনি শিক্ষা দিতে পারিবেন না। যিনি ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দিবেন, তিনি গবর্ণমেণ্টের ভূতত্ত্ব বিভাগের কর্ম্মচারী হইলে যেরূপ ভাবে শিক্ষা দিতে পারিবেন, পুস্তক পাঠ করিয়া, বি-এ, পরীক্ষায় ভূতত্ত্ব বিষয়ে উত্তীর্ণ হইয়া, কেবল মাত্র শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হইলে সেরূপ ভাবে কথনই শিক্ষা দিতে পারিবেন না। যে কয়েকটী বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, ঐ প্রত্যেকটীর সম্বন্ধেই এইরূপ ব্যবস্থা অনায়াসে হইতে পারে। অর্থাৎ, গবর্ণমেণ্টের, জমীদারদিগের অথবা ইংরাজ সওদাগর নীল ও চা-করদিগের অধীনে বিশেষ বিশেষ কার্য্যে ব্যাপৃত, কতক গুলি লোককে মনোনীত করিয়া কৃষি-বিদ্যালয়ে বৎসরে এক বা দুই মাস করিয়া শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত করিলে, সকল বিষয়েরই ব্যবহারিক শিক্ষা হইবে। শিক্ষা প্রধানতঃ কৃষক বালকদিগের জন্যই হওয়া উচিত। একারণ সকল বিষয়েই দেশীয় ভাষায় শিক্ষার বন্দোবস্ত না হইলে শিক্ষা ব্যবহারিক হইবে না। যে কৃষক-বালক ভাল করিয়া ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছে, সে এক রকম কাজের বাহির হইয়া গিয়াছে বলিতে হইবে। সে যে কৃষিতত্ত্ব শিক্ষা করিয়া শিক্ষা সমস্ত কার্য্যে পরিণত করিয়া অন্নের উপায় করিতে সক্ষম হইবে, তাহার আশা অতি অল্প। এদেশে ইংরাজী শিক্ষা, আর বিলাতের গ্রীক ল্যাটিন শিক্ষা প্রায় একই রূপ। বিলাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁহারা শিক্ষা করিতে যান, তাঁহারা প্রধানতঃ পাদ্রি হইবার উদ্দেশেই এইরূপ শিক্ষালাভে কালাতিপাত করেন। বিদেশীয় ভাষায় কোন ব্যবসায় শিক্ষা করিতে হইলেই শিক্ষাটী অল্প বিস্তর অব্যবহারিক হইয়া পড়ে। বিলাতে কোন ব্যবসায় শিক্ষা বিদেশীয় ভাষায় হয় না। কৃষিকার্য্যের উন্নতি কৃষক-দের দ্বারাই করিয়া লইতে হইবে। কৃষি বিষয়ের শিক্ষা পাইতে হইলে যদি কৃষক-বালকের ইংরাজী শিক্ষা করা আবশ্যক হয়, তবে ইংরাজী শিক্ষা করিতে করিতে যে কালক্ষেপ হইবে, তাহাতেই কৃষক বালকগণ অভ্যাস-ভ্রষ্ট হইয়া কৃষকত্ব হারাইবে।

বাঙ্গালী কৃষক বালকদিগের শিক্ষা দিবার জন্ত কার্য্যান্তরলিপ্ত বাঙ্গালী শিক্ষক নিযুক্ত করিলে কৃষিশিক্ষার ব্যয়ও অতি অল্প হইবে। জমীদারী সেরেস্তায় নিযুক্ত স্থানীয় কোন মোক্তার মাসে ৫৲ টাকা পাইলেই সপ্তাহে এক ঘণ্টা করিয়া একটী বিষয় কৃষি বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিয়া যাইতে পারেন। অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষক অপেক্ষাকৃত দুর্মূল্য হইলেও উক্ত বন্দোবস্তে কার্য্য করিলে স্বল্প বেতনে উপযুক্ত লোক পাওয়া যাইতে পারে।

প্রত্যেক বিষয়ে কি ধারায় শিক্ষকদিগকে উপদেশ দিতে হইবে, তাহা বিলাতের কৃষিবিদ্যালয়ে শিক্ষা-প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি সহজেই স্থানীয় শিক্ষকদিগের নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে পারেন। কৃষিতত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষা উক্তরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তিরই সম্পূর্ণ ভার থাকা কর্ত্তব্য। অন্য সমস্ত বিষয়ের শিক্ষা যাহাতে কৃষিকার্য্যের সহায়তা সম্পাদন করে, এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষকে সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখিতে হইলে, কৃষিতত্ত্বের শিক্ষককেই বিদ্যালয়ের সাধারণ অধ্যক্ষতা কার্য্যে নিযুক্ত থাকা কর্ত্তব্য।

কি কৃষিতত্ত্ব কি কৃষিতত্ত্বের আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি, আপাততঃ সকলেরই শিক্ষা অসম্পূর্ণ হইবে। কালসহকারে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া শিক্ষকগণ ক্রমশঃ ব্যবহারিক ভাবে শিক্ষা দিতে পারিবেন। শিক্ষার সহিত নানাবিধ কৃষি বিষয়ক পরীক্ষা শিক্ষা স্কুলের অনতিদূরে অনুষ্ঠিত হইলে, শিক্ষার মর্ম্ম সকল ছাত্রদিগের হৃদয়ে গ্রথিত হইয়া যাইবে।

কৃষি-বিজ্ঞান অতি বিশাল শাস্ত্র। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই শাস্ত্রের কোন অঙ্গেরই আপাততঃ পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিবার উপায় নাই। ভারতবর্ষীয় কৃষিবিদ্যার এক একটী অঙ্গ লইয়া বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলায় উহাদিগের বর্ণনা করিয়া যাওয়া আপাততঃ অসম্ভব। প্রত্যেক অঙ্গ সম্বন্ধেই কিছু কিছু বলা যাইতে পারে। ভবিষ্যতে যে সকল প্রবন্ধ বাহির হইবে, উহাতে কৃষি সম্বন্ধে এইরূপ অঙ্গহীন শিক্ষা মাত্র সন্নিবিষ্ট হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

উদ্ভিদ্ ও জন্তুর সংক্রামক রোগ।

এ বৎসর মধ্যভারতবর্ষে গোধুম সমস্ত 'ধসা' লাগিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দারজিলিং পাহাড়ের উপর আলুর গাছে এক প্রকার রোগ হইয়া গাছগুলি পচিয়া যাইত। এই রোগের কারণ দারজিলিং হইতে কলিকাতার সহরে আলুর চালান প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রতি বৎসরই 'গুটি' হইয়া, 'গলাফুলারোগ' হইয়া বা "বদ্লান রোগ" হইয়া অনেক গোরু মারা যায়। 'কটা', 'কালশিরা' ও 'চুনা' রোগ হইয়া রেশম-পোকা একেবারে নিপাত হইয়া যায়। যে স্থলে বহুল পরিমাণে উদ্ভিদ্ বা জন্তু মরিতে থাকে, অথচ এরূপ মরণের কারণ বুঝা যায় না, সেই স্থলেই প্রায় বুঝিতে হইবে, আণুবীক্ষণিক কোন না কোন সূক্ষ্ম জীবিত পদার্থ ঐ উদ্ভিদ্ বা জন্তুর মধ্যে জন্মিয়া ও বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া উহাদিগের সত্ত্ব গ্রাস করিয়া উহাদিগকে মারিয়া ফেলিতেছে। একই স্থানে অনেক গাছের বা জন্তুর একই রকম রোগ হইলে তাহাদিগকে সংক্রামক রোগ অর্থাৎ আণুবীক্ষণিক জীবিত পদার্থ ঘটিত রোগ, বলিতেই হইবে, এরূপ নহে। হটাৎ যদি কোন স্থানে কোন গূঢ় কারণ বশতঃ গাছ মরিতে থাকে, তবে

প্রথমেই কীট দ্বারা এইরূপ হইতেছে কি না দেখা উচিত। শিকড়ের মধ্যে, স্কন্ধের মধ্যে, পাতার পশ্চাৎ ভাগে, নবপল্লবের অন্তরে, অনুসন্ধান করিলে প্রায়ই কীট দেখা যাইবে। গোরুর, মহিষের ও ছাগলের 'হাওয়ার ব্যারাম' নামে এক প্রকার ব্যাধি হয়। তাহাতে তাহারা ঘাড় বক্র করিয়া মাথা চালাইতে থাকে। এই ব্যাধির কারণও মস্তিষ্কের মধ্যে এক প্রকার কীট। কীট যদি অনুসন্ধান করিয়া না পাওয়া যায়, তাহা হইলেই যে সাধারণ ব্যাধি বিশেষ জীবিতাণু ঘটিত ও সংক্রামক বলিতে হইবে, তাহাও নহে। হটাৎ শীত, গ্রীষ্ম বা বর্ষাধিক্য বশতঃ জন্তুদিগের কোন কোন সাধারণ ব্যাধি জন্মে। এই সকল ব্যাধি জীবিতাণু-ঘটিত হইতেও পারে, না হইতেও পারে। উদাহরণ স্থলে, রেশম ও তসর কীটের 'বসা' ব্যারাম, অন্যান্য জন্তুর 'পেট্-ফুলা' ব্যারাম ও সর্দ্দি, এই সকল ব্যাধির উল্লেখ করা যাইতে পারে। যে সর্দ্দি শীত উত্তাপের উপর নির্ভর করে না, অথচ সংক্রামক ভাব ধারণ করে, ঐ সর্দ্দি নিশ্চয়ই জীবিতাণু ঘটিত। অশ্ব ও মনুষ্যের 'ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা' এই জাতীয় সর্দ্দি। কীট বা হঠাৎ ঋতু পরিবর্ত্তন ঘটিত নহে, এমন কোন রোগ একই স্থানে অনেকের ঘটিলে তাহা যে জীবিতাণু দ্বারা ঘটিয়াছে ও সংক্রামক, এরূপই যে স্থির করিতে হইবে, তাহাও নহে। উদাহরণ স্থলে মনুষ্যের গলগণ্ডের কথা বলা যাইতে পারে। মালদহ জেলার একটী গ্রামের প্রায় সকল লোকেরই গলগণ্ড আছে, কিন্তু পার্শ্বস্থ কোন গ্রামেই লোকের এরূপ গলগণ্ড নাই। ঐ গ্রামটীতে যে কোন বিশেষ প্রকার জীবিতাণু আছে, এরূপ মনে করিতে হইবে না। ঐ গ্রামের কূপ ও পুষ্করিণীর জলে চুণাধিক্য বশতঃই বোধ হয় এই রোগটী ঐ গ্রামে এত প্রবল।

সাধারণতঃ যখনই রাশি রাশি গাছ বা জন্তু কোন গূঢ় কারণ বশতঃ মরিতে থাকে, এবং কীট বা ঋতু পরিবর্ত্তন এই মৃত্যুর কারণ নহে বলিয়া বোধ হয়, তখনই ঐ রোগ জীবিতাণুঘটিত বলিয়া অনুমান করা উচিত। জীবিতাণুঘটিত রোগগুলি অতি সহজে (বায়ু সংযোগে ইত্যাদি) ও অল্প সময়ের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই সকল রোগের দমন ও প্রতিকার বিষয়ে কিছু কিছু জ্ঞান সকল কৃষকেরই থাকা আবশ্যক। নিমেষ ক্ষণ মাত্র দেখিয়া রোগগুলি স্থির রূপে নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব। কৃষিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের দ্বারা রোগ নির্ণয় করাইয়া লইয়া রোগের ব্যবস্থা আনিতে হইলে কৃষকের একটী কার্য্য করা আবশ্যক। কার্য্যটী বড় গুরুত্ব নহে, এক দিবস মাত্র শিক্ষা করিলেই শিক্ষাটী কৃষকেরা পরে নিজে নিজেই কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইবে। পূর্ব্ব কথিত ভাবে, যখন কোন গাছ বা গৃহপালিত জন্তু জীবিতাণুঘটিত রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে, এরূপ অনুমিত হইবে, তখন, সদ্যঃমৃত গাছ বা জন্তুটীর যে অবয়বটী বিশেষ অস্বাভাবিক মনে হইবে, সেই অবয়ব হইতে কিঞ্চিৎ রস লইয়া কতকগুলি ছোট পাতলা কাচ খণ্ডের উপর ঐ রস মাখাইয়া দিতে হইবে। রস যদি ঘন হয়, অথবা রোগগ্রস্ত অবয়বটী যদি শুষ্ক হয়, তবে ঐ পাত্‌লা কাচগুলির উপর পরিষ্কার জল এক এক ফোঁটা দিয়া, কাচগুলি রোগগ্রস্ত অবয়বের উপর ঘসিয়া লইলে ঐ গুলিতে পাত্‌লা ভাবে রস লাগিয়া যাইবে। জন্তু মরিলে তাহার কোন্ অবয়ব বা যন্ত্রটী বিশেষ অস্বা

ভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা স্থির করিবার জন্য ডোমের দ্বারা জন্তুটীকে কাটাইতে হইতে পারে। শিক্ষিত কৃষকদিগের আবশ্যক মতে এটুকু উদ্যোক করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। সূক্ষ্ম কাচগুলির (Cover-glass) উপর পাত্‌লাভাবে রস লইয়া তৎক্ষণাৎ স্পিরিট ল্যাম্পের শিখার উপর দ্রুত অঙ্গুলি চালন দ্বারা রসটী শুকাইয়া লইতে হয়। অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনী দ্বারা কাচগুলি একে একে ধারণ করিয়া স্পিরিট দীপের শিখার উপর কাচের যে দিকে রস দেওয়া হয় নাই, সেই দিকটী রাখিয়া দ্রুত অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে থাকিলে কাচও ফাটিয়া যাইবে না এবং রসও শুকাইয়া যাইবে। পরে কাচের শুষ্ক রসের উপর দুই তিন ফোঁটা করিয়া, জেন্‌সান্ ভাইওলেট্ (Gentian violet), ফিউশিন্ রেড্ (Fuchsin red), অথবা অন্য কোন পাথরিয়া কয়লা-জাত রঙ্গের আরক ঢালিয়া দিতে হয়। কোন কাচখানির উপর পাঁচ মিনিট কাল, কোন কাচখানির উপর দশ মিনিট কাল, কোন কাচখানির উপর অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল, এবং কোন কাচখানির উপর ১০।১২ ঘণ্টা কাল, রং রাখিয়া, পরে পরিষ্কার জল আস্তে ভাবে কাচগুলির উপর পাত করিয়া রং ধুইয়া ফেলিতে হয়। তৎপরে দুই তিন ফোঁটা স্পিরিট কাচগুলির উপর ফেলিয়া আবার জল দ্বারা ভাল করিয়া রং ধৌত করিয়া ফেলিতে হয়। তখন কাচগুলিকে পূর্ব্বের ন্যায় বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনী দ্বারা ধারণ করিয়া, কাচের যে দিকে রস দেওয়া হয় নাই, অর্থাৎ যেদিক এতক্ষণ নিম্নদিকে আবৃত অবস্থায় ছিল, সেই দিকটী পরিষ্কার কাপড় দ্বারা ভাল করিয়া মুছিয়া লইয়া, আবার স্পিরিট ল্যাম্পের শিখার উপর অঙ্গুলি সঞ্চালন দ্বারা রঞ্জিত ও শুষ্ক রসযুক্ত পৃষ্ঠটী শুকাইয়া লইতে হয়। পরক্ষণেই এক বা দুই খণ্ড অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারের মোটা পরিষ্কার কাচের উপর (slides) পাত্‌লা কাচগুলি এক এক ফোঁটা ক্যানেডা বল্‌সাম্ সোলুসান্ Solution of Canada Balsam) নামক এক প্রকার স্বচ্ছ আঠা দ্বারা যুড়িয়া দিতে হয়। সূক্ষ্ম কাচ গুলির যে পৃষ্ঠে রস দেওয়া হইয়াছিল, সেই পৃষ্ঠ যেন আঠার সহিত সংলগ্ন হইয়া মোটা কাচের উপর পতিত হয়। এক দিবস রাখিয়া দিলেই আঠাটী শুকাইয়া যায়। আঠা শুকাইয়া গেলে কৃষিতত্ত্ববিৎ কোন পণ্ডিতের নিকট রোগ নির্ণয়ের জন্য ঐ কাচগুলি সাবধানে তুলা ও কাগজ দ্বারা মুড়িয়া ছোট একটী বাক্‌সে করিয়া ডাকযোগে পাঠাইয়া দিতে হয়। রোগের বাহ্যিক লক্ষণ সকলও ঐ সঙ্গে লিখিয়া পাঠান কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত প্রকরণে শুষ্ক রস, রঞ্জিত ও ধৌত করিলে, কেবল জীবিতাণু গুলিতে রং থাকিয়া যায়। কোন কোন জীবিতাণুতে রং ধরিতে কেবল ৪।৫ মিনিট্ মাত্র লাগে, আবার কোন কোন অণুতে রং ধরিতে ১০।১২ ঘণ্টা লাগে। সূক্ষ্ম কাচগুলির কোন্‌টীর উপর কতক্ষণ রং রাখা হইয়াছে, ইহা কাচগুলির পার্শ্বে পার্শ্বে নির্দ্দিষ্ট থাকা কর্ত্তব্য। কৃষিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত অনুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা ঐ কাচগুলি পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিবেন, রোগটী কোন্ জাতীয় এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে রোগের নাশ বা উপশম হইতে পারে। কৃষক বালকদিগের উপর উক্ত প্রকরণটী শিখাইয়া দিলে দেশের কৃষি উন্নতির একটী প্রধান সোপান স্থাপিত হয়। প্রকরণটী

শিক্ষা করিলে, তাহাদিগের যখন পালে পালে গোরু বা রাশি রাশি শস্য নষ্ট হইবে, তখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই তাহারা ৪।৫ টাকা খরচ করিয়া উপরি উক্ত কয়েকটী সামগ্রী ঘরে আনিয়া রাখিয়া, পুনর্ব্বার ঐ রোগের অথবা জীবিতাণু ঘটিত অন্য কোন রোগের আবির্ভাব হইলে, তাহারা রোগীর তত্ত্ব জানিবার জন্য উৎসুক হইবে ও বিদ্যালয়ে যাহা শিক্ষা করিয়াছে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবে। এরূপ উদ্যোগ দ্বারা কৃষিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মৌলিক গবেষণারও সহায়তা হইবে। সকল প্রকার জীবিতাণু-ঘটিত রোগই যে আবিষ্কৃত অথবা বর্ণিত হইয়াছে, এরূপ নহে। কাচগুলি পরীক্ষা করিয়া ও শিক্ষিত কৃষকদের রোগ সম্বন্ধে বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া কৃষিতত্ত্ববিৎ যদি দেখেন যে, রোগটী আদৌ এ পর্য্যন্ত জানা নাই, তবে তিনি তখনই মৌলিক গবেষণার অনুষ্ঠান করিতে বা অন্য কোন অণুতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত (Bacteriologist) দ্বারা করাইয়া লইতে পারেন।

কৃষিতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের উপদেশ আসিতে আসিতে হয়ত অনেক সময় ক্ষেত্রের ঔষধি অথবা গোষ্ঠের গোরু মরিয়া যাইবে। এরূপ স্থলে ভবিষ্যতে ঐ রোগ হইলে উপদিষ্ট উপায় অবলম্বন ভিন্ন অন্য কোন উপকার হইবে না। আবার শিক্ষিত কৃষক মাত্রেই যে এতদূর উদ্যোগ করিয়া কৃষিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের উপদেশ লইতে অগ্রসর হইবে, তাহারও আশা করা যায় না। একারণ, সংক্রামক রোগগুলি নিবারণ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রকরণও কৃষকদিগকে শিখাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তৃতীয় অধ্যায়ে এই সকল প্রকরণ বর্ণনা করা যাইবে।

শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।

বাঙ্গালা উপন্যাসের বিশেষত্ব। *

নবেল বা উপন্যাস উনবিংশ শতাব্দীর সম্পত্তি। এ শতাব্দীতে অনেক নূতন দ্রব্যের আমদানি হইয়াছে। শিক্ষিত লোকের কাছে এ শতাব্দীর বড় আদর। কেন না, তাহাদের বিশ্বাস, এ শতাব্দীতে রেলওয়ে টেলিগ্রাফের স্ফূর্ত্তির সহিত, সেইরূপ দ্রুত গতিতে, সমগ্র মানবজাতি উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে।

উন্নতি হউক আর না হউক, একটা যে ঘোরতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই শতাব্দী মধ্যে মানবজীবনের গতি অন্য পথে ফিরিয়াছে। এ শতাব্দীর মূল মন্ত্র—স্বার্থ; কার্য্য—struggle

* আমার কোন সাহিত্য-সেবক বন্ধুকে একখানি "প্রতিভা পূজা" উপহার দিয়াছিলাম। তিনি ইংরাজী নবেল পাঠক, বঙ্কিম বাবুর নবেলকে তিনি ভাল বলিতে চান না। তিনি বঙ্কিমবাবুর প্রতিভা স্বীকার করেন না, তিনি আমার প্রতিভা-পূজায় অসন্তুষ্ট হইয়া এক পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই পত্রের যে উত্তর লিখিয়াছিলাম, তাহাই অবলম্বনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। নবেল-লেখক স্বরূপ বঙ্কিমবাবুর স্থান কোথায়, ইহা লইয়া অনেক মতভেদ আছে। যাঁহারা ইংরাজী নবেলকেই আদর্শ করিয়া লন, তাঁহাদিগের নিকট বঙ্কিমবাবুর নবেল তত উচ্চশ্রেণীর বলিয়া অনুমিত হয় না। তাহা না হইলেও, বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস বিচারের স্বতন্ত্র মাপকাঠী আছে। তাহা না পাইলে বঙ্কিমবাবুর নবেল বুঝিতে পারা যায় না। নিম্নের প্রবন্ধে তাহার যথাসাধ্য আভাস দেওয়া হইয়াছে।

for existence অথবা trampling the weak। ইহার একমাত্র যোগ, অর্থ সংগ্রহ, —একমাত্র সাধনা, আত্মসুখ বৃদ্ধি। এ শতাব্দীতে অভিধান হইতে 'পরকাল' কথা উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে—'ইহকাল' সার হইয়াছে। উৎকট সুখ, আমোদ বা ভোগের দিকে একমাত্র লক্ষ্য হইয়াছে। এ শতাব্দীতে নবাবিষ্কৃত বিজ্ঞান কেবল মানুষের বিনাশের জন্য নানারূপ নূতন উপকরণ সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হইয়াছে। দর্শন—ঈশ্বর ও পরকাল উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। ইতিহাস—রক্তাক্ষরে সাধারণ-তন্ত্র ঘোষণা করিতেছে।

সুতরাং সাহিত্যও নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না। এই সুখভোগ-প্রথাও সাহিত্য-কেও নূতন করিয়া সংগঠিত করিয়াছে। পূর্ব্বে সাহিত্য আমাদের শিক্ষার উপকরণ যোগাইত। আর আমাদের জ্ঞানবৃত্তি, চিত্তবৃদ্ধি ও আর সকল বৃত্তির উপযুক্ত অনু-শীলন জন্য সাহিত্যের প্রয়োজন হইত। এখন বিলাসিতার উপকরণ সংগ্রহ জন্য সাহিত্যের উপরও লোকের দৃষ্টি পড়িল—বিলাস বাসনা মানুষকে চারিদিক হইতে এমনি অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। একটু অবসর পাইলে মানুষ কেবল আমোদ খুঁজিতে লাগিল। থিয়েটারে যাইতে হইবে, আমোদের জন্য—সেখানে ফার্স চাই, রং তামাসা চাই—হাল্‌কা 'গান চাই', আমোদ চাই—উচ্চ শ্রেণীর নাটক অভিনয় থিয়েটরে দেখা হইবে না। সাহিত্য সেবা করিতে হইবে, সেও আমোদের জন্য—আরামের জন্য।

উপন্যাসই সেই আরামের জিনিষ। কেন, তাহা বলিতেছি। ছেলেরা ঠাকুরাণী দিদির কাছে অদ্ভুত গল্প শুনিতে ভালবাসে। একটু বড় হইলে ঠাকুরদাদার কাছে বীরত্ব কাহিনী শুনিয়া সুখভোগ করে। আর একটু বয়স থাকিলে পাড়ায় দুই পাঁচ জনে মিলিয়া পাড়ার লোকের কার্য্য সমালোচনা বা কুৎসা করিয়া সুখ পায়। এখন পর্য্যন্ত আমাদের দেশের অনেক নিষ্কর্ম্মা লোক ইহাই আমোদের পরাকাষ্ঠা মনে করে। কিন্তু বিলাতের লোক তত নিশুক নহে। পাঁচ জনে মিলিয়া একপ গালগল্প করা বা পাড়াচর্চ্চা করা তাহাদের অভ্যাস নাই, বা অবসর নাই, কি প্রবৃত্তি নাই। কিন্তু গল্প শুনার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাহাদের কোথায় যাইবে? এই প্রবৃত্তি চরিতার্থ জন্যই প্রথমতঃ, বোধ হয়, ইউরোপে নভেলের সৃষ্টি হইয়াছে। আর সেই জন্যই, বোধ হয়, সেখানে নভেলের এত আদর। যে সামান্য শ্রমজীবী দিনান্তে উৎকট পরিশ্রমের পর একটু অবসর পায়, সেও যদি একটু পড়িতে পারে, তবে সস্তায় ছাপা নভেল কিনিয়া পড়ে। অনেকটা সেই কারণেই, বোধ হয়, আমা-দের দেশেও দোকানি পসারির কাছে বটতলার রামায়ণ ও মহাভারতের এত আদর। যাহা হউক, কেবল যে গল্পের খাতিরে অধিকাংশ বিলাতের লোক নভেল পড়ে—তাহা বেশ বুঝা যায়, শিক্ষার জন্য বড় কেহ নভেল পড়ে না। তাহা হইলে বিলাতে বেণস্তের নভেলের, রেলওয়ে নভেলের, সেনসেসনল নভেলের বা ফ্যাসনেবল নভেলের, কি সেই রূপ শুধু গল্প-সম্বল অন্য অসার নভেলের এত আদর ও কাট্‌তি হইত না। আর তাহা হইলে বিলাতে পুলিস রিপোর্ট লোকে এত আগ্রহের সহিত পাঠ করিত না।

আমাদের দেশেও বিলাতী সভ্যতার

অনেকগুলি উপকরণের আমদানি হইয়াছে। সাহিত্যের মধ্যেও বিলাসের উপকরণ প্রবেশ করিয়াছে। অনেকটা সেই কারণে আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যেও অনেক নভেল বা উপন্যাস দেখিতে পাই। 'হরিদাসের গুপ্তকথা' শ্রেণীর অনেক নভেল যে সেই কারণে বাঙ্গালা ভাষায় স্থান পাইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

সে যাহা হউক, প্রথম অবস্থার নভেল যেরূপই থাকুক, দ্বিতীয় স্তরে উহার অনেক অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমরা সেই দ্বিতীয় স্তরের কথাই বলিব। গল্প আবাল বৃদ্ধ সকলেরই মনোরঞ্জন করে, সুতরাং এই গল্প উপলক্ষ্য করিয়া দ্বিতীয় স্তরে অনেক প্রতিভাশালী লোক সাধারণকে নৈতিক উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন—ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি সহজ করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন, সমাজতত্ত্বের কূট বিষয় সাধারণের বুদ্ধিগম্য করিতে চেষ্টা করিলেন—মানুষের হৃদয় বিশ্লেষণ করিতে লাগিলেন, বাহ্যজগতের সহিত মানব মনের সম্বন্ধ দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইতে লাগিলেন। কেহ বা উপন্যাসকে আপনার কল্পনার উদ্ভাবনা শক্তির শিল্পচাতুর্য্যের বা উৎকৃষ্ট কবিত্ব বিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র করিয়া লইলেন। অন্যদিকে অনেক হৃদয়বান লোক উপন্যাসরূপ উপকরণ দ্বারা সাধারণকে মাস্‌কে (mass) উন্নত করিতে চেষ্টা করিলেন। এখন অনেক উপন্যাস হইয়াছে, যাহার গল্পাংশ নাম মাত্র বা উপলক্ষ্য মাত্র, কিন্তু যাহাতে ভাবিবার, বুঝিবার বা চিনিবার জিনিষ অনেক আছে। পূর্ব্বে একবার এই কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সুতরাং আজ তাহার উল্লেখ করিব না।

কেবল একজনের যত্নে, চেষ্টায় ও প্রতিভাবলে বাঙ্গালা নভেলও এই দ্বিতীয় স্তরে আরোহণ করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে—বাঙ্গালা নভেলের অনেক বিশেষত্বও জন্মিয়াছে। সে বিশেষত্ব বাঙ্গালীর অথবা হিন্দুর জাতীয় জীবনের বা জাতীয় সংস্কারের পরিচায়ক। আমরা আজ সেই কথাই বুঝিতে চেষ্টা করিব।

কিন্তু এ কথা বুঝিবার আগে, পূর্ব্বকার কথা বুঝিতে হইবে। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বেও ইউরোপে উপন্যাস ছিল, আর আধুনিক বাঙ্গালা উপন্যাসের আগেও এ দেশে উপন্যাস ছিল। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর উপকরণে কিছু বিশেষত্ব আছে। ওদেশের ইনিয়ড, ইলিয়ড্, অডেসির সহিত আমাদের দেশের মহাভারত, রামায়ণ বা পুরাণের বিশেষত্ব আছে। ওদেশের বাকেসিওর ডিকামিরণ ডনকুইকসট্ প্রভৃতির সহিত বা আরব্য কি পারস্য উপন্যাসের সহিত এ দেশের কাদম্বরী বা দশকুমার চরিতের পার্থক্য আছে। সে দেশের ঈষপের গল্পের সহিত আমাদের দেশের পঞ্চতন্ত্র বা হিতোপদেশের প্রভেদ আছে। সেই প্রভেদ বুঝিলে আমরা আধুনিক দেশী ও বিদেশী নভেলের পার্থক্য বুঝিতে পারিব। কেন না, যে কারণে পূর্ব্বে উক্তরূপ পার্থক্য ঘটিয়াছিল, সে কারণ এখনও অনেকটা বিদ্যমান আছে।

এই বিশেষত্বের প্রথম কারণ, হিন্দুর ধর্ম্ম ভাব। এই ধর্ম্মভাব কিরূপ হিন্দুর হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়া আছে—ইহা কিরূপে হিন্দুর প্রত্যেক কার্য্য নিয়মিত করিতেছে, তাহা আর হিন্দুকে বুঝাইতে হইবে না। এই জন্য, উপন্যাস লিখিতে গিয়াও হিন্দু এই ধর্ম্ম

ভাব ত্যাগ করিতে পারে নাই। হিন্দুর কাব্য, ইতিহাস প্রায় সকলই ধর্ম্মগ্রন্থ হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দুর নাটক নভেলেও এই ধর্ম্মভাব প্রবেশ করিয়াছে। আগেকার কথা ছাড়িয়া দাও, এই পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রাপ্ত দেশে এখন থিয়েটারে ধর্ম্মগ্রন্থ অভিনীত হইতেছে, উপন্যাসে ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝান হইতেছে, কাব্যে (কুরুক্ষেত্র প্রভৃতিতে) ধর্ম্ম প্রবেশ করিয়াছে।

আরও এক কথা আছে। পিতৃ মাতৃ ভক্তি, সন্তান বৎসলতা, দাম্পত্য-প্রণয়, দেশ ভক্তি, প্রভৃতি আমাদের যে সকল মনোবৃত্তি আছে ঈশ্বরে ভক্তি অথবা সাধারণ ধর্ম্ম প্রবৃত্তিও সেইরূপ আমাদের মনের একটা অতি প্রধান বৃত্তি। এই ভক্তি বৃত্তি বা ধর্ম্মভাব কত রূপে মানুষের হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হইতে পারে—কিরূপে তাহা মানুষের সমস্ত জীবন রঞ্জিত করিতে পারে, কিরূপে মানুষের অন্য সমস্ত বৃত্তির উপর একাধিপত্য করিতে পারে, তাহা জগতের মধ্যে কেবল হিন্দু কবিই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদ, বশিষ্ঠ, প্রভৃতির চরিত্র-সৃষ্টি কেবল একমাত্র হিন্দু কবিই করিতে পারিয়াছেন। আজিও হিন্দু-কবি ধর্ম্ম জীবন চিত্রিত করিতে চেষ্টা করেন। ধর্ম্মবৃত্তির স্ফূর্ত্তি, পরিণতি ও প্রভাব দেখাইতে যত্ন করেন। তাই বিল্বমঙ্গলে, দেবীচৌধুরাণীতে বা চন্দ্রশেখরে কবি ধর্ম্ম চরিত্র অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইউরোপে ধর্ম্ম প্রবৃত্তির বুঝি এত স্ফূর্ত্তি হয় নাই। সেখানে এত নভেল, নাটক ও কাব্য সৃষ্টি হইলেও, একখানা নভেল কি নাটকে এই ধর্ম্ম বৃত্তির গতি ও কার্য্য দেখাইতে চেষ্টা করা হয় নাই। হুগো, বালসাক্ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস লেখকগণ মানুষের এক একটা বৃত্তি লইয়া, অন্য সমুদায় বৃত্তিগুলিকে তাহাতে ডুবাইয়া, শুধু একটা বৃত্তিকে অত্যন্ত প্রবল করিয়া, কৌশলে তাহার গতি ও পরিণতি এবং মনুষ্য হৃদয়ের উপর তাহার আধিপত্য বুঝাইয়াছেন। সেই এই বৃত্তি-গুলিকে একে একে লইয়া, তাহাদের রক্ত মাংসের শরীর দিয়া মানুষ সাজাইয়া তাহার কার্য্যপ্রণালী বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু কেহই ধর্ম্ম বৃত্তির বিশ্লেষণ করিয়া দেখান নাই। এই ধর্ম্ম বৃত্তির বিশ্লেষণ হিন্দুর নিজের সম্পত্তি, আর ইহাই বিলাতী ও দেশী উপন্যাসের পার্থক্যের প্রধান কারণ।

এই পার্থক্যের দ্বিতীয় কারণ—হিন্দুর দর্শন। হিন্দু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, দৈব বা অদৃষ্ট ও পুরুষকার এই দুইটী শক্তি মানুষকে নিয়মিত করে। ইউরোপীয় দার্শনি-কগণ Free-will ও Necessity লইয়া বহুদিন ধরিয়া তর্ক বিতর্ক করিয়া, শেষ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, Necessity ই সব; অর্থাৎ মানুষ ঘটনাচক্রের দাস—অবস্থার ক্রীড়া পুত্তলি, তাহার স্বাধীন ইচ্ছা নাই—কেন না, সে ইচ্ছাও এই অবস্থার দ্বারা নিয়মিত। সুতরাং হিন্দুর অদৃষ্টবাদ ও ইউরোপের অদৃষ্টবাদে অনেক প্রভেদ। আর এই প্রভেদ জন্য দেশী ও বিলাতী চরিত্র সৃষ্টিতেও প্রভেদ জন্মিয়াছে। বিলাতী দর্শন মতে মানুষ যেন কাদার ডেলা, কি মোমের বাতি, ঘটনার পর ঘটনা আসিয়া তাহাকে বাছিয়া ছাঁকিয়া একরূপ করিয়া গড়িয়া লয়। বিলাতী দর্শনকার মানুষের পূর্ব্বজন্ম স্বীকার করেন না। মাতৃগর্ভে তাহার প্রথম জন্ম হয়—এবং সে কেবল পিতামাতার নিকট কিছু সংস্কার লইয়া এই

সংসারে প্রথম প্রবেশ করে। কাজেই সংসার তাহাকে গড়িয়া লয়।

হিন্দুর মতে মানুষ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার-আবরণে আবৃত হইয়া জন্মগ্রহণ করে। সে আবরণ বড় কঠিন। শম্বুকের বাহিরের খোলার মত কঠিন. সংসারের ঘটনার পর ঘটনার আঘাতে তাহা ভাঙ্গিয়া যায় না, তাহার আকার বড় পরিবর্ত্তন হয় না। যদি ভাঙ্গে, তবে বোধ হয় তাহার জীবত্ব পর্য্যন্ত লোপ হয়। হিন্দুর মতে মানুষ অদৃষ্টরূপ হল (Hall) মাকা রূপা। তাহাতে বড় খাদ চড়ে না।

এই দুই দার্শনিক মতের পার্থক্য হইতে দেশী ও বিলাতী উপন্যাসে ও কাব্যে চরিত্র সৃষ্টির প্রভেদ হইয়াছে। বিলাতী উপন্যাস-লেখক ঘটনার পরে ঘটনা আনিয়া তাহার দ্বারা মনুষ্য চরিত্র গড়িয়া লন—বা চরিত্রের কার্য্য প্রণালী দেখাইয়া দেন। মানুষের চারিদিকের অবস্থা গুলি বিশেষরূপে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার দ্বারা চরিত্র সৃষ্টি করেন। *

হিন্দু-উপন্যাস লেখককে সেরূপে মনুষ্য চরিত্র বুঝাইতে হয় না। হিন্দু-উপন্যাস লেখক দেখাইতে চান যে, বাহ্য ঘটনায় বা অবস্থায় মানুষকে বড় পরিবর্ত্তিত করে না। সে অবস্থাগুলি অর্থাৎ মানুষের চারিদিকের আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক অবস্থাগুলি তাহাকে ক্লেশ দিতে পারে, কিন্তু অভি-ভূত করিতে পারে না—ভাঙ্গিতে পারে কিন্তু নোয়াইতে পারে না।

এই জন্যই দেখা যায়, হিন্দু কবি প্রায়ই আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করেন। পূর্ব্বকার রামায়ণ, মহাভারত হইতে আধুনিক উপন্যাস পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই হিন্দু কবির চেষ্টা, আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি। অদৃষ্ট ও পুরুষকারের সহিত যুদ্ধে, পুরুষকারের জয় ঘোষণা করাই হিন্দু কবির প্রধান উদ্দেশ্য। আদর্শ চরিত্রে পুরুষকারের প্রাধান্য দেখান হয়, সংসারের নানা বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিয়া পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সংস্কারের সহিত সংগ্রাম করিয়া, মানুষ আপনার মনুষ্যত্ব অক্ষয় রাখিতেছে, ইহাই দেখান হয়। এই আদর্শ চরিত্র মানু-ষের শিক্ষার স্থান। এই

"উচ্চ তব আদর্শ সৃজন,
জীবনের আঁধার সাগরে
নাবিকের আলো-নিদর্শন।"

কিন্তু ইউরোপীয় কবিগণ কাব্যে বা উপন্যাসে প্রায়ই একরূপ আদর্শ চরিত্র সৃষ্টির চেষ্টা করেন নাই। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, অর্জ্জুন প্রভৃতির ন্যায় আদর্শ চরিত্র কোন পুরাতন ইউরোপীয় কাব্যে চিত্রিত হয় নাই। পূর্ব্বকার কথা যাউক, আমাদের দেশের চন্দ্রশেখর, প্রতাপ, সত্যানন্দ, সূর্য্যমুখী, লবঙ্গলতা, প্রফুল্ল ও শ্রীর মতও আদর্শ চরিত্র-চিত্র বিলাতী নভেলে বড় বেশী পাওয়া যায় না। *

* গত মে মসের নাইন্‌টিনথ্ সেঞ্চুরিতে (P 719) নিম্নোক্ত কয়টী কথা পাইলাম। বিলাতী নভেল যে কিরূপ উপকরণে বা কি ধাতুতে গঠিত—বিলাতী পণ্ডিত তাহা এক্ষণে কতকটা বুঝিতে পারিতেছেন, ইহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই।:—

"Literature is following as it always must, the metaphysics, or antimetaphysics which prevail in its time; and we observe accordingly a marvellous decline in the poetical value of the writings now held up to our admiration. A crude and violent Realism, falsely so-called, usurps the place of honor, while trifling personal gossip, fills our journals and is advertised as their most notable attraction at every railway bookstall."

* পণ্ডিত চূড়ামণি রাস্কিন তাঁহার Queen's Gardens শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে, বিলাতী কবি সেক্সপিয়র বা স্কট কেহই বড় আদর্শ নর-চরিত্র সৃষ্টি করেন নাই, কয়টী বিলাতী আদর্শ নারী চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন মাত্র। অন্য কবির ত কথাই নাই।

এই আদর্শ চরিত্র স্বষ্টির উদ্দেশ্য মানুষকে শিক্ষা দেওয়া, মানুষকে কর্ত্তব্যের পথ দেখাইয়া দেওয়া। হিন্দুর আজিও শিক্ষার প্রবৃত্তি আছে, তাই এ দেশে আদর্শ চরিত্র চিত্র চলিতে পারে। কিন্তু ইউরোপের লোক কাব্য ও উপন্যাসে শিক্ষা বড় চাহে না। তাহারা আমোদ চায়, চিত্ত রঞ্জন চায়। সেই জন্য ইউরোপে আদর্শ চরিত্র বড় চিত্রিত হয় না।

পূর্ব্বোক্ত হিন্দুর দর্শনের বিশেষত্ব হইতে উপন্যাসে আর একরূপ বিশেষত্ব হইয়াছে। হিন্দু কার্য্যানুসন্ধান করেন—ইউরোপীয় দার্শনিক কারণানুসন্ধান করেন। হিন্দুর চিন্তাপ্রণালী *a priori*, ইউরোপীয় চিন্তা প্রণালী *a posteriori*। হিন্দু সেই জন্য উপন্যাস ও কাব্যে চরিত্র স্বষ্টি করেন—ইউরোপীয় কবি দার্শনিক চরিত্র বিশ্লেষণ করেন। মানুষ বিশেষে অবস্থা ও অনুবর্ত্তী ঘটনার সহিত কিরূপ সংগ্রাম করে, চরিত্র স্বষ্টি করিয়া হিন্দু কবি তাহাই দেখান। বিলাতী কবি, ঘটনার দ্বারা—অবস্থার ঘাত প্রতিঘাতে চরিত্র কিরূপে পরিবর্ত্তিত হয়, গঠিত হয়, আকুঞ্চিত বা প্রসারিত হয়, তাহাই দেখান। হিন্দুর চরিত্র চিত্র synthetic। বিলাতী কবির চরিত্র চিত্র analytic। একজন প্রাণবিশিষ্ট জীবের বিশেষত্ব দেখান; আর একজন শবচ্ছেদ করিয়া ভিতরের শিরা, ধমনি বা হৃদয়ের অবস্থান বা বিশেষত্ব বুঝাইয়া দেন। একজন স্থপতি—বিশাল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া দর্শককে মোহিত করেন; আর একজন, পুরাতন প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া, তাহার কোন্ স্থান জীর্ণ হইয়াছে, দেখাইয়া দেন বা ইট কাটের পরিমাণ করেন। একজন জীবন্ত মানুষকে দেখান—সমাজতত্ত্ব বুঝান; আর একজন মানুষ মারিয়া তাহার শবচ্ছেদ করিতে বসেন, সমাজ ভাঙ্গিয়া তাহার ভিতরের ক্ষত বাহির করেন। একজন গড়েন, আর একজন ভাঙ্গেন। এই কারণে দেশী উপন্যাসের আর এক বিশেষত্ব হইয়াছে। ইউরোপীয় কবি চরিত্র বুঝাইবার জন্য, বাহ্য জগতের সহিত মানব মনের সম্বন্ধ দেখাইবার জন্য বাহ্য ঘটনাগুলিকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়া দেন। সেই ঘটনার সহিত মানব মনের ঘাত প্রতিঘাত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অঙ্কিত করেন। রামা মুদী বা পুঁটেতেলী যে কোন লোকের হউক, চরিত্র লইয়া তাহার বিশ্লেষণ করিতে বসেন। সে কোন দিন কি দিয়া ভাত খাইল, কোন্ মুখে বসিয়া কাহার সহিত কিরূপ কথা কহিল, খুঁটী নাটী সমস্তই বিলাতী কবি অঙ্কিত করেন। বিলাতী পাঠকেরও ধন্য সহিষ্ণুতা, ধন্য পরচর্চ্চা প্রবৃত্তি যে সেই সব পড়িয়া আমোদ পান।

হিন্দু কবি কখনও এত খুঁটী নাটী চিত্রিত করিতে চান না। আর সেরূপ খুঁটী নাটী চিত্রিত করার তাহার প্রয়োজনও হয় না। হিন্দু কবি অএলপেন্টিং করেন—বিলাতী কবি ওয়াটার কলার পেন্টিং করেন। কাছে হইতে অএলপেন্টিং বড় কদাকার দেখায়। বোধ হয় যেন কতকগুলা রং যথেচ্ছা লাগান হইয়াছে—যেন রং ধেবড়ে আছে, প্রায় যেন কালীঘাটের পট। তাহাতে একটা সূক্ষ্ম লাইন নাই—সব মোটা। কিন্তু সেই চিত্রই আবার দূরে উপযুক্ত স্থানে ধরিলে অমূল্য বলিয়া মনে হইবে—কবিত্বের, স্বষ্টি কৌশলের চরম বিকাশ বলিয়া বোধ হইবে। ওয়াটার কলারের ছবি হঠাৎ চটকদার বটে

তাহাতে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম লাইনগুলি বেশ ফুটান থাকে, কাছ হইতে বেশ সুন্দর বোধ হয়। কিন্তু ওয়াটার পেণ্টিং যত ভাল হউক না, তাহার অয়েলপেণ্টিংয়ের সহিত তুলনাই হয় না। ওয়াটার কলার পেণ্টিংয়েতে মূল ছবি বুঝাইবার জন্য আস্‌পাস্ যেমন পরিষ্কার করিয়া আঁকিতে হয়, বিলাতী নভেল-লেখক সেইরূপ আস্‌পাসে অধিক লক্ষ্য রাখেন। যে অয়েলপেণ্টিং করে, তাহার সেরূপ লক্ষ্য রাখিতে হয় না।

এই বিশেষত্বের আর এক ফল—দেশী উপন্যাস খুব বড় হয় না। যে চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে বা যে ঘটনা চিত্র করিতে দেশীয় কবির বিশ পৃষ্ঠার প্রয়োজন হয়—বিলাতী কবির সেখানে অন্ততঃ এক শত পৃষ্ঠা চাই। বিলাতী সভ্য (fashionable) নভেল—তিন বালাম করা চাই। অল্প করিয়া, সহজ করিয়া সমস্ত বুঝান উচ্চ দরের কবির কাজ। কোন সমালোচক বলিয়াছেন "Talent for easy writing—which is easy reading is almost unknown among German Novelists." জর্ম্মান নভেল লেখক কেন—প্রায় সকল ইউরোপীয় নভেল লেখকের সম্বন্ধেই এ কথা খাটে। উক্ত সমালোচক (G. Gorden.) বলিয়াছেন,—"Can any one point out to us one of their novelists, who is capable of making his hero and heroine enter a room, at the very climax of their fate, without delaying the catastrophe, to tell us, that it is a square room, with four walls, and three windows, that each window has two white muslin curtains, carefully tucked back, that there are six chairs and a sofa ; * * ; we may be thankful if we are spared a description of the artificial ivy in the windows, and the Vienna Pianoforte, if the scene lies among such luxiries." অর্থাৎ ইউরোপীয় নভেল লেখকগণের খুঁটা নাটীর দিকে দৃষ্টি এত অধিক যে, বিয়োগান্ত উপন্যাসে বিষাদের শেষ ভীষণ দৃশ্য দেখাইবার সময়ও আনুষঙ্গিক সামান্য বিষয়ের বিবরণ না দিয়া থাকিতে পারেন না। এই সমালোচক আর এক স্থানে বলিয়াছেন.—"If men write profusely, what do the women do? if they use ten words when five would do and tell how many branches there are on every tree in the landscape, the women, good souls, count the leaves on each twig, with an abundance of exclamations and expletives, which take away one's breath." অর্থাৎ বিলাতে এই বিষয়ে মহিলা-উপন্যাস-লেখকগণ, পুরুষ উপন্যাস লেখকদের ছাপাইয়া উঠিয়াছে, একজন ডালে ডালে বেড়ায়—আর একজন পাতায় পাতায় যায়। সুখের বিষয় যে, বিলাতী অনুকরণ প্রবৃত্তি বশে আমাদের দেশে উপন্যাসে এখনও এ দোষ বড় দেখা যায় নাই।

এই বিশেষত্ব হইবার আর এক কারণ, হিন্দু অল্প কথায় চিরকালই অনেক ভাব ব্যক্ত করিতে পারে। পূর্ব্ব হইতেই হিন্দু কবি দার্শনিকদিগের মধ্যে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত আছে। সূত্র যুগে এই প্রথার কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছিল। টীকা বা টীকার টীকা না হইলে সূত্র বুঝা যায় না। অনেক সময় মল্লিনাথ না থাকিলে কাব্যও বুঝা যাইত না। কাজেই পূর্ব্ব হইতেই আমাদের দেশে অল্প কথায় অনেক ভাব বুঝাইবার ক্ষমতার চর্চ্চা হইয়াছিল। হিন্দু কবি সেই জন্য আজিও বিলাতী শিক্ষা পাইয়াও এত দূর খুঁটা নাটীর দিকে যাইতে চাহেন না। ইহা আমাদের শুভগ্রহ সন্দেহ নাই। কেন না, "art is long, life is short"। যে শিক্ষা চাহে, বৃত্তির অনুশীলন চাহে, কাব্য উপন্যাস হইতে যে কেবল জ্ঞানার্জ্জন করিতে বা চিত্তবৃত্তির অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হয়, যে অসার আমোদ চাহে না—ঠাকুরাণীদিদির গল্প চাহে না, শ্যাম রাম কি দিয়া খায়, কেমন করিয়া শোয়, জানিতে ইচ্ছা করে না, লোকের কুৎসা করিয়া যা

কুৎসা পড়িয়া সময় নষ্ট করিতে চাহে না— সঙ্গী জুটিল না, সুতরাং তাস পাসা খেলা হইল না, বলিয়া নভেল পড়িয়া সময়টা কোন রকমে কাটাইতে চাহে না—তাহার পক্ষে ইহা শুভাদৃষ্ট বলিতে হইবে। তাহাকে অবগাহন জন্য বিস্তীর্ণ নদীতে নামিয়া সারা নদী ঘুরিয়া, নিয়ত প্রমাণের অধিক জল না পাওয়ায়, বৃথা ফিরিয়া আসিতে হয় না। অল্প কথায় অধিক ভাব প্রকাশ করাই প্রকৃত কবিত্ব, যে তাহা পারে না, সে প্রকৃত কবি নহে। উহার উপন্যাসে যতই চটক্ থাকুক্ না কেন, প্রকৃত কবিত্ব তাহাতে নাই। "Brevity is the soul of wit" বিলাতী কবি তাহা বুঝে না।

হিন্দুর উপন্যাসে বা কাব্যে বর্ণনা বাহুল্যের অভাবের আর এক কারণ আছে। হিন্দুর দূর দৃষ্টি। সৃষ্টিতত্ত্ব, জগৎতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব প্রভৃতি উৎকট বিষয়গুলি হিন্দুর কাছে অতি সহজ ও বোধগম্য বিষয়। ইউরোপীয় দার্শনিকগণ এই সব তত্ত্ব লইয়া আজিও মারামারি করিতেছে। তাহাদের নিকট এ সকল তত্ত্ব অন্ধকারময় ধোঁয়া ধোঁয়া। হিন্দুর কাছে, এমন কি সামান্য কৃষকের কাছেও, এ সকল তত্ত্ব প্রতিভাত। জ্ঞানের গভীরতা না থাকা জন্যই বল, আর যে কারণেই বল—এই সকল বিষয় হিন্দুর নিকট আলোময়। প্রাচীন আর্য্যঋষির শিক্ষা তাহার হাড়ে হাড়ে এইরূপ বিঁধিয়াছে। সে সৃষ্টি হইতে প্রলয় পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎটাকে ভগবানের উদরে হস্তামলকবৎ দেখিতে পায়। যাহার এত দূরদৃষ্টি, সামান্য বিষয়ে তাহার কাজেই অমনোযোগ।

ইহা ছাড়া আরও এক কথা আছে। কবির দর্শন দুইরূপ—এক দূরদর্শন, আর এক সূক্ষ্মদর্শন। একজন, দূরবীক্ষণ ধরিয়া, আমাদের চর্ম্ম চক্ষের অগোচর বহির্জগতের ও অন্তর্জ্জগতের দূরস্থিত বিষয় দেখাইয়া দেন। উচ্চ হইতে আমাদের ডাকিয়া লইয়া উপরে তুলিতে চেষ্টা করেন। আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া আমাদের আহ্বান করেন। ব্যক্ত জড়ের অন্তরালে অব্যক্ত আত্মা দেখাইয়া জগতের সহিত, সংসারের সহিত আমাদের নূতন সম্বন্ধ পাতাইয়া দেন। আর একজন অণুবীক্ষণ ধরিয়া আমাদের সাধারণ চক্ষের অগোচর ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বস্তুটাকেও দেখাইয়া দেন। হৃদয়ের অন্ধতম প্রদেশের অতি সঙ্গোপনে লুকাইত ভাবগুলির গতি ও প্রবৃত্তি বুঝাইয়া দেন; বাহ্যজগতে সামান্য ফুল বা তৃণের মধ্যে এমন সৌন্দর্য্য, এমন উদ্দীপনা, এরূপ ভাব দেখান যে, তাহা "too deep for tears" হয়, আমাদের অধীর করিয়া তুলে। তাঁহারা বিন্দুর মধ্যে ব্রহ্ম দেখেন, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র নীচজাতীয়, দারিদ্র্যপীড়িত অবস্থায় অভিভূত মানুষের মধ্যেও ব্রহ্মত্ব দেখাইয়া দেন—ক্ষুদ্রতম ঘটনার মধ্যেও বিধাতার বজ্রহস্ত দেখান—সমস্ত জগতের অলঙ্ঘ্য নিয়মের ছায়াপাত করান।

এই দূরদর্শন হিন্দু কবির, আর সূক্ষ্মদর্শন পাশ্চাত্য কবির। আমাদের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে এই দূরদর্শন আছে। আর ইউরোপের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস শেষোক্ত কবির রচিত, তাহাতে অন্তর্দর্শন ও সূক্ষ্মদর্শন আছে। এ সূক্ষ্ম দর্শনের জন্য বৃথা বাগাড়ম্বর প্রয়োজন হয় না—খুঁটী নাটী লইয়া ব্যস্ত থাকিতে হয় না। যিনি প্রকৃত কবি—তাঁহার এরূপ কাব্যাংশে দোষ হয় না।

অতএব দেখা গেল, বিলাতী উপন্যাস analytic বা বিশ্লেষণ পূর্ণ, দেশী উপন্যাস

synthetic বা সংগঠন মূলক। বিলাতী নভেল অধিকাংশ Realistic, দেশী উপন্যাস idealistic। দেশী উপন্যাস সৃষ্টি করে, বিলাতী উপন্যাস ধ্বংস করে। দেশী উপন্যাস আদর্শ গড়ে—বিলাতী উপন্যাস আদর্শ ভাঙ্গে। দেশী উপন্যাস সমাজ সংস্কার করে—বিদেশী উপন্যাস সমাজ বিপ্লব ঘটায়। দেশী উপন্যাস আমাদের দূরাকাঙ্ক্ষা দেয়, বিলাতী উপন্যাস অনুরাকাঙ্ক্ষা জন্মায়। দেশী উপন্যাস অয়েল-পেণ্টিং, আর বিলাতী উপন্যাস ওয়াটার কলার পেণ্টিং। দেশী উপন্যাস শিক্ষা দেয়, বিলাতী উপন্যাস আমোদ দেয়। দেশী উপন্যাস ধর্ম্মবৃত্তি অঙ্কিত করে, ভক্তিবৃত্তির গতি ও কার্য্য দেখায়—বিলাতী উপন্যাস ধর্ম্মবৃত্তির চিত্র অঙ্কিত করে না। ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝায় না, কেবল বিষয় বাসনা বাড়ায়। আমরা বিলাতী উচ্চ শ্রেণীর উপন্যাসের কথা বলিতেছি, নচুবা বলিতাম যে, বিলাতী উপন্যাসে আমাদের অধম বৃত্তি অঙ্কিত করে, উত্তেজিত করে। দেশী উপন্যাসে মনুষ্যত্বের ও পুরুষকারের স্ফূর্ত্তি পায়—বিলাতী উপন্যাসে তাহা লোপ পায়। দেশী উপন্যাসে অদৃষ্ট ও দেবের কথা মৌখিক, আত্ম নির্ভরতার কথা মনুষ্যত্বের কথা আন্তরিক, বিলাতী উপন্যাসে আত্মনির্ভরতা মৌখিক, অবস্থার অধীনতা আন্তরিক। বিলাতী নভেলে বর্ণনায় বাহুল্য, দেশী উপন্যাসে বর্ণনা নিয়মিত। বিলাতী উপন্যাস, পণ্ডিতবর রাস্কিনের কথিত "Books of the hour," দেশী উপন্যাস—"Books for all times."। বিলাতী উপন্যাস নভেল, দেশী উপন্যাস নাটক। বিলাতী উপন্যাস ইতিহাস বা জীবন চরিত, দেশী উপন্যাস কাব্য। বিলাতী উপন্যাসের কবি দ্রষ্টা (Seer), তিনি মানবচরিত্র তত্ত্ব ও জগৎতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করেন, দেশী উপন্যাসের কবি স্রষ্টা (Creator) তিনি কাল্পনিক প্রকর্ষ চরিত্র (ideal) সৃষ্টি করেন, অথবা নূতন ও কাল্পনিক সৌন্দর্য্যময় জগৎ সৃষ্টি করেন। বিলাতী উপন্যাস Theorem বা উপপাদ্য, নির্দ্দিষ্ট ঘটনার দ্বারা চরিত্র বিশেষের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য প্রণালী দেখান হয়, দেশী উপন্যাস Problem বা সম্পাদ্য, নির্দ্দিষ্ট ঘটনায় চরিত্র বিশেষের অনির্দ্দিষ্ট কার্য্য প্রণালী স্থির করা হয়। বিলাতী নভেলের চরিত্র প্রবৃত্তি বশে, অবস্থার বশে, necessityর বশে, ঘটনা বিশেষে অভিভূত হইয়া কার্য্য করে; দেশী উপন্যাসের চরিত্র নিবৃত্তির বলে, Free will এর বলে, পুরুষকারের জোরে, সংস্কারের বলে অবস্থাকে বশীভূত করিয়া, ঘটনাকে আয়ত্ত করিয়া কার্য্য করিতে পারে, তাহাই প্রধানতঃ দেখাইতে চেষ্টা করা হয়। বিলাতী নভেলে নায়ক নায়িকার (বা গল্পের প্রধান চরিত্রের) কথা থাকে, hero, heroine এর সৃষ্টি থাকে না, দেশী উপন্যাসে নায়ক নায়িকার স্থলে প্রধানতঃ hero,heroineএর সৃষ্টি করা হয়। বিলাতী উপন্যাসে পাপকে ও পাপীকে এত মোহকর করিয়া চিত্রিত করা হয়—পাপীকে অবস্থার দাস বলিয়া তাহার পক্ষে এত ওকালতি করা হয় যে, তাহাতে আমাদের আকৃষ্ট করে। দেশী উপন্যাসে পাপকে ও পাপীকে তাহাদের স্বরূপ অবস্থায় দেখান হয়, তাহাতে পাপের প্রতি আমাদের ঘৃণা ও পাপীর প্রতি দয়া জন্মাইয়া দেয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, নভেল বা উপন্যাস সাধারণ পাঠককে বড় আকৃষ্ট

করে। চুম্বকও লৌহকে আকৃষ্ট করে। চুম্বকের উত্তরমুখী শক্তি, লৌহের দক্ষিণমুখী শক্তিকে সংযত করিয়া, তাহার উত্তরমুখী শক্তির স্ফূরণ করে। উপন্যাসেও সেইরূপ আদর্শচিত্র থাকিলে তাহা পাঠকের অধর্ম্ম বৃত্তি সংযত করিয়া ধর্ম্মবৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও উন্নতি করিতে পারে। দেশী উপন্যাস এই ধর্ম্মবৃত্তি যত স্ফূর্ত্তি করে, বিদেশী নভেল তত পারে না।

এ স্থলে আর একটী কথার অবতারণা করা আবশ্যক হইতেছে। অনেকে উৎকৃষ্ট বিদেশী নভেলে শিল্প-চাতুর্য্য বা art দেখিয়া মোহিত হন। তাঁহারা হয়তঃ মনে করেন যে অগ্নি, যেমন লৌহকেও দীপ্তিমান করে, artও তেমনি কাব্য ও উপন্যাসের অনেক দোষ ঢাকিয়া দেয়। স্ত্রীলোকের যেমন রূপ, কাব্যের তেমনি আর্ট বা শিল্প-চাতুর্য্য। অনেকের কাছে রূপ অনেক দোষ ঢাকিয়া রাখে। কথায় বলে গোরা সর্ব্ব দোষহরা, কিন্তু যিনি আপনার সৌন্দর্য্য-জাল পাতিয়া অন্যকে কুপথে লইয়া যান, তাহার রূপ যেমন নিন্দনীয় ও সর্ব্বথা পরিহার যোগ্য, আর যিনি সেই সৌন্দর্য্য বলে spiritual beauty'র আকর্ষণে অন্যের মনে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চার করিয়া দিয়া তাহাকে উন্নত করেন—পবিত্র করেন, তাহার মনে প্রেম ও আনন্দ উৎপাদন করেন, তাঁহার সৌন্দর্য্য যেরূপ প্রশংসার বা আরাধনার উপযুক্ত-সেইরূপ, যে শিল্পী আশ্চর্য্য কৌশলে আদর্শ সৃষ্টি করিয়া, তাহার দ্বারা আমাদের উন্নত করেন, তিনিই কেবল প্রশংসনীয়; কিন্তু যিনি সেই artএর অপব্যবহার করেন, তাহার মোহিনীজাল বিস্তার করিয়া আমাদের বৃথা আমোদ জন্মাইয়া অপথে লইয়া যান—তিনি নিন্দার পাত্র। গত মে মাসের Nineteenth Centuryতে কোন লেখক লিখিয়াছেন,—

"My faith is small in leaders or prophets, who varnish over with a little enthusiasm the ugliness of brute appetite."

একটা চলিত শ্লোক আছে,—

"বিদ্যা বিবাদায়, ধনংমদায়,
শক্তিঃ পরেষাং পরিপীড়নায়
খলস্য; সাধোর্বিপরীতমেতৎ—
জ্ঞানায়, দানায় চরক্ষণায়।"

যিনি সাধু, তিনি বিদ্যা ধন বা শক্তির সদ্ব্যবহার করেন, কেবল খলেই তাহাদের অসদ্ব্যবহার করে; আর যে কবি-শিল্পী সাধু ও পূজনীয়, তিনি তাঁহার কবিত্ব শক্তির সদ্ব্যবহার করেন—তাহার দ্বারা উচ্চ ideal বা আদর্শ সৃষ্টি করিয়া আমাদের নানারূপ বৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও উন্নতির চেষ্টা করেন। কিন্তু যে কবিশিল্পী অসাধু, তিনি তাঁহার শক্তির অপব্যবহার করেন—তাহার দ্বারা আমাদের মোহিত করিয়া পদস্খলিত করাইতে চেষ্টা করেন। বাইরণ এত বড় কবিশিল্পী হইলেও, ধার্ম্মিক লোকে তাহার মোহিনী শক্তির আকর্ষণের বাহিরে থাকিতে চাহেন। আমাদের মাইকেল এত বড় কবি হইলেও, কালে,এই কারণেই,তাঁহার সিংহাসন অনেক নিম্নে স্থাপিত হইবে। সে যাহা হউক, এ বিষয়ে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। সুধু art দেখিয়াই বিলাতী উপন্যাসের উৎকর্ষ সিদ্ধান্ত করা কর্ত্তব্য নহে—ইহাই আমাদের বুঝিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

দেশী ও বিলাতী উপন্যাসের মধ্যে আরও এক পার্থক্য আছে। সে পার্থক্য বাহ্য জগতের সহিত মানুষের সম্বন্ধ চিত্র লইয়া। হিন্দু—জগৎকে ব্রহ্মময় দেখেন, জীবে আত্মদর্শন করেন, জড়ে প্রাণ উপলব্ধি করেন,

কাজেই বাহ্য জগতের সহিত হিন্দুর বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বাহ্য প্রকৃতি, হিন্দুর জননী স্বরূপা। জীবের সহিত হিন্দুর ভাই ভাই সম্বন্ধ—জড়ে তাহার প্রীতি। হিন্দু সূর্য্য চন্দ্রের সহিত কমল নলিনের দাম্পত্য সম্বন্ধ পাতায়, বায়ুর সহিত ফুলের বিবাহ দেয়, ভ্রমরকে ফুলের প্রেমে মাতায়, প্রকৃতিকে লইয়া বালকের মত খেলা করে। সমুদ্র বা পর্ব্বত দেখিয়াও তাহার এ ক্রীড়া, এ রঙ্গ ঘুচে না। প্রকৃতি যখন তাহাকে বড় ভীষণ মূর্ত্তি দেখায়, তখনও তাহার মধ্যে শক্তির কালারূপে বিকাশ দেখিয়া তাহার ক্রোড়ে হাসিয়া লুকাইতে যায়। তাই বাহ্য জগত তাহাকে বড় অভিভূত করিতে পারে না। কিন্তু ইউরোপীয় কবি প্রকৃতিকে—বাহ্য জগৎকে এ ভাবে দেখিতে পারে না। তাহাদের কাছে প্রকৃতি জড় রূপা সৌন্দর্য্যময়ী, মাহিমাময়ী বিশাল - sublime grand beautiful। ইউরোপীয় কবি প্রকৃতিতে এই সৌন্দর্য্য উপভোগ করেন, আর যখন প্রকৃতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে তাহার নিকট আসে—তখন সে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ে। এই কারণে হিন্দু কবির প্রকৃতি চিত্র ও বিলাতী কবির প্রকৃতি চিত্র মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। যে প্রকৃতিতে কেবল সৌন্দর্য্য দেখিতে যায়, সে তাহাকে বিশ্লেষণ করে, উলঙ্গ করে, তন্ন তন্ন করিয়া দেখে, তাহাকে প্রণয়িনী সাজাইতে চাহে। আর যে প্রকৃতি মধ্যে ঐশি শক্তি দেখিয়া মাতৃভাবে তাহার নিকট অগ্রসর হয়, সে কখনও প্রকৃতিকে এত বিশ্লেষণ করিয়া, এত তন্ন তন্ন করিয়া তাহাকে দেখিতে পারে না, সে তাহার কেবল সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারে না—সে তাহার কোলে বালকের মত মুখ লুকাইয়া জুড়াইতে যায়। তাহাকে Fetish বলিতে হয় বল, বালক বলিতে হয় বল, অশিক্ষিত বলিতে হয় বল, তথাপি সে তোমার কথা শুনিবে না। আশ্চর্য্য যে, যে পাশ্চাত্য পণ্ডিত প্রকৃতির দ্বারা, বাহ্য অবস্থার দ্বারা অভিভূত, প্রকৃতি যাহাকে ক্রীড়ার পুত্তলি করিয়াছে, সেই প্রকৃতিকে লইয়া খেলা করে, তাহাকে মানে না। আর যে প্রকৃতির আকর্ষণ হইতে দূরে থাকিতে পারে, দূরে থাকিতে চায়, প্রকৃতিকে যে মায়া বলিয়া, স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারে, এই হিন্দুই প্রকৃতির শক্তি দর্শনে মোহিত হইয়া, চক্ষু অৰ্দ্ধ নিমীলিত করিয়া, বালকের মত তাহার কাছে অগ্রসর হয়—বালকের মত তাহার সহিত ক্রীড়া করে। বোধ হয়, বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত রেলওয়ে টেলিগ্রাফ্ হওয়ায়, ইউরোপীয় পণ্ডিতের বিশ্বাস হইয়াছে যে, সে প্রকৃতির রাজা, প্রকৃতির উপর একাধিপত্য করিতে পারে। আর বোধ হয়, এই ভাবই ইউরোপীয় কাব্যে প্রবেশ করিয়াছে।

যে কারণেই হউক, দেশী ও বিদেশী কবি প্রকৃতিকে ভিন্ন রূপে দেখিয়া থাকেন ও বুঝাইয়া থাকেন ও সেই জন্যই দেশী ও বিদেশী উপন্যাসে এই স্বভাব বর্ণনায় ও প্রকৃতি চিত্রনে কিছু পার্থক্য প্রবেশ করিয়াছে।

ইহা ব্যতীত হিন্দু সমাজের বিশেষত্ব আছে, হিন্দুর চরিত্রের বিশেষত্ব আছে, রাজনৈতিক প্রভৃতি অন্যান্য অবস্থা সম্বন্ধেও তাহার বিশেষত্ব আছে। এই সমস্ত বিশেষত্ব জন্য পূর্ব্বকার দেশী ও ইউরোপীয় কাব্যে অনেক পার্থক্য হইয়াছিল। ইউরোপের উপন্যাসেও, ইউরোপীয় কবি, এই

বিশেষত্ব রক্ষা করিয়াছেন। আর যদি তোমাদের শ্রেষ্ঠ কবি বাঙ্গালার উপন্যাস রচনা প্রবর্ত্তিত না করিতেন, তাহা হইলে হয়তঃ হিন্দু কবির যে বিশেষত্ব, তাহা বাঙ্গালা উপন্যাসে দেখা যাইত না। তাহা হইলে, হয়ত বাঙ্গালা উপন্যাস বাঙ্গালা ভাষায় লেখা বিলাতী উপন্যাসের সমান হইত। বাঙ্গালার প্রধান কবি, তাঁহার অতুল্য প্রতিভা বলে, তাঁহার উপন্যাসে এই বিশেষত্ব রক্ষা করিয়াছেন। সেই জন্য, বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস গুলি বাঙ্গালায় এক নূতন জিনিষ হইয়াছে। সুধু বাঙ্গালায় কেন, যখন জগতের সাহিত্য মধ্যে এই উপন্যাস গুলি প্রচার হইবে (আশা করা যায়, সে দিন আসিতে বড় অধিক বিলম্ব নাই) তখন উল্লিখিত বিশেষত্ব জন্যই এই সকল উপন্যাস সমস্ত জগত মধ্যে বিশেষ আদৃত হইবে এবং সেগুলি জগতের উপন্যাস মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে। বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসে এই সকল বিশেষত্ব অধিক রক্ষিত বলিয়া আমরা এস্থলে তাহারই উল্লেখ করিলাম; অনাবশ্যক বলিয়া বাঙ্গালার অন্য উপন্যাসের কোন উল্লেখ করিলাম না।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

গরিব সেবা। (২)

ভিক্ষাদান।

ভূদেব, তাঁহার আত্মীয় স্বজনকে উপদেশ দিতেন,—

"প্রত্যহ কিছু না কিছু দান করিও। তাদৃশ অর্থ না থাকিলে, অন্ততঃ প্রত্যহ এক পয়সাও দান করিও। দানের অভ্যাস না থাকিলে, শুভ সময়ে, সম্পদকালে, সে দাতা হইতে পারেনা। অভ্যাস না থাকিলে, দান শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া, মানুষকে পাষণ্ড করিয়া ফেলে।" (ভূদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী।)

"I am certain that there is a party in this country, unnamed as yet, that is disconnected with any existing organisation —a party that is inclined to say, "A plague on both your houses, a plague on all your parties, a plague on all your polities, a plague on your unending discussions, which yield so little fruit. Have done with the unending talk and come down and do something for the people."—*Lord Rosebery.*

যেখানে যে গরিব সেবক আছেন, তাঁহাদিগকে আমরা জানি আর না জানি, তাঁহারা আমাদিগের এক সভার সভ্য, তাঁহারা এক প্রভুর দাস, আমাদিগের সহিত এক প্রাণে গাঁথা। তাঁহাদিগের প্রত্যেকের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, হে শ্রদ্ধেয় বন্ধু, আসুন, একযোগে কাজ করিতে আরম্ভ করি। গরিবদিগের দুঃখ যাহাতে অন্ততঃ কতকটা দূর হয়, এমন একটা উপায় স্থির করি। গরিবসেবকগণ মিলিত হইয়া, পরস্পর পরামর্শ করিয়া, দীন দুঃখী কাঙ্গাল যাহাতে এক মুটা করিয়া খাইতে পায়, আসুন, তাহার একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার চেষ্টা করি। দেখুন, গরিবের চোখের জলে দেশ ভাসিয়া যাইতেছে, অসংখ্য গরিবের হাহাকারে সংসার পুড়িয়া গেল। তুমি আমি দুই বেলা ভাত খাইতেছি, কতজন এক বেলাও খাইতে পাইতেছে না। তুমি আমি নানা ব্যঞ্জন, মৎস্য, সূপ ও দুগ্ধ দিয়া বেশ করিয়া অন্ন ভোজন করিতেছি, কতজন দিনান্তে একমুটা ভাতও পাইতেছে না। না খাইতে পাইয়া ধুঁকিতেছে।

আমাদিগের দেশে নারীগণ বলিতেন যে, খাইবার সময় কেহ দৃষ্টি দিলে পরিপাক হয় না। অর্থাৎ তুমি যখন খাইতেছ, তখন আর একজন খাইতে না পাইয়া, লালায়িত হইয়া যদি তোমার খাদ্য দ্রব্যের প্রতি দৃষ্টি দেয়, তাহা হইলে তাহাতে তোমার মঙ্গল নাই। এ কথা মিথ্যা নহে, কুসংস্কার নহে। ক্ষুধার্ত্ত কাঙ্গালাকে বঞ্চিত করিয়া, তাহার লালায়িত দৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া, তুমি যে গ্রাস মুখে তুলিতেছ, তাহা কখনই হজম হইবে না, তাহা পীড়াজনক। তুমি ধনী ও সমর্থ—শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, কাঙ্গালা ও অসমর্থকে না দিয়া, তুমি যাহা খাইবে, তাহা বিষ্ঠা। এই পুরীষ মহাবিষ, ইহা যে কেবল নশ্বরদেহকে নষ্ট করে, তাহা নহে, ইহা অমরাত্মাকে জর্জ্জরিত করিতে থাকে, মহাপাতকস্বরূপ যে মহাব্যাধি আত্মাতে তাহাই জন্মাইয়া দেয়, এবং রৌরব নরকের পথ প্রশস্ত করে। এই নিদ্দয়তা স্বরূপ মহাব্যাধির বীজ যেন হৃদয়ে প্রবেশ না করে।

এস গরিব সেবক ভাই, আমরা নিজে যাহাতে ব্যাধিগ্রস্ত না হই, সমাজ যাহাতে ব্যাধিগ্রস্ত না হয়, দীন দুঃখী কাঙ্গালীরা যাহাতে এক মুঠা করিয়া ভাত পায়, তাহার চেষ্টা করি। ঘরে ঘরে মুষ্টিভিক্ষা যাহাতে না উঠিয়া যায়, তাহার জন্য যত্ন করি। মুষ্টিভিক্ষাতে যে যে অসুবিধা বা অকুলান আছে, তাহার প্রতিকার করি।

কাণা, কালা, নুলো, খোঁড়া ইত্যাদি যে দয়ার পাত্র, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। তাহাদিগের এক মুঠা করিয়া চাউল দেওয়া যে ধর্ম্মের কাজ, তাহাদিগকে যাহা দেওয়া যায়, তাহা যে ভগবানকে নিবেদন করা যায়, এ অতিশয় সোজা কথা। কিন্তু যাহারা এত অক্ষম যে নড়িতে পারে না, তাহাদিগের উপায় কি হইবে? আর ভদ্রপরিবারের অনাথিনী বিধবা, তাহাদিগের উপায় কি হইবে? যাহারা না খাইতে পাইয়া বরঞ্চ ঘরে শুকাইয়া মরিয়া যাইবেন সেও স্বীকার, তথাপি লোকলজ্জা পরিত্যাগ করিয়া, ঘরের বাহির হইয়া, দ্বারে দ্বারে কখন ভিক্ষা করিতে পারেন না, সেই অনাথিনী বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যাদিগের উপায় কি হইবে? আবার মাতৃপিতৃহীন শিশু, যাহারা ভিক্ষা করিতেও জানে না, তাহাদিগের উপায় কি হইবে? এই সকল অনাথ অনাথিনীদিগের জন্য গ্রামে গ্রামে, সহরে সহরে, একটা একটা সভা করা বা দল বাঁধা আবশ্যক।

এই সকল গরিবসেবা সভা স্থাপন করিবার জন্য নিম্নলিখিত বা তদনুরূপ নিয়ম সকল করা যাইতে পারে।

শুক্লপক্ষে পূর্ণিমা তিথিতে গরিবসেবকগণ, একত্র হইয়া, হরি সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে, সমুদয় সহর পদক্ষিণ করিয়া, সভাগৃহে প্রবেশ করিবেন এবং সেখানে গিয়া সভা প্রতিষ্ঠা করিবেন। সভা প্রতিষ্ঠার সময় নিম্নলিখিত বা তদনুরূপ মন্তব্য প্রস্তাবিত ও গৃহীত হইতে পারে।

(১) এই স্থানের গরিবদিগের দুঃখমোচনের জন্য একটা গরিবসেবা-সভা প্রয়োজন।

(২) অদ্য-- মাসে তারিখে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হইল এবং অমুক অমুক "গরিব সেবক," অর্থাৎ এই সভার সভ্য হইলেন। অমুক সম্পাদক, ও অমুক কোষাধ্যক্ষ, অমুক সভাপতি, এবং অমুক সহকারী সভাপতি হইলেন।

(৩) প্রত্যেক গরিব সেবক প্রতি রবিবারে গরিব-সেবার জন্য চাঁদা তুলিবেন। গরিবদিগের অবস্থা অনুসন্ধান করিবেন। দাতব্য বিতরণ করিবেন। এবং অন্য যে কোন উপায়ে পারেন, গরিবদিগকে সাহায্য করিবেন।

(৪) চাঁদা তুলিবার জন্য ও গরিবসেবার সব কাজ ভাল করিয়া চালাইবার জন্য, মিউনিসিপালিটির মত, সহর ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ভাগ করা হইবে। প্রত্যেক গরিবসেবক বিশেষতঃ নিজের ওয়ার্ড বা পাড়াতে কাজ করিবেন; সাধারণত সমুদয় গ্রামে বা সহরে কাজ করিবেন। অমুক অমুক এই এই "ওয়ার্ডে" বা পাড়ায় কাজ করিবেন স্থির হইল। যখন কোন গরিব সেবক তাঁহার পাড়ার গরিবসেবার কাজে ঘুরিবেন, তখন সেই পাড়ার মিউনিসিপাল কমিশনর অথবা একজন অন্য ভদ্রলোক যদি পান, তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া গরিবদিগের অবস্থা অনুসন্ধান করিবেন। এবং গরিবসেবা সভার সম্পাদক, সম্ভবমত মিউনিসিপাল সভার সভাপতি বা সহকারী সভাপতি এবং মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি স্থানীয় প্রধান গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর সহিত সদ্ভাব রাখিয়া কার্য্য করিবেন।

(৫) যে সকল "গরিবসেবকদিগের" আয় পঞ্চাশ টাকার অধিক, তাঁহারা তাঁহাদিগের আয়ের উপর প্রতি টাকায় আধ পয়সা করিয়া চাঁদা দিবেন। যাঁহাদিগের আয় ১০০৲ এক শত টাকার অধিক, তাঁহারা টাকায় এক পয়সা করিয়া চাঁদা দিবেন।

(৬) গরিবসেবকগণ প্রত্যেক সঙ্গতি সম্পন্ন গ্রাম বা নগরবাসীর নিকট মাসিক এক আনা চাঁদা ভিক্ষা চাহিবেন। এবং বিবাহাদি উৎসবকার্য্যে এবং শ্রাদ্ধাদি ধর্ম্ম কার্য্যে কিছু ভিক্ষা যাচ্ঞা করিবেন। যে কোনও চাঁদা আদায় হইবে, তাহা কোষাধ্যক্ষের নিকট প্রেরিত হইবে। হিসাব রাখিবার জন্য তাহার সংবাদ সম্পাদককে দেওয়া হইবে। কোষাধ্যক্ষ সেভিংসব্যাঙ্কে টাকা রাখিবেন। সেভিংসব্যাঙ্কের পাশবুক সম্পাদকের নিকট রাখিবেন। গরিবসেবক তাহার পাড়াতে কাহাকে এককালীন দান বা মাসিক দান করা উচিত, তাহা সম্পাদককে লিখিবেন ও সম্পাদক আয়ের অবস্থা এবং অন্যান্য পাড়ার অভাব ইত্যাদি সমুদয় সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষের নিকট নিবেদন করিবেন। তাঁহারা তিনজন একমত হইয়া যে টাকা দিবার আদেশ করিবেন, সেই টাকা আনাইবার জন্য সম্পাদক কোষাধ্যক্ষের নিকট পাশবুক পাঠাইবেন এবং সেই টাকা আসিলে যে গরিবকে টাকা দিতে হইবে, তাহার পাড়ার গরিবসেবকের নিকট সেই টাকা পাঠাইয়া দিবেন।

(৭) যে সকল গরিব সেবক প্রকাশ্যভাবে গরিব সেবকের কাজ করিবেন, তাঁহারা বাহিরে কাজ করিবার সময় গরিবসেবক সূচক চিহ্ন ধারণ করিতে পারেন। যখন চাঁদা আদায় করিতে যাইবেন, তখন গেরুয়া রঙ্গের একটী ভিক্ষার ঝুলি লইলেই বোধ হয় আড়ম্বর-শূন্য চিহ্ন হইতে পারে।

গরিব সেবকগণ প্রতিমাসে শুক্লপক্ষে একাদশীতিথিতে নগর সঙ্কীর্ত্তন করিবেন। নগর সঙ্কীর্ত্তন করিবার সময় প্রত্যেক গরিব সেবকের হাতে ভিক্ষার ঝুলি বাঁধা কাটী থাকিবে। রাস্তায় যদি ভিক্ষা পাওয়া যায়, সেই ঝুলিতে সংগৃহীত হইবে।

গরিবসেবার অনেকগুলি বিভাগ হইতে

পারে। অন্নদান বিভাগ, ঔষধদান বিভাগ, দাতব্যশিক্ষা দান বিভাগ, প্রচার বিভাগ, অল্প সুদে ঋণদান বিভাগ ইত্যাদি। প্রথমে অন্নদান বিভাগ ও দাতব্য শিক্ষাবিভাগের কার্য্য চলিতে পারে। প্রতি রবিবারে গরিবসেবক একটী পাঠশালায়, পুস্তক পড়াইয়া বা কথাবার্ত্তায়, বা বক্তৃতা দ্বারা শিক্ষা দিবেন। ইহার নাম "রবিবার পাঠ-শালা" হইবে। প্রচার বিভাগে যাহাতে গরিবসেবকের সংখ্যা এবং সভার সংখ্যা বৃদ্ধি হয় ইত্যাদি বিষয় বক্তৃতা করা হইবে।

তাহার পর, ভগবানের কৃপায়, গরিব-সেবকগণের শ্রমে, দাতাদিগের দয়ায়, যদি প্রচুর অর্থ-সংগ্রহ হয়, তাহা হইলে অনাথা-শ্রম স্থাপন করা যাইতে পারে এবং যাহাতে অনাথ ও অনাথিনীগণ নিজের নিজের ক্ষমতানুসারে উপযুক্ত কাজ করিয়া কতক পরিমাণে স্বাবলম্বন শিক্ষা করিতে পারে, তাহারও উপায় হইতে পারে। কিন্তু সে সব পরের কথা।

আমি গত দুই বৎসরকাল গরিবসেবার কার্য্যে পাঠকদিগের হৃদয় আকর্ষণ করিবার জন্য কেবল প্রবন্ধ লিখিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু উপরি উক্তভাবে সভাগঠন নির্দ্দেশ করিতে সাহসী হই নাই। কিন্তু এইরূপ গরিবসেবার জন্য সভা স্থাপন ও অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিবার জন্য নানাদিক হইতে অনুরোধ করা হইতেছে। আমি দুই বৎসর কাল এ বিষয় আলোচনা করিয়া সভা স্থাপন ও চাঁদা সংগ্রহ আবশ্যক বুঝিতেছি। যেখানে যেখানে চাঁদা সংগ্রহ করা হইবে, সেই সেই স্থানের সভার হস্তে চাঁদা সংগ্রহ ও ব্যয়ের ভার থাকিলেই চলিতে পারে। এই সকল সভা সমন্বয় করিবার জন্য একটী মূল বা কেন্দ্র সভার প্রয়োজন হইবে। সেই সভার বিষয় যথা সময় বিস্তৃতভাবে লেখা হইবে।

আপাততঃ আমার প্রার্থনা, যিনি যেখানে পারেন, গরিবসভা উপরি উক্তভাবে বা তৎ তৎ স্থানের উপযোগী কথঞ্চিৎ ভিন্ন ভিন্নভাবে সংস্থাপন করুন। গরিবসেবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন। আমাদিগের দেশে গরিবসেবকগণ একটী নূতন সমাজ স্থাপন করিবেন, গরিবদিগকে আশ্রয় দিবার জন্য নূতন ধর্ম্মমন্দির প্রস্তুত করিবেন। মনুষ্য প্রীতি দ্বারা চালিত হইয়া,গরিবদিগের দুঃখে গলিয়া গিয়া, তাহাদিগের প্রাণে প্রাণে মিশাইয়া দিয়া, যাঁহারা গরিবদিগের সেবা করিবার জন্য, দুঃখ মোচন করিবার জন্য সম্মিলিত, তাঁহাদিগকে লইয়া এই সার্ব্ব-কালিক সমাজ, এই সর্ব্বগ্রাহী ধর্ম্মতন্ত্র।

"What is the Church? It is the Union of all who love in the service of all who suffer."

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

মৃত্যু।

নদীর কূলে আমার শয়ন গৃহ। এক সময়ে বৈশাখ মাসে গৃহের জানালা সকল উদ্ঘাটিত ছিল, আমি নিদাঘ সন্তপ্তদেহে সলিল-স্নাত মৃদু সমীরণের ব্যজন উপভোগ করিতে করিতে গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। সহসা "হরিবোল হরিবোল" এই গভীর ধ্বনি তীক্ষ্ণ সূচিকাবৎ কর্ণ-কুহরে বিদ্ধ হইল—অমনি আমার নিদ্রাভঙ্গ

হইয়া গেল। সত্রাস্ নয়নে চাহিয়া দেখিলাম, গৃহ অন্ধকারাচ্ছন্ন, বাহিরেও অন্ধকার। গৃহের পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র উদ্যান, তত্তল দেশ দিয়া নদী প্রবাহিতা হইতেছিল, সেই নদীর উপকূল হইতে আবার ঐ গভীর ধ্বনি নৈশনিস্তব্ধতা ছিন্ন করিয়া, পত্র রাজির মধ্য দিয়া বহিয়া আমার আতঙ্কিত হৃদয়ে প্রতিঘাত করিল। অমনি হৃদয় অজ্ঞাতত্রাসে কম্পিত হইল। সেই সুষুপ্ত নৈশ আঁধারে, আর সেই মর্ম্মভেদী গভীর রোলে কি যেন এক অচ্ছেদ্য বন্ধন আছে! তাই সেই বিষাদময় শব্দের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের মধ্যে একটি বিষণ্ণতা, আঁধারের ছায়া আসিয়া পতিত হইল—আবার সেই আতঙ্কময় ধ্বনি! আমি নীরব আতঙ্কে জড়ীভূত, উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলাম—যেমন দীপরশ্মি-প্রলুব্ধ পতঙ্গ তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়, তদ্রূপ আকৃষ্ট হইয়া শুনিতে লাগিলাম—নিকটে, দূরে, দূরে দূরে, সেই বিষাদের পুণ্যগীতি নৈশ গভীরতায় ক্রমে ক্রমে মিশাইয়া যাইতেছে। একাগ্র চিত্ততায় হৃদয় অবশ হইয়া আসিল। চিন্তার প্রবল স্রোত উদ্ঘাটিত হইল। স্বতঃই মনে আসিল—হায়! কাহার অদ্য জীবন-মেলা ফুরাইল, কাহার এত সুখ, এত প্রেম, এত আশা সকলই ভাঙ্গিয়া গেল! কাহার আজ সকলই ফুরাইল, পশ্চাতে কেবল স্মৃতির সম্বন্ধ পড়িয়া রহিল! স্মৃতির সম্বন্ধ! এই স্মৃতিই অনন্ত অতীতের ও সান্ত বর্ত্তমানের সংযোজক বন্ধন, এই স্মৃতির বিচ্ছেদ, প্রকৃত বিচ্ছেদ। যে গিয়াছে, তার কি স্মৃতি আছে? সে কি ইহলোকের সকল সূত্রই ছিন্ন করিয়া গেল, তাহাতে আমাতে কি কোনই অদৃশ্য সূত্রে একত্র আবদ্ধ নই! বিজ্ঞানবিদ্, হাসিও না, তোমারই বিজ্ঞানকে আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, বিজ্ঞান পরমাণুর অবিনশ্বরতা প্রমাণ করিয়াছে, বিজ্ঞানই আমার জিজ্ঞাস্য মীমাংসা করিতে পারে!

হিন্দুর মতে পঞ্চভূতই (ক্ষিত্যপতেজঃ মরুৎ ব্যোম) মৌলিক পদার্থ, কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এই মত ভ্রম পূর্ণ প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে অনেকগুলি পরমাণু অর্থাৎ মৌলিক পদার্থ আছে, এই সকল পরমাণুর সংযোগ, বিয়োগরূপ বিবর্ত্তনে, এই অপূর্ব্ব শোভাশালী সৌর জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। বিজ্ঞানবিদ্ আরও বলেন যে, ঐ সকল পরমাণু কোন এক আদি পরমাণুর আকর্ষণ বিকর্ষণ সম্ভূত ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ মাত্র। হিন্দু শাস্ত্রেও ঐরকম একটা কথা আছে। শতপথব্রাহ্মণে আছে ঃ—

"সোঽকাময়ত। বহুঃস্যাং প্রজায়েয়েতি।
সংতপোঽ তপ্যত।
সঃ তপ স্তপ্ত্বাং ইদং সর্ব্বম সৃজত।

অর্থাৎ—তিনি ইচ্ছা করিলেন, আমি প্রজা সৃষ্টির জন্য বহু হইব। তিনি তপস্যা করিলেন। তপস্যা করিয়া এই সকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রে ও আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মধ্যে জগতের আদি সম্বন্ধে প্রভেদ বড়ই কম। এখন আমরা বলিতে পারি যে, পরমাণুর সংযোজন হইতেই পদার্থের উৎপত্তি, এবং উহাদের বিচ্ছেদ হইতেই পদার্থের লোপ। সুতরাং মৃত্যু ইহা ব্যতীত আর কি! দেহানুরূপ পরমাণুসমষ্টির স্বতন্ত্রতা মাত্র। ঐ যে দেহ এত দিন কত যত্নের, কত 'পুতুপুতুর' সামগ্রী ছিল, আজ তাহা গভীর নিশাতে দারুণ জ্বালা-বিশিষ্ট

অগ্নিতে ভস্মীভূত হইতেছে। উত্তাপের সাহায্যে দেহ পরমাণু সকলের কত প্রকার রাসায়ণিক প্রক্রিয়া হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? কিন্তু মোট কথা ইহাতে কেবলমাত্র আশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ, কেহই ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে না, কাহারও ধ্বংস নাই। যাহারা এতাবৎকাল একত্রে এক-রূপে অবস্থিতি করিতেছিল, আজ তাহারা নূতন রূপে পৃথকভাবে অবস্থিতি করিতেছে মাত্র। তাহা এখন—

"——neither hear nor sees;
Rolled round in earth's diurnal course
With rocks and stones & trees."

এই ত গেল স্থূল দেহের কথা, কিন্তু এই অপার্থিব দেহের যে একটী অপার্থিব চেতনা আছে, তাহার সম্বন্ধ কি? অনেকে আত্মার কথা বিশ্বাস করে না। তাহাদের মতে, শোণিত অস্থি মেদ ইহাদের কোন এক অনৈসর্গিক সংযোগে জীবনীশক্তির সঞ্চার হয়। এবং যতদিন ঐ শক্তি শোণিত অস্থি মেদে অবস্থিতি করে, ততদিন প্রাণী সজীব থাকে। কথাগুলি ভাবিয়া দেখা যাক্। পরমাণু সকল মধ্যে যে শক্তি নিহিত আছে, রাসায়নিক ক্রিয়ায় সেই শক্তির আবির্ভাব হয়, ইহা বিজ্ঞানবিদ্ মাত্রেই জানেন। ঐ পদার্থ নিচয়ের অন্তর্নিহিত শক্তি কোথা হইতে আসিল? বিজ্ঞানের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষক যন্ত্র তাহা প্রমাণ করিতে পারে না। যে শক্তি অজ্ঞেয়, তাহাই জগতের আদি কারণ। শক্তির বিনাশ নাই। আদি কারণেরও বিনাশ অসম্ভব। তবে দেহের বিনাশে জীবনী-শক্তির কেন বিনাশ হইবে? জীবনীশক্তিই ত আত্মা, তবে আত্মার বিনাশ নাই। বিনাশ নাই, কিন্তু পরমাণুতে কি পুনঃ বিলুপ্ত হইবে? না এই শক্তি অশরীরি জীবনী প্রতিরূপই থাকিবে?

আমি বিবর্ত্তনবাদ দিয়া এই কথাটী বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, প্রথমে জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে সর্ব্বব্যাপী শক্তি ছিল, সেই শক্তির বিবর্ত্তনে ক্রমে ক্রমে জগৎ, জীব প্রভৃতি সৃষ্টি হইয়াছে। বিবর্ত্তনবাদে সেই আদি শক্তি ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। উদ্ভিদজগতে শক্তির যে ভাব বিকাশ পাই-য়াছে, প্রাণী জগতে অবশ্য সেই ভাব বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই, নতুবা উভয়ের পার্থক্য হইত না। শক্তির ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ বহি-র্জগতে কেমন স্পষ্ট! যে শক্তির বিকাশে আমরা কেবল মাত্র অনুভব দ্বারা উত্তাপ উপলব্ধি করি, সেই শক্তি আর একটু পূর্ণতা বা প্রবলতা প্রাপ্ত হইলে জ্যোতিঃশালিনী আলোকে পরিণত হয়। এই আলোক মধ্যে আবার কত প্রকার স্ফূরণ আছে। প্রদী-পের শিখায় আর বৈদ্যুতিক জ্যোতিতে যে ব্যবধান, ইহা দেখিয়া কোন্ অশিক্ষিত ব্যক্তি বলিতে পারে যে, উভয়েই সেই এক শক্তির ভিন্ন ভিন্ন আবির্ভাব মাত্র। আবার উত্তাপ হইতেই শব্দরূপ শক্তি উৎপন্ন হইতে পারে। সংক্ষেপেত সর্ব্বত্রই সেই এক শক্তি, বাষ্পীয় মহাতেজই বল, চিন্তাদুরাতিক্রম্য বৈদ্যুতিক গতিই বল, আর বারুদের ভীষণ গর্জ্জনই বল, সকলই সেই এক শক্তি সম্ভূত।

এখন জিজ্ঞাস্য এই, প্রাণী জগত কি নৈসর্গিক নিয়ম দ্বারা শাসিত হয় না? উদ্ভিদ হইতে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ প্রাণী কি সেই আদি শক্তির ভিন্ন ২ বিকাশ মাত্র নয়? উদ্ভিদে যাহা গতিহীন, কেবল বর্দ্ধনশীল গুণবিশিষ্ট, পশুতে যাহা পূর্ণতা প্রাপ্তির প্রয়াস মাত্র, বর্ব্বরে যাহা পূর্ণতা প্রাপ্তির প্রথম বিকাশ, শ্রেষ্ঠ সভ্য - মানবে তাহাই পার্থিব পূর্ণতার

পরিসীমা। কথাটী কি অবৈজ্ঞানিক হইল? মানবের হৃদয়ে যাহা চৈতন্য, পশু হৃদয়ে তাহা instinct, উদ্ভিদ মধ্যে কি? হিন্দুর কাছে এ সকল এক। সর্ব্বভূতে অহং, হিন্দুর শাস্ত্রের কথা, বৈজ্ঞানিক কথাও ত বটে। তাই হিন্দু পশু পক্ষী উদ্ভিদে প্রণয়শালী, মমতাপূর্ণ। হায়, এমন উদার ধর্ম্মকে কে সঙ্কীর্ণ করিল? কিন্তু বিবর্ত্তনের কথা বলিতেছিলাম। পূর্ব্বেই বাহ্যজগতে বিবর্ত্তনের উদাহরণ দেখাইয়াছি, আরও বলিতেছি। পৃথিবী নিয়তই বিবর্ত্তন করিয়া দিবারজনী প্রকটিত করিতেছে, চন্দ্রের কলা আরও একটী স্পষ্ট দৃষ্টান্ত। অন্তর্জগতে দেখ, ঐতিহাসিক ঘটনার কেমন বিবর্ত্তন আছে। History repeats itself, ইতিহাস পাঠক মাত্রেই জানেন। জাতীয় জীবনে জাতীয় উন্নতি ও পতনে কেমন বিবর্ত্তনবাদ।

এখন কথা, বহির্জগতে এত আবর্ত্তন, প্রাণীর অন্তর্জগতে কি সেই আবর্ত্তন নাই? পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এই আবর্ত্তন স্বীকার করিতেছে। ডারবিন সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন যে, ক্রমোন্নতি দ্বারা উদ্ভিদ হইতে প্রাণী, পশু হইতে মনুষ্য উৎপন্ন হইয়াছে। হিন্দুর দশ অবতারবাদ, কথাটীর কি কোন গূঢ় অর্থ নাই? প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্তও পর্য্যবেক্ষণ করিলে কি মনে হয় না যে, হিন্দু ক্রমোন্নতির ও ক্রমবিকাশের কথাটা কিছু কিছু উপলব্ধি করিত। যিনি ত্রিদশ অবতার চিত্রখানি বিশেষ স্মরণ করিতে পারেন না, আমার অনুরোধ যেন তিনি একখানি চিত্র আনাইয়া ইহার আদ্যোপান্ত দেখেন। হিন্দুর কল্পনা বড়ই বিজ্ঞান-মূলক।

এক্ষণে কতদূর আসিয়াছি, দেখা যাক্। (১) শক্তি সর্ব্বত্রই এক, কেবল ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ মাত্র। (২) বিবর্ত্তনবাদ অনুসারে নীচ হইতে উচ্চ প্রাণীর উৎপত্তি। তবে এখন কি বলিতে পারি না যে, মৃত্যু এই ক্রমবিকাশের একটী ছেদ মাত্র। ক্রমোন্নতি এই খানেই কেন সমাপ্ত হইবে? মৃত্যুর উপর কি আর কোন উন্নতিরূপ বিকাশ নাই! কথাটা বিজ্ঞান-সম্মত বটে, কি নয়?

কিন্তু ঐ আবার "হরিবোল হরিবোল!" চিন্তার একাগ্রতা বজ্রতাড়িত বায়ুর স্তরের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। অনন্ত প্রবাহিনী কল্পনা মুহূর্ত্তে কোথায় লুকাইল। সংসারের কঠিন চিত্র সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। মমতার ছবিগুলি বড়ই প্রাণের ভিতর আসিয়া এক অনির্ব্বচনীয় শোকে ও সুখে জড়িত হইতে লাগিল। এই আমার প্রেমের, ঐ আমার স্নেহের, সে আমার বড় আদরের, সকলই আমার বড় যত্নের! সকলেরই শেষ কি ঐ শোক-ভরা হরি শব্দ! ঐ কি শেষ বিচ্ছেদ? বিজ্ঞান আমি মানি না, বিজ্ঞানের জটিল তর্ক মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার হৃদয়ের কোমলতা হারাইতে চাহি না। আমি মূর্খ অন্ধ, সেও ভাল। হৃদয়ের শান্তি যদি জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তবে যাহাতে সেই শান্তি পাই, সেই পথই অনুসরণ করিব। দূরে থাক তোমাদের বিজ্ঞান, জ্ঞানালোক, তোমাদের শান্তিশূন্য দর্প। আমার সরল বিশ্বাস আমাতেই থাক্, পরকালের আশা আমি ছাড়িতে পারিব না। পরকাল ছাড়িলে মানুষ মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়ে। বিবেক, বুদ্ধি, যুক্তি, এ জটিল সংসারে কয়জনকে সোজা পথে চালাইতে পারে? কয়জনকে সর্ব্ব মুহূর্ত্তেই সদাচারে আটক রাখিতে সক্ষম? আমার বিশ্বাস, যাঁহারা জ্ঞানের দ্বারা সমাজ পরিষ্কার করিতে চান,

তাঁহাদের যত্ন সফল হওয়া দুরূহ, কেন না, জ্ঞান সর্ব্বব্যাপী নহে, কখনও হইবে না। অন্য পক্ষে, উচ্চ সরল বিশ্বাস দ্বারা সমাজের বিস্তর উন্নতি সাধিত হইতে পারে। কেন না, বিশ্বাস হৃদয়কে কোমল করে, এবং যে হৃদয় কোমল, তদ্দ্বারা কখনই গুরুতর অনিষ্ট সম্পাদন সম্ভবে না। তাও বটে, আরও কথা, পরকাল ছাড়িলে আমার সকল প্রিয় পদার্থ ইত ছাড়িতে হয়। তাহাত পারিব না। বিশ্বাসের জোরে আমি ইহজীবনে ও পরজীবনে একটী মধুর সম্বন্ধ বাঁধিয়া রাখিয়াছি, তাহা ছিন্ন হইলে আমার মনুষ্যত্ব যাইবে। কিন্তু যেখানে বিশ্বাসে ও বিজ্ঞানে কোন মতানৈক্য পাইলাম না, সেখানে কেন কাল্পনিক বিরোধ বাধাইয়া হৃদয়ের শান্তি হারাই! সহসা পূর্ব্ব-কথিত ভাবুক মহোদয়ের কথা মনে আসিল, হৃদয় শান্ত হইল—

"The Soul that rises with us, our life's Star
Hath had elsewhere its setting,
And cometh from afar ;"

শ্রীদাশরথি ঘোষ।

অসমীয়া কি স্বতন্ত্র ভাষা ?

"যোজনান্তে পৃথক্ ভাষা" পূর্ব্বাপর প্রচলিত এ প্রবাদ বাক্যের সার্থকতা আমরা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি। রেলযোগে কলিকাতা হইতে দিল্লী যাত্রা কালে এই ভাষার ক্রমভেদ কেমন অলক্ষ্যে উদ্ঘাত হয়, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এক প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরের ভাষাগত পার্থক্য ত দূরের কথা, এক জেলার মধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন রূপ কথা শুনিতে পাওয়া যায়,—গঙ্গাতীরবর্ত্তী লোকদিগের সহিত কিঞ্চিদ্দূরবর্ত্তী লোকের কথার তুলনা করিলেই ইহার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইতে পারে। স্থানের দূরতা অনুসারে ভাষাগত বিভিন্নতা বাড়িতে থাকে ;—কলিকাতার কথার সহিত বাঁকুড়া-বীরভূম বা শ্রীহট্ট-চট্টগ্রামের গ্রাম্য কথা তুলনা করিলে পরস্পর এত পার্থক্য দেখা যায় যে, তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা বলিলেও অত্যুক্তি বোধ হয় না। বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মধ্যে মনুষ্যের এই ভাষা বৈচিত্র্যও অদ্ভুত রহস্যময় ; জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাষাতত্ত্ববিদ্‌ও এ রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ কি না, সন্দেহ। অসমর্থ হইলেও, মনুষ্যের চেষ্টা ও উদ্ভাবনী শক্তি সুদূর প্রসারিণী—এই ভাষাভেদের একটা হেতু নিরূপণেও মনুষ্য-চেষ্টা নিতান্ত ব্যর্থ হয় নাই। ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ নানারূপ গবেষণা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—দুরারোহ গিরিশ্রেণী, দুর্লঙ্ঘ্য সাগরমালা, প্রভৃতি প্রাকৃতিক ব্যবচ্ছেদই এই ভাষাভেদের প্রধান হেতু।* কথা অযৌক্তিক নহে,—ভারতে এইরূপ প্রাকৃতিক ব্যবচ্ছেদ অধিক বলিয়াই ভাষাগত পার্থক্যও প্রভূত।

ভারতে নানা ভাষা ও উপভাষা বর্ত্তমান থাকিলেও, সংস্কৃত মূলক হিন্দী, বাঙ্গালা, গুজরাটী, মহারাষ্ট্রী, পালী ও সিংহলী—এই কয়েকটী আর্য্যভাষার প্রধান শাখা বলিয়া

* পণ্ডিতবর রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় উদাহৃতবদ্ধৃত বৃহন্মনুবচন দ্বারা এই কথাই প্রতিপাদন করিয়াছেন—

"বাচো যত্র বিভিদ্যন্তে গিরির্ব্বা ব্যবধায়কঃ।
মহানদ্যন্তরং যত্র তদ্দেশান্তরমুচ্যতে॥"

পরিবর্ত্তিত আকারে উহা পাঠ করিলেই পাওয়া যায়—গিরি বা মহানদীর ব্যবধান-ভূত দেশান্তরেই ভাষার বিভিন্নতা হইয়া থাকে।

পরিগণিত। অধুনা, অনেক পণ্ডিত এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটী ভাষার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন ভাব সংস্থাপনে যত্নবান হইয়াছেন। অন্য দেশের কথা ধরি না—আমাদিগের বাঙ্গালার অন্তর্গত উড়িয়া ও অসমীয়া ভাষা এখন পৃথক্ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও এ দুইটীকে স্বতন্ত্ররূপে স্বীকার করিতেছেন। প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর অতীত হইল, পুরাতত্ত্ববিদ সুপণ্ডিত স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় এবং বালেশ্বর সরকারী বিদ্যালয়ের সংস্কৃত শিক্ষক কান্তিচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় উড়িয়া ও বাঙ্গালা ভাষার স্বাতন্ত্র্য অপনোদনে যথেষ্ট অনুসন্ধিৎসা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, সম্প্রতি, আসামী ভাষায় লিখিত "জোনাকী" নামক সাময়িক পত্রে "অসমীয়া ভাষার উন্নতি সাধিনী সভা"র সম্পাদক, ধীমান শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়, বাঙ্গালা ও আসামী ভাষার স্বাতন্ত্র্য প্রতিপাদনে ততোধিক পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে তৎপ্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ আলোচনা করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বাঙ্গালা বা অসমীয়া--কোন ভাষাতেই আমাদিগের অভিজ্ঞতা নাই ; এরূপ অবস্থায় এই গুরুতর বিষয়ে বাক্যব্যয় করা আমাদিগের পক্ষে বাতুলতা মাত্র। তবে, বহুদিন আসাম-প্রবাসের স্মৃতির সহিত এই উভয় ভাষার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ সংজড়িত, সেই স্মৃতির কুহকেই দুই এক কথা কহিতেছি—ভরসা করি, সহৃদয় অসমীয় বন্ধুগণ আমাদিগের এই ধৃষ্টতা উপেক্ষা করিবেন।

বঙ্গভাষার সৃষ্টিকালে কতদূর পর্য্যন্ত উহার প্রসার ছিল, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। বর্ত্তমান কালে ভাষাগত যে কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহাতে বোধ হয়, উত্তরে হিমালয়-তল-দেশ, পশ্চিমে মিথিলা, দক্ষিণে উড়িষ্যা এবং পূর্ব্বে আসাম—এই চতুঃসীমার মধ্যে প্রথমতঃ বঙ্গভাষার বসতি স্থান ছিল। হিমালয়-সন্নিহিত রঙ্গপুর-দিনাজপুর আজ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ বলিয়া পরিচিত এবং বঙ্গভাষাই তথায় কথিত হইয়া থাকে ; মিথিলার অন্যতর রাজধানী, "দ্বারভাঙ্গা, দ্বার-বঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ" এবং "সেনরাজদিগের বঙ্গরাজ্যের পশ্চিমদ্বার বলিয়া" নির্দ্দিষ্ট। * বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার ভাষা এক, এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে ; আসামীয় ভাষাও এতকাল বাঙ্গালা ভাষার রূপান্তর মাত্র বলিয়া পরিগণিত ছিল এবং বাঙ্গালার হতাদর ও অসমীয়ার স্বাতন্ত্র্য স্থাপন অকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। † কালসহকারে, স্থান সমূহের নিত্য নব কৃত্রিম বিভাগানুসারে, ভাষারও রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। মিথিলা ও বঙ্গদেশ পূর্ব্বে এক রাজ্যভুক্ত ছিল, তাই মৈথিল কবি বিদ্যাপতির 'প্রেমময় পদসমূহ' আজি পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার অমূল্য সম্পত্তি বলিয়া আমরা স্পর্দ্ধা করিতে পারি। এখন মিথিলা ও বঙ্গদেশ পৃথক হওয়ায়, বিদ্যাপতির বাসস্থান লইয়া বিলক্ষণ বিবাদ উপ-

* শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সম্পাদিত "বিদ্যাপতির পদাবলী" গ্রন্থে তল্লিখিত উপক্রমণিকার ।৴০ পৃষ্ঠায় টিপ্পনী দেখুন।

† "A few years ago it was the fashion for Government officials to assert that Assamese was only a corrupt and vulgar dialect of Bengali, a *patois* bearning to it the same relation which Yorkshire bears to the Literay English and that it ought in no way to be encouraged, but to be crushed out as quickly as possible by using Bengali as the offical tongue and teaching it in schools."—Extract from a quotation from the Census Report of 1881, para. 160. Chap. VIII. Part II. Vol. I. of the Census of Assam, 1891.

স্থিত হয় –তাঁহাকে অবিমিশ্র বঙ্গবাসী প্রতিপন্ন করিবার জন্য, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের তৎকালীন সৌহৃদ্য এবং উভয়ের কাব্যগত সৌসাদৃশ্য সূত্রে, বাঁকুড়া বা বীরভূমে তাঁহার বাসস্থান নির্ণীত হইয়া থাকে। ‡ ইদানীং মিশনারী মহাশয়গণের মন্ত্রণায় ও স্বদেশবৎসল জন কয়েক অসমীয়া বন্ধুর চেষ্টায় আসামের ভাষাও পৃথক্ বলিয়া পরিচিত হইতেছে। এই পার্থক্য প্রচলন কতদূর স্থায়ানুমোদিত এবং স্বদেশের সুমঙ্গল-সাধক, এখন তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

'জোণাকী'র উল্লিখিত প্রবন্ধ-লেখক অসমীয়া ভাষার প্রধানতঃ তিনটী যুগ নিরূপণ করিয়াছেন ;—অসমীয়া ভাষার প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা ৺শঙ্করদেবের জন্মের প্রাক্‌কাল প্রথম যুগ, শঙ্করদেবের জন্মের পর ইংরাজ রাজ কর্তৃক আসাম অধিকার কাল পর্য্যন্ত দ্বিতীয় যুগ, এবং ইংরেজাধিকারের সূত্র হইতে আজি পর্য্যন্ত তৃতীয় যুগ। এই যুগত্রয় বিভাগে আমাদিগেরও বিশেষ মতভেদ নাই ; তবে প্রথম যুগের অব্যবহিত পরেই দ্বিতীয় যুগের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল কি না এবং প্রথম যুগের ভাষাই পরিমার্জ্জিত হইয়া দ্বিতীয় যুগের ভাষায় পরিণত হইয়াছিল কি না—এতৎ পক্ষে আমাদিগের ঘোর সন্দেহ, এবং সে সন্দেহ অপনোদনে গোস্বামী মহাশয় বিশেষ সফলকাম হইয়াছেন বলিয়াও বোধ হয় না। হিন্দুগণের আধিপত্যকালে ভগদত্ত, নরকাসুর প্রভৃতি নৃপতিবর্গের কীর্ত্তির কথা কাহারও অবিদিত নাই ; প্রাচীন প্রাগ্‌-জ্যোতিষপুরের প্রসিদ্ধি এবং তৎকালীন সংস্কৃত ভাষার প্রচলন বিষয়েও মতদ্বৈধ সম্ভবে না। এই অবস্থা বর্ণন প্রসঙ্গেই গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন—

"যিবিলাক আর্য্যই কামরূপত ঘর বাড়ী লগেছি, প্রথমতে সংস্কৃতেই তেঁওবিলাকর ভাষা থাকিলেও, সময়ব লগে লগে তেঁওবিলাকব মাতঃবোলেও পুরুষে পুরুষে অল্প লব্‌চব হৈ গড় লবাবলৈ ধৰিলে ; তাত বাজেও অনার্য্য-জাতিবিলাকব ভাষায়ো তেঁওবিলাকব ভাষাক আক্রমণ কৰিছিল ;—এই ঘোৰ কাৰণত তেঁও-

‡ পণ্ডিতবর রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য "বিষয়ক প্রস্তাবে" লিখিয়াছেন, "চণ্ডীদাসের বাটী বীরভূম জেলার মধ্যে ছিল। তাঁহার সহিত বিদ্যাপতির সাক্ষাৎকার বর্ণিত আছে। তদনুসারে বীরভূমের সন্নিহিত কোন স্থানেই বিদ্যাপতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, ইহা অনুমান করা অসঙ্গত বোধ হয় না। * * বিষ্ণুপুরস্থ বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক মহাশয় * * লোক পরম্পরায় জানিতে পারিয়াছেন যে, বাঁকুড়া জেলার ছাহনা প্রদেশে বিদ্যাপতির বাস ছিল। তিনি ঐ প্রদেশের এক সামান্য রাজা শিবসিংহের সভাসদ্ ছিলেন।" পক্ষান্তরে, উল্লিখিত মনস্বী সারদাচরণ মিত্র মহাশয় তৎসম্পাদিত "বিদ্যাপতির পদাবলী" গ্রন্থের ভূমিকায় নানা ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ঘাটন পূর্ব্বক দেখাইয়াছেন, "মিথিলা অর্থাৎ দ্বারভাঙ্গা প্রদেশও যবন করতলস্থ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তত্রস্থ সমস্ত রাজকার্য্য হিন্দুরাজগণের হস্তগত ছিল। * * তন্মধ্যে ১৩৪৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মিথিলায় এক বংশীয় ব্রাহ্মণ রাজত্ব করেন ; এবং তদ্বংশীয় তৃতীয় রাজা শিবসিংহ ১৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিন বৎসর নয় মাস সিংহাসন অধিকার করেন। * * বিদ্যাপতি এই যশোবন্ত নৃপতির সভাসদ্ ছিলেন। * * * চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সমকালবর্ত্তী ছিলেন এবং তিনিও বিদ্যাপতির ন্যায় কৃষ্ণলীলা-গর্ভ পদ-রচনা দ্বারা খ্যাতিলাভ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। উভয়ে উভয়ের যশঃ-সৌরভে মোহিত হইয়া পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। * * প্রবাদ আছে যে ভাগীরথী তীরেই কবিদ্বয়ের পরস্পর সাক্ষাৎ হয়। চণ্ডীদাস বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুর গ্রামে বাস করিতেন ; এই জন্য পূর্ব্বে আমাদের সংস্কার ছিল যে, বিদ্যাপতিও বীরভূম বা বাঁকুড়া জেলায় বাস করিতেন।

বিলাকৰ ভাষা সংস্কৃতৰ পৰা বহুত আঁতৰ হৈ হৈ অন্তত অসমীয়া ভাষাৰ জন্ম হল।"

পৌরাণিক যুগে 'আসাম' নামে কোন জনপদ ছিল না, সুতরাং তৎকালে 'অসমীয়া' ভাষার উৎপত্তি হইতেই পারে না। 'অসমীয়া' শব্দ 'অসম', আর 'অসম' শব্দ 'আহম' শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে—এ কথা গোস্বামী মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন, অতএব আহমদিগের রাজত্বকালেই অসমীয়া ভাষার সৃষ্টি ঘটে, ইহা অস্বীকার করা অসঙ্গত বোধ হয়। "অসমীয়া ভাষা আহম জাতির ভাষা বা সিবিলাকৰ ভাষার পরা ওলোরা এটা ভাষা ন হয়"—একথা সম্পূর্ণ সত্য বটে; কিন্তু ঐ ভাষা যে আহোম রাজার রাজত্বকালে সৃষ্ট নহে, তাহার যুক্তিযুক্ত প্রমাণ কোথা? প্রত্যুত, আহম রাজত্বকালেই বর্ত্তমান অসমীয়া ভাষা সংগঠিত হয়—'জোণাকী'র প্রবন্ধ পাঠে এইরূপই প্রতীতি জন্মে। আর্য্যনৃপতিকুলের তিরোধানের পর আসামে ঘোর অরাজকতা এবং অনার্য্য বর্ব্বরজাতির প্রাদুর্ভাব ঘটে; এই অরাজকতার সময়ে প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের আদিম বাসীগণের বংশ পরম্পরা একরূপ নির্ম্মূল হইয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে তৎকথিত ভাষারও মহাবিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। এরূপ অবস্থায়, অনার্য্য ভাষার সংক্রমণে আর্য্য সংস্কৃত ভাষাই অসমীয়া ভাষায় পরিণত হওয়া সমীচীন বোধ হয় না; বরং বহুকাল-ব্যাপী অনার্য্যজাতির সংঘর্ষণে মূল ভাষা একরূপ উৎসন্ন হইয়া অনার্য্য ভাষাতেই পরিণত হইয়াছিল বোধ হয়। আর্য্যজাতির প্রভুত্বকালে কামরূপ যেরূপ সমৃদ্ধিশালী জনপদ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, অনার্য্যজাতির প্রাদুর্ভাব সময়ে সে সমৃদ্ধির কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় না, বরং বর্ব্বরের রাজ্য কেবল বন জঙ্গলেই ব্যাপ্ত ছিল—ইহারই লক্ষণ দেখা যায়; এই অবস্থায় ভাষা গঠন কোন মতেই সম্ভবে না। প্রত্যুত, আহমগণের শুভাগমনেই আসামের নবজীবন সঞ্চারিত হয়, শ্মশানের প্রেতভূমি অপরূপ রাজসদনে পরিণত হয়, ঘোর অমান্ধকারের পর চন্দ্রকিরণ প্রতিভাত হয়;—পুরাতন বিস্মৃতির অন্তরালে বিলুপ্ত হইয়া, এই সময়ে এক নবীন রাজ্য সংগঠিত হয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমান যুগে আসামের প্রাচীন সমৃদ্ধির যে কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমস্তই ঐ আহোম রাজদিগের কৃত; সর্ব্ববিধ সৌভাগ্য, সম্পদ ও সভ্যতার সহিত ভাষা সৃষ্টিরও প্রযোজন ঘটে, এই অবস্থায় অমানুষী প্রতিভাসম্পন্ন শঙ্করদেব আবির্ভূত হয়েন, এবং তাঁহারই প্রসাদে নূতন 'অসমীয়া' ভাষা সৃষ্ট হয়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

ধর্ম্মরাজ্যে ঘোর অরাজকতার পর মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়া, নব ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন এবং মধুর হরিনামের রোল তুলিয়া পাপী-তাপীর পরিত্রাণ সাধন করেন। অনার্য্যজাতি সমাগমে আসামে লৌকিক অরাজকতার সঙ্গে আধ্যাত্মিক বিষয়েও ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। আহম রাজার অভ্যুত্থানে বাহ্য সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিক অধোগতির তখনও নিরসন ঘটে নাই; এই অধোগতি দূর করিয়া ধর্ম্মসংস্থাপনের উদ্দেশেই মহানুভব শঙ্করদেবের আবির্ভাব বোধ হয়। শঙ্করদেব চৈতন্যদেবের সমসাময়িক,—অথবা চৈতন্যদেবই শঙ্করদেবের

সময়ে নবদ্বীপ ধামে প্রাদুর্ভূত হয়েন; শ্রীচৈতন্যের জন্মের ৩৬ বৎসর পূর্ব্বে শঙ্করদেব জন্মগ্রহণ করেন, এবং তাঁহার তিরোধানের ৩৬ বৎসর পরে মানবলীলা সম্বরণ করেন; মহাপ্রভু ৪৮ বৎসর মাত্র মর্ত্ত্যলীলা করিয়াছিলেন; * অতএব, দেখা যায়, শঙ্করদেব কলিযুগের পূর্ণ পরমায়ু সম্ভোগ করিয়া শাস্ত্রের বচন সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। প্রতিভাশালী পুরুষের প্রথমাবস্থা হইতেই বুদ্ধি ও মহত্বের লক্ষণ প্রত্যক্ষ হয়; স্বজাতিপ্রেম ও স্বধর্ম্মানুরাগ শঙ্করদেবের শৈশবাবধি অন্তরে জাগরূক ছিল, তিনি প্রথমতঃ স্বদেশেই যথাসম্ভব বিদ্যানুশীলন ও ধর্ম্মচর্চ্চা করেন. পরে তাহাতে সম্যক্ তৃপ্তি না হওয়ায় জ্ঞানার্জ্জনোদ্দেশে বঙ্গদেশে গমন করেন। বাঙ্গালার তখন বিলক্ষণ উন্নত অবস্থা; এক দিকে শ্রীচৈতন্য হরিপ্রেম বিতরণে মাতুয়ারা, অন্য দিকে রূপ, সনাতন, জীবগোস্বামী, গোপালভট্ট, কর্ণপূর, প্রভৃতি তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যগণ বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ রচনায় তৎপর, অধিকন্তু অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি এবং স্মার্ত্তচূড়ামণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্রের নবজীবন সংসাধনে সম্পূর্ণ সফলকাম। বাঙ্গালা ভাষারও, প্রকৃত প্রস্তাবে, ইহাই উৎপত্তি কাল; ইতিপূর্ব্বে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী ভিন্ন বঙ্গ ভাষায় লিখিত উল্লেখযোগ্য অপর কোন গ্রন্থই ছিল না, এখন চৈতন্য শিষ্যগণ তদীয় ধর্ম্মপ্রণালী সাধারণের গোচর করিবার নিমিত্ত চলিত ভাষা বাঙ্গালায় গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। † এই শুভক্ষণে স্বর্গীয় শঙ্করদেব বঙ্গদেশে উপনীত হইয়া অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করেন এবং চৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। বহুদিন বঙ্গদেশে অবস্থান করায় ও বাঙ্গালীর বৈষ্ণবধর্ম্মের আলোচনায় তৎকালীন প্রচলিত বঙ্গভাষা একরূপ তাঁহার নিজস্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, লোক-শিক্ষা বিস্তারের নিমিত্ত ভাষা সংগঠন নিতান্ত আবশ্যক—ইহাও তাঁহার সম্পূর্ণ প্রতীতি জন্মিয়াছিল; তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক চিরপোষিত হৃদয়ের ভাব কার্য্যে পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন, এবং অসাধারণ প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য বলে অচিরেই নূতন ভাষায় পুস্তক প্রণয়ন ও বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে কৃতার্থতা লাভ করিলেন। ইঁহার আচার-ব্যবহার এবং পাণ্ডিত্য ও ধর্ম্ম প্রচার শীঘ্রই তদানীন্তন আহোম রাজার চিত্তাকর্ষণ করিল, এবং বঙ্গদেশই তাঁহার এই সমস্ত গুণগ্রামের মূল বুঝিয়া তথাকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রতি সহজেই ভক্তি সঞ্চারিত হইল; রাজা অনতিবিলম্বেই ৺শঙ্করদেবের নির্ব্বাচিত চারিজন সুপণ্ডিত ও সদ্ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশ হইতে আনয়ন পূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। তদবধি আসামে হিন্দুধর্ম্মের পুনরাবির্ভাব; ঐ ব্রাহ্মণ চতুষ্টয়ের প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণপটে, কুরুবাহী, গরমুর এবং আউনীহাটী নামক চারিটী প্রধান সত্র আজি পর্য্যন্ত অসমীয়া হিন্দু সন্তানের হৃদয়ে ধর্ম্মবারি সিঞ্চনে নিযুক্ত রহিয়াছে, এবং ৺শঙ্করদেব প্রতিষ্ঠিত ভাষা আজি পর্য্যন্ত 'অসমীয়া' ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। এই

* চৈতন্যদেবের অবস্থান কাল ১৪০৭ শক হইতে ১৪৫৫ শক পর্য্যন্ত ৺শঙ্করদেবের অবস্থান কাল ১৩৭১ শক হইতে ১৪৯১ শক পর্য্যন্ত।

† পণ্ডিতবর রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" —৫৪-৫৫ পৃষ্ঠা।

সকল তথ্যের অধিকাংশই আমরা আলোচ্য প্রবন্ধ হইতে শিক্ষা পাই, কেবল বাঙ্গালার সহিত অসমীয়ার সম্বন্ধ ঘুচাইবার উদ্দেশ্যেই, বোধ হয়, প্রবন্ধ-লেখক গোস্বামী মহাশয় দেশের উল্লেখ না করিয়া ৺শঙ্করদেব "জ্ঞান অর্জ্জিবৰ নিমিত্তে বিদেশলৈ যায়"—এই কথা লিখিয়াছেন। তাঁহার যে উদ্দেশ্যই হউক, শঙ্করদেবের জ্ঞানোপার্জ্জনার্থ বঙ্গদেশে যাওয়ার কথা আমরা পরিচিত অসমীয়া বন্ধুমাত্রেরই মুখে শুনিতে পাই। এখন তাঁহার গঠিত ভাষাই প্রকৃত 'অসমীয়া' নামের যোগ্য কি না, এবং বঙ্গভাষাই উহার প্রাণ কি না, ইহা বুদ্ধিমান পাঠকবর্গের বিবেচনাধীন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ৺শঙ্করদেব যে সময়ে বঙ্গদেশে গমন করেন, বঙ্গভাষা সেই সময়ে নব কলেবরে গঠিত হইতেছিল,—তৎপূর্ব্বে কেবল বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী বঙ্গসাহিত্যের পরিচয় দান করিত। ঐ দুই বিখ্যাত কবির মধ্যে বিদ্যাপতির রচনাতেই অধিকতর লালিত্য ও মধুরতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। বর্ত্তমান যুগে বঙ্গসাহিত্য সেবক মাত্রেই যেরূপ স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শে, ন্যূনাধিক, নিজ রচনার লালিত্য বর্দ্ধনে চেষ্টা করিয়া থাকেন, শ্রীচৈতন্য ও শঙ্করদেবের সময়ে, সেইরূপ, লেখক মাত্রেই বিদ্যাপতির ছাঁচে আপন রচনা গঠন করিতে যত্ন করিতেন। "তাঁহারই আদর্শ লইয়া গোবিন্দদাস, কৃষ্ণদাস, নরোত্তমদাস, জ্ঞানদাস, শ্রীনিবাস ও নরহরিদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ পদরচনা করিয়া স্ব স্ব নাম চিরস্মরনীয় করিয়া গিয়াছেন।" শঙ্করদেব বঙ্গদেশে অবস্থান কালে তৎকালীন বঙ্গভাষার গঠন-পদ্ধতি শিক্ষা করায়, তাঁহার "লেখাও অনেক অংশে, তেঁওবিলাকৰ (বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের) লেখাৰে সৈতে মিলে।" জোনাকীর প্রবন্ধ-লেখক বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস এবং শঙ্করদেবের কবিতাংশও উদ্ধৃত করিয়া স্বয়ং এ কথা প্রতিপাদন করিয়াছেন, অতএব তৎসম্বন্ধে অধিক বাক্যব্যয় করা অনাবশ্যক। দুঃখের বিষয়, এ সূত্রেও বঙ্গভাষার সহিত 'অসমীয়া ভাষা'র ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা গোস্বামী মহাশয় কৌশলে লোপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ৺শঙ্করদেবের নাটকাদিতে মৈথিল ও উড়িয়া কথার ব্যবহার নিরূপণে গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন—

"মানুহে বিদেশী মাত শুনিবলৈ বেছি ভাল পায়, আমার কাণত বাঙ্গালী কথা যিমান মিঠা লাগে, আৰু বাঙ্গালীৰ কাণত অসমীয়া মাত সিমান মিঠা লাগে, আপোন ভাষা সদাই কৈ থাকা বাবে সিমান মিঠা না লাগে; সেই বাবেই বিদেষী ভাষাৰ ভাঁজ দি তেঁও নাট আদি লেখিছিল।"

এ অতি আশ্চর্য্য যুক্তি! কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস ও সেক্সপীয়রের নাটক সমূহে ভাষার মিষ্টতা বৃদ্ধির জন্য বিদেশী 'ভাঁজ' মিলাইবার চেষ্টা দেখা যায় না, বরং রমণী ও ইতরশ্রেণীস্থ লোকের কথায় প্রাকৃত বা provincialism এর অবতারণা দেখা যায়। নাটক-নামধেয় বাঙ্গালার বর্ত্তমান কোন গ্রন্থেও বিদেশী বাক্য ব্যবহৃত হয় না, বরং স্বদেশের সরল কথাই যথাসম্ভব ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রত্যুত, শঙ্করদেবের সময়ে মিথিলা ও উড়িষ্যা বঙ্গদেশভুক্ত ছিল, ঐ সমস্ত প্রদেশের কথাও বঙ্গভাষার অঙ্গভূত ছিল—সুতরাং শিক্ষা ও সংশ্রব গুণে ঐ সকল স্থানের কথা তাঁহার রচিত গ্রন্থে সহজেই প্রবিষ্ট হইয়াছে।

অতঃপর বর্ত্তমান যুগের কথা। ইংরাজ

শাসনাধিকার-কালেই বর্ত্তমান যুগ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; অসমীয়া ভাষাকে বর্ত্তমান ছাঁচে ঢালা ও উহাকে পৃথক্ ভাষা বলিয়া পরিচয় দেওয়া এই শেষ যুগেই ঘটিয়াছে। 'জোণাকী'র প্রবন্ধ লেখকগণ এবং তাঁহাদিগের সহযোগীবর্গই বর্ত্তমান যুগের লেখক সমাজের ও ভাষাস্রষ্টার শীর্ষ-স্থানীয়। শিক্ষাগুণে স্বদেশীয় ভাষার স্বাতন্ত্র্য সাধনে সচেষ্ট হইলেও, ইঁহাদিগের ভাষার আদিতেও বাঙ্গালা ভিন্ন অপর কিছু দেখা যায় না। ইংরাজের শুভাগমনের সঙ্গেই তদীয় পার্শ্বচর বাঙ্গালী আসামে আগমন করিয়াছেন, আর তাঁহাদিগের দ্বারাই প্রধানতঃ অসমীয়া বন্ধুগণের শিক্ষা দীক্ষা সংসাধিত হইয়াছে। বাঙ্গালী শিক্ষকের নিকট শিক্ষালাভ করেন নাই, বাল্যে বাঙ্গালাই মাতৃভাষার ন্যায় বিদ্যালয়ে পাঠ করেন নাই, বাঙ্গালার কাব্যোপন্যাস তাঁহার রচনাপ্রণালী সংগঠনে সহায়তা করে নাই,—নব্য অসমীয়া লেখকগণের মধ্যে এরূপ কথা কয়জন সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারেন? জনকয়েক বাঙ্গালী কুলাঙ্গারের অবৈধ ব্যবহার অসমীয়া বন্ধুগণের বিসদৃশ বোধ হইলেও, শিক্ষিত অসমীয়ামাত্রের বসন-ভূষণে, চাল-চলনে, সাহিত্য গঠনে, সমাজ সংস্থাপনে যে বাঙ্গালা ভাব ওতঃপ্রোতঃ ভাবে সংজড়িত, ইহা নিঃশঙ্কচিত্তে ঘোষণা করা যাইতে পারে। কৃতবিদ্য অসমীয়া বন্ধুগণও একবাক্যে বাঙ্গালীর নিকট এজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কৃপণতা করেন না। বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে বাঙ্গালীর সহিত অটুট সংস্রব এবং অসমীয়ার পরিবর্ত্তে বঙ্গভাষা শিক্ষা অসমীয়া বন্ধুগণের স্বকীয় ভাষার সমৃদ্ধি বর্দ্ধনে কি পরিমাণে কার্য্যকরী, তাহাও সহৃদয় পাঠকবর্গের বিবেচ্য।

এখন এই অসমীয়া বাঙ্গালার সংস্রব ঘটিত অবান্তর দুই-এক কথার আলোচনা পূর্ব্বক প্রবন্ধের উপসংহার করা যাউক। শ্রুতি ও স্মৃতির কাল অতীত হওয়ার পর, ভাষা সৃষ্টির সঙ্গে অক্ষরোৎপাদনের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী বোধ হয়। অসমীয়া গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য কোন্ সময়ে অক্ষর সৃষ্টি হইয়াছিল, আলোচ্য প্রবন্ধে তাহার বিশেষ উল্লেখ দেখা যায় না। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় অসমীয়া ভাষায় বঙ্গাক্ষরই অবিকৃত ভাবে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়,—এক রকার ও অন্তঃস্থ বকার ব্যতীত কোন বৈলক্ষণ্যই বোধ হয় না; এ দুই অক্ষরও প্রাচীন বঙ্গাক্ষরের অনুরূপ। এই দুই অক্ষর সম্বন্ধে পণ্ডিতবর রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় যে তথ্য প্রচার করিয়াছেন, তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত করা গেল—

'এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মহাশয়দিগের গৃহে ৩।৪ শত বৎসরের হস্তলিখিত যে সকল সংস্কৃত পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অক্ষর সকল এক্ষণকার অক্ষর অপেক্ষা অনেকাংশে বিভিন্ন। সচারাচর ঐ সকল অক্ষরকে 'তিরুটে' (ত্রিহুতী) অক্ষর বলে। ঐ অক্ষরে দেবনাগরের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। দেবনাগরে অন্তঃস্থ ব ও বর্গীয় ব বিভিন্ন প্রকার, ঐ তিরুটে অক্ষরেও দুই বকারের বিভিন্নতা দেখা যায়—যথা অন্তঃস্থ বকার (ব) এইরূপ, বর্গীয় বকার (ব) এইরূপ এবং রকার (র) এইরূপ। এক্ষণকার বাঙ্গলা বর্ণমালায় বকারদ্বয়ের কিছুমাত্র ভেদ নাই এবং রকার পূর্ব্বকালীন অন্তঃস্থ বকারের পরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়াছে। প্রাচীন রকার যে অধিক দিন তিরোবেশ হইয়াছে, তাহা নহে। অদ্যাপি পল্লীগ্রামের সাবেক গুরুমহাশয়দিগের পাঠশালায় 'কর-পারা ব পেটকাটা' বলিয়া রকার লেখান হইয়া থাকে।" *

* বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব—৪০৫ পৃষ্ঠা।

আসামে ঠিক প্রাচীন বকার ও অন্তঃস্থ বকার আজি পর্য্যন্ত চলিতেছে; অন্তঃস্থ বকারের তলদেশে বিন্দুর পরিবর্ত্তে হসন্ত চিহ্ন ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু ঐ হসন্ত চিহ্ন বিন্দুরই রূপান্তর মাত্র, আর আমাদিগের স্মরণ হয়, ত্রিহুত-প্রবাস কালে মৈথিল পণ্ডিতগণের লেখাতেও আসামের ন্যায় অন্তঃস্থ বকারের তলে বিন্দুর পরিবর্ত্তে হসন্ত চিহ্ন ব্যবহৃত হইতেই দেখিয়াছি। ফলতঃ, ত্রিহুতী, অসমীয়া ও বাঙ্গালা—এই ত্রিবিধ অক্ষর যে এক, এ পক্ষে কোন মতভেদের আশঙ্কা দেখা যায় না। ৺শঙ্করদেবের সময়ে বঙ্গ ও মিথিলায় একই অক্ষর চলিত। তিনিও বঙ্গদেশে ঐ অক্ষর শিখিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক সেই অক্ষরেই আপন গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ও অসমীয়া ভাষার অবিচ্ছিন্ন ভাবের ইহাও অন্যতম প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

আলোচ্য প্রবন্ধের মুখবন্ধেই যে কয়েকটী কথা লিখিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা দেখা যাউক, বর্ত্তমান অসমীয়া ও বাঙ্গালা ভাষার কতদূর প্রকৃতি ও রচনাগত পার্থক্য। লেখক লিখিয়াছেন—

"আলোচনা আরু আন্দোলনেই সকলো বিধ উন্নতিৰ মূল। আজি কালি অনেকে অসমীয়া ভাষাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ধৰিছে. আরু কোনো কোনোৱে আন্দোলন কৰিবলৈকো আগ বাঢ়িছে; এই বিলাক দেখি শুনি, আমার মনত অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতিৰ আশাই বহু দূৰৈ শিপাইছে। জগদীশ্বৰৰ ওচৰত একান্ত মনে প্রার্থনা কৰোঁ যেন, আমাৰ এই আশাৰ পুলিটি দুপতীয়তে জঁয় ন পৰে। বৰ বেজাৰৰ কথা আজিলৈকে, বিদেশীৰ কথাকে নকওঁ, অনেক অসমীয়া মানুহৰ মনতো অসমীয়া ভাষাৰ বিষয়ে বহুত খুঁকুৰি আছে—কোনোৱে কয়, অসমীয়া ভাষা এটা বেলেগ সাহিত্য থকা স্বতন্ত্ৰীয়া ভাষা ন হয়, ইহা বাঙ্গালী ভাষাৰ চহা অৱস্থা মাথোন; কোনোৱে ইয়াক এটা বেলেগ ভাষা বুলি স্বীকাৰ কৰিও ইয়াৰ আত্মশুকহ স্বীকাৰ ন কৰে; কোনো কোনেৱে আকো ইয়াক এটা বেলেগ ভাষা বুলিও শক্তি কৰে, আরু ই যে অসমীয়া মানুহৰ পক্ষে নিতান্ত লাগতীয়াল তাকো মানে, কিন্তু তাৰ উন্নতি কৰা পক্ষত তেনেই উদাস; তেঁও বিলাকৰ মতে বঙ্গালী আরু অসমীয়া দুটা সংস্কৃত মূলক ভাষা, সেই গুণে অসমীয়াৰ ভাষাৰ উন্নতি কৰিবলৈ গলে কি বঙ্গালী ভৰাৰ কালৈ চাব লাগ আক শেহত বঙ্গালী ভাষাৰে সৈতে এটা ভাষা হৈ পৰিব।"

উল্লিখিত অংশের রচনা প্রণালী (style) এবং বাক্য যোজনা (diction) যে আধুনিক বঙ্গভাষার অনুরূপ, বঙ্গভাষাভিজ্ঞ মাত্রেই ইহা সহজে অনুভব করিতে পারেন,—ফলতঃ, বাঙ্গালা ভাব ও বাঙ্গালা ভাষার সহিত দুই চারিটী অসমীয়া গ্রাম্য শব্দের সংমিশ্রণে উহা গঠিত হইয়াছে, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। 'আরু' 'আন্দোলনেই' 'সকলো' প্রভৃতি কয়েকটী কথায় উকার, একার এবং ওকার সংযোজিত করিয়া বাঙ্গালার সহিত পার্থক্য স্থাপন করিতে চেষ্টা হইয়াছে; পরন্তু, 'ধরিছে', 'বাঢ়িছে', 'দেখি শুনি', 'গলে', 'পরিব' প্রভৃতি বাক্যে 'য়া', 'তে' ও 'এ'কার লুপ্ত করিয়া স্বাতন্ত্র্যের চিহ্ন প্রকাশিত হইয়াছে—এই সকলের লোপ, গদ্যে না হইলেও, বাঙ্গালা পদ্যে এখন পর্য্যন্ত সাধিত হইয়া থাকে। 'করিবলৈ' 'কোনোরে', 'আজিলৈকে', 'সি' প্রভৃতি কথা 'করিবার জন্য', 'কোন', 'আজি পর্য্যন্ত', 'সে' প্রভৃতি কথা বাঙ্গালা কথার রূপান্তর মাত্র। কলিকাতা অঞ্চলের শৌণ্ডিক, সুবর্ণবণিক প্রভৃতি কয়েক জাতি এবং কৃষ্ণনগর, বীরভূম, ঢাকা প্রভৃতি স্থানের অনেক লোক 'ড়' উচ্চারণ করিতে পারেন না—'র' বলিয়া থাকেন; অসমীয়া 'বর', 'পরিব' প্রভৃতি কথায় সেই

কারণেই 'ড়' স্থানে 'র' ব্যবহৃত হইয়াছে—প্রভেদের মধ্যে 'ড়'—উচ্চারণে অসমর্থ বাঙ্গালী লিখিবার সময় 'ড়'ই লিখিয়া থাকেন, আর তদ্রূপ অক্ষম অসমীয়া উচ্চারণমত অক্ষরই ব্যবহার করেন। 'মানুহর' এবং 'শেহত' এই দুই বাক্যে অসমীয়া কোন্ ব্যাকরণ মতে 'ষ'র পরিবর্ত্তে 'হ' ব্যবহৃত হইয়াছে,—আমরা বলিতে অক্ষম, আমরা যতদুর অবগত আছি, তাহাতে লিখিবার সময় 'ষ' ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য, কেবল ঐ বর্ণ উচ্চারণে অসামর্থ্য প্রযুক্ত তাহা 'হ' বলিয়া উচ্চারিত হয় মাত্র। * এই 'ষ' স্থানে 'হ'র উচ্চারণ শ্রীহট্টাঞ্চলেও কিয়ৎ পরিমাণে শুনা যায়, কিন্তু তজ্জন্য লিখিত ভাষায় 'হ'র ব্যবহার চলে না, উহা একটা ভাষা বিভিন্নতার লক্ষণ বলিয়াও গণ্য হয় না। 'আগ বাঢ়িছে', 'পুলিটি' (নব তৃণাঙ্কুর; বাঙ্গালায় ক্ষুদ্রার্থে—যথা, ছেলে-পুলে), 'বেজারর', 'খুঁকুরি' (সন্দেহ), 'গস্তি', 'লাগতীয়াল' (বাঙ্গালায় 'লাগমত') 'চাল' প্রভৃতি বাঙ্গালার দেশজ শব্দ মাত্র (only a corrupt and vulgar dialect of Bengali); অসমীয়ার স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন চেষ্টায় বিশুদ্ধ লিখিত ভাষায় এরূপ অপভাষার অবাধ ব্যবহার সদ্বিবেচনার কার্য্য বোধ হয় না। 'মনত', 'ওচচত', 'পক্ষত' প্রভৃতি সপ্তম্যন্ত পদে 'ত'এর ব্যবহার বাঙ্গালার 'তে'র অনুরূপ; মনেতে, গোচরেতে পক্ষতে প্রভৃতির 'তে'র কার্য্য আজি কালি বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় মাত্র একার দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, অসমীয়াতে এখনও পূর্ব্ব রীতি বিদ্যমান। 'জগদীশ্বরর' 'বেজারর', 'মানুহর' প্রভৃতি পদস্থিত সম্বন্ধ সূচক র এর পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণগত এ কার বিলোপ দ্বারা বাঙ্গালার পদ্ধতি হইতে পার্থক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে; উড়িয়া ভাষাতেও অবিকল ঐ ভাবে র ব্যবহৃত হইয়া থাকে—ইহাতেও আমাদিগের পূর্ব্বকথিত মিথিলা, উড়িষ্যা ও আসাম সীমা পর্য্যন্ত বঙ্গভাষার বিস্তৃতিরই পরিচয় বুঝা যায়। 'দকৈ শিপাইছে' = বদ্ধমূল হইয়াছে, 'বেলেগ' = পৃথক্, 'মাথোন' = মাত্র, 'বিলাক' = সমূহ, 'ফাললৈ' = দিকেই, প্রভৃতি কয়েকটা কথা বাঙ্গালা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ প্রতীয়মান হয় বটে; নচেৎ 'ওচরত' = গোচরে, 'দুপতিয়াতে' = দুই পাতায়, 'জায়' = যায়, 'স্বতন্ত্রীয়া' = স্বতন্ত্র, 'ইয়ার' = ইহার, প্রভৃতি কথায় বাঙ্গালার প্রকৃতি ও পরিচ্ছদ সম্যক্ পরিদৃশ্যমান। "অসমীয়া ভাষা"র প্রবন্ধ-লেখক গোস্বামী মহাশয় নিজ প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ব্রাউন সাহেবের মতে, অসমীয়া ভাষার মধ্যে শতকরা ৭ টী অকা, ৫ টী মগ, ১ টী থাম্‌টী, ১ টী আবর, ২৩ টী মিশমি এবং ৬৩ টী সংস্কৃত মূলক শব্দ; উপরি উদ্ধৃত অংশে, এবং অসমীয়া ভাষার সর্ব্বত্রই দেখা যায়—সংস্কৃত মূলক শব্দ মাত্রেরই আকার ও পরিচ্ছদ বাঙ্গালার ন্যায়; কেবল অনার্য্য অকা, মগ, থাম্‌টী, আবর প্রভৃতি জাতির ভাষা উহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উহাকে পৃথক্ ভাষারূপে পরিণত করিয়াছে এবং লিঙ্গ, বচন, কারক, ক্রিয়াদিতেও, বাঙ্গালার তুলনায়, কিঞ্চিৎ রূপান্তর ঘটাইয়াছে। এরূপ অবস্থায়, যে সমস্ত অসমীয়া

* There is a further difference in pronunciation, which more than anything else tends to make interchange of ideas difficult between a speaker of Bengali and of Assamese, *viz.*, the change of the letters *sh* and *s* to *h* and of *chh* and *ch* to *s*.—Report on the Census of Assam, 1891 Part II. Chap. VIII. para. 160.

ভদ্রলোকের মতে "বাঙ্গালা এবং অসমীয়া দুইটাই সংস্কৃত মূলক ভাষা, তজ্জন্য অসমীয়া ভাষার উন্নতি করিতে গেলে বাঙ্গালা ভাষার দিকেই পরিণতি দাঁড়াইবে এবং শেষে উভয় ভাষা একীকৃত হইবে", * তাঁহাদিগেরই পরিণামদর্শিতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় এবং প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়ের ন্যায় দুঃখ করিবার কোন হেতু দেখা যায় না। শব্দ শক্তির অনির্ব্বচনীয় প্রভাব; ভিন্ন ভিন্ন রাজার শাসন কালে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার বিস্তর কথা আমাদিগের ভাষার পুষ্টিসাধন করিয়াছে—বাঙ্গালার গ্রাম্য ভাষায় এজন্য অনেক আরব্য, পারস্য প্রভৃতি যাবনিক কথা আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, অধুনা চলিত ভাষায় অনেক ইংরাজি কথাও অলক্ষ্যে প্রবেশলাভ করিতেছে। লিখিত ভাষায় ঐ সমস্ত গ্রাম্য ও দেশজ কথা পরিহার এবং ভাষার তেজ ও বিশুদ্ধতা বর্দ্ধন করিতে গেলেই আমাদিগকে সংস্কৃতের আশ্রয় লইতে হয়; স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক ইংরাজি কথার প্রতিশব্দ সংস্কৃত মূলক করিয়া বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন, এখনও অনেক কৃতবিদ্য বঙ্গীয় লেখক তাঁহার প্রবর্ত্তিত পথ অনুসরণ করিতেছেন। অসমীয়া ভাষার প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে গেলেও উহা হইতে ঐরূপ অনার্য্যজাতির কথা সমস্ত দূর করিয়া, তাহার স্থানে সংস্কৃত মূলক বিশুদ্ধ বাক্য সন্নিবিষ্ট করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, আর তাহা হইলেই বাঙ্গালা ও অসমীয়ার অভেদ অবস্থা দাঁড়াইবার সম্ভাবনা।

ইংরাজি ১৮৭১ অব্দ পর্য্যন্ত আসামের আদালত ও বিদ্যালয় সমূহে বঙ্গভাষাই প্রচলিত ছিল। তখন পর্য্যন্ত বঙ্গ ও অসমীয়া ভাষা বিভিন্ন বলিয়া কোন অসমীয়ারই বোধ ছিল না,—অসমীয়া মাত্রেই মাতৃভাষা নির্ব্বিশেষে বঙ্গভাষার পরিচর্য্যা করিতেন। পরে, নব্য অসমীয়া বন্ধুগণের মতে, আসামের সাহিত্য-আকাশে সৌভাগ্য-সূর্য্য উদিত হইল;—বিখ্যাত Baptist Mission Society নামক খ্রীষ্টশিষ্যগণ আসামের সাহিত্য-গঠনে তৎপর হইলেন,—শিবসাগরে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন পূর্ব্বক অসমীয়া ভাষায় খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের গ্রন্থাবলী প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীরামপুরের মিশনারী সম্প্রদায়ও এ পক্ষে সামান্য সহায়তা করেন নাই, তাঁহাদিগের যত্নেই নবগঠিত অসমীয়া ভাষায় 'বাইবেল' অনুবাদিত হইল; মাননীয় Robinson এবং Brown সাহেব কর্ত্তৃক অসমীয়া ভাষার ব্যাকরণ বিরচিত হইল; পাদরি পুঙ্গবদিগের দ্বারা 'অরুণোদয়' নামক অসমীয়া ভাষায় প্রথম মাসিক সমালোচনা-পত্র প্রকাশিত হইল; এবং ক্রমশঃ Branson নামক জনৈক সাহেব কর্ত্তৃক অসমীয়া ভাষার অভিধানও আবিষ্কৃত হইল। এ ঘটনা অসমীয়া বন্ধুগণের বিবেচনায় সৌভাগ্যের বিষয় হইতে পারে এবং তাঁহারা তদ্দ্বারা জাতীয় গৌরবে গৌরবান্বিত বোধ করিতে পারেন, কিন্তু আমরা ইহাতে দুই বিন্দু অশ্রুবর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারি না। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের নবজীবন সঞ্চারের নিমিত্ত স্বর্গীয় মহানুভব শঙ্করদেব কর্ত্তৃক যে ভাষা গঠিত হইয়াছিল, আজ খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য ইংরাজ হস্তে সেই ভাষায় নূতন পরিচ্ছদ প্রস্তুত হইল। বাটীর পার্শ্বের বাঙ্গালী বিদেশী হইল, আর সাগর-পার হইতে সাহেব আসিয়া স্বদেশী হইলেন!—

* উপার উদ্ধৃত অংশের শেষাংশ দেখুন।

মাতৃভাষায় অভিধান ও ব্যাকরণ ম্লেচ্ছ মিশনারী আসিয়া প্রণয়ন করিলেন! পতিত ভারতের পক্ষে ইহাপেক্ষা সৌভাগ্যের পরিচয় আর কি হইতে পারে? মিশনারী সাহেবগণ কর্ত্তৃক যেরূপ পরিমার্জ্জিত ভাষা সৃষ্ট হইয়া থাকে, "মথি লিখিত সুসমাচার" পরিজ্ঞাত পাঠককে তাহা আর বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে না; আর উল্লিখিত অভিধান সম্বন্ধে উত্তর পূর্ব্ব বিভাগের বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক পোটর সাহেব ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের স্বীয় বিজ্ঞাপনীতে লিখিয়া গিয়াছেন যে, "আসামীদিগের জন্য আসামে মিশনারীদের কীর্ত্তি স্থানে কিন্তি অকির্ত্তন—অকীত্তন, অকৃতজ্ঞ—অক্রিতজ্ঞ, অক্ষয়—অখাই, অশ্রদ্ধা—অচধা, অচিহ্ন—অচিন, নবক্ষার—জখার, ইত্যাদি সন্নিবেশ করিয়া স্বতন্ত্র অভিধান লিখিবার কিছুই আবশ্যকতা নাই। ইহাতে কেবল বিশুদ্ধ বাঙ্গালাকে নাশ করা হয় মাত্র।"* অসমীয়া ও বাঙ্গালার স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে বর্ত্তমান যুগের ইতিহাস, বুদ্ধিমান পাঠক ইহা হইতেই বিলক্ষণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

আমাদিগের আলোচ্য বিষয় এত গুরুতর যে, সামান্য প্রবন্ধে তাহার সম্যক্ বিচার সম্ভবে না, আর পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে বিচার করিবার ক্ষমতা আমাদিগের নাই। 'জোনাকী'র প্রবন্ধাতীত ইতিহাসও আমরা কিছুমাত্র অবগত নহি। ঐ প্রবন্ধ হইতেই আমরা যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে দেখা যায়, হিন্দুরাজত্ব কালে আসাম প্রদেশে সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল; মধ্যে অনার্য্য জাতির অভ্যুদয়ে আসামের স্বাধীনতার সহিত ভাষাও বিলুপ্ত হইয়াছিল; পরে আহম-প্রাধান্য-যুগে ৺শঙ্করদেব কর্ত্তৃক বঙ্গভাষা এদেশে প্রবর্ত্তিত হয় এবং ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাত হইতে বঙ্গদেশীয় শিক্ষকগণের শিক্ষায় ১৮৭১ অব্দ পর্য্যন্ত লিখিত ভাষায় বাঙ্গালাই অবিকৃত ভাবে ব্যবহৃত হইতে থাকে। ইত্যবসরে মিশনারী সাহেবগণের চেষ্টায় বাঙ্গালাকে বিকৃত করিয়া ও পার্শ্ববর্ত্তী অসভ্য পার্ব্বত্য জাতিগত কতকগুলি শব্দ মিশ্রিত করিয়া অসমীয়া ভাষার নব কলেবর গঠিত হইয়াছে, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া অসমীয়া নব্য কৃতবিদ্য বন্ধুগণ অসমীয়া ভাষার স্বাতন্ত্র্য নির্দ্ধারণে সচেষ্ট হইয়াছেন এবং সরকার বাহাদুরও তাহাতে পোষকতা করিতেছেন। ভাষাভেদ যে ভারতের অধঃপতনের অন্যতম হেতু, ইহা সকলেই আজ-কাল অনুভব করিতে পারেন; ঐক্য-বল সংস্থাপনের চেষ্টায়, সে জন্য, আজ কাল জাতীয় মহা সমিতিতে পরস্পর চিত্ত-বিনিময়ের উৎকৃষ্ট উপায় এক ভাষা প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে এবং ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ অন্য উপায় না থাকায়, ইংরাজির দ্বারা সে প্রয়োজন সাধিত হইতেছে। এরূপ অবস্থায়, কৃত্রিম উপায়ে এক ভাষার মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ সাধন করিয়া, অসমীয়া বন্ধুগণ কিরূপ সদ্বিবেচনার কার্য্য করিতেছেন—ইহা স্থির চিত্তে চিন্তা করিতে অনুরোধ করাই আমাদিগের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ।

* "উড়িয়া স্বতন্ত্র ভাষা নহে" নামক গ্রন্থের ৩৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

এক অপরিজ্ঞাত কবি।

বাঙ্গালা সাহিত্যের সঘন কোলাহল হইতে দূরে, লোক-সাধারণের অপরিজ্ঞাত জনৈক বাঙ্গালী কবি জন্মিয়াছিলেন। স্বতঃ সৌন্দর্য্য ধ্যান নিরত—স্বভাবের অতি নিভৃত সারস্বত-শিবিরে, এই কবি সৌন্দর্য্যের ধ্যানে সততঃ নিমগ্ন থাকিতেন। সে ধ্যান প্রশান্ত, প্রগাঢ়, পবিত্র; এবং এই অপরিজ্ঞাত কবি-প্রকৃতির সর্ব্ব প্রধান অংশ, উপাদান, প্রাণ বা যথা-সর্ব্বস্ব ছিল। এই কবি, কবি-জনোচিত গীতি না গাইতেন, না গাইয়াছিলেন, এমন নয়;—আত্ম ভাবে বিভোর হইয়া, বিগলিত এবং বিমোহিত হইয়া, ইনি আপন মনে আপনি গাইতেন,—সে গান মিষ্ট ও মহানও বটে; কিন্তু, গান অপেক্ষা ধ্যানেই ইঁহার অধিকতর প্রবণতা; ইঁহার কবি-জীবন এবং কবিত্বের জীবনীশক্তি গান অপেক্ষা ধ্যানেই অধিক পরিমাণে ব্যয়িত হইয়াছিল; পরন্তু, গান অপেক্ষা ধ্যানেই ইঁহার বিশেষত্ব ও ব্যক্তিত্ব অধিকতর অনুভবনীয়। ব্যক্তিত্ব খুব বৃহৎ নয়, বিশেষত্বও বেশী বিস্তীর্ণ নয়; কিন্তু, বিশেষত্ব ও ব্যক্তিত্ব ইঁহার কিছু ছিল। তাহা ছিল গানে, ততোধিক তাঁহার ধ্যানে। গান ধ্যানেরই ক্ষণিক অনিবার্য্য উচ্ছ্বাস স্বরূপ উত্থিত হইত। কবি কচিৎ আত্ম সংযমে যেন অসমর্থ হইয়াই গান গাইতেন; সে গান কতক কেহ কেহ শুনিয়াছিল; তাহার অনেক অদ্যাপি অশ্রুতও আছে; অশ্রুতই হয় ত থাকিবে। ধ্যানশীল কবি সম্প্রদায় তাঁহাদের সব গান শুনাইতে চাহেন না। এই কবি, এমন অনেক গান গাহিতেন, যাহা লোককে শুনাইবার জন্য গীত হইত না—গীতের জন্য গীত হইত, অর্থাৎ স্বভাবের ঐকান্তিক উত্তেজনা নিবারণার্থে গীত না হইলেই চলিত না। গানশীলতা গীত শুনায়; ধ্যানশীলতা গান গোপন করে। গান গোপন করা, এই অজ্ঞাত কবির অভ্যাস ছিল। তিনি গান গোপন করিতেন এবং শুনিয়াছি গোপনে গান করিতেন। সে গান কত সময় সূত্রহীন, সংসার-সঙ্গতি হীন, আদ্য-মধ্য অন্ত হীন—

"অচেতনে চেতন! ঘুমন্তে জাগা!
সকলি বিচিত্র স্বপনের কাণ্ড! গোড়া নাই আগা!"

সে গান অশরীরী সৌন্দর্য্যের "airy nothing' অজ্ঞাত দেশের অস্ফুট বার্ত্তা; অপরিজ্ঞাত বীণার অপরিচিত ধ্বনি;—তাহা

"The forms of things unknown."

সে গান কবি-কথিত ("aerial kisses of shapes that haunt thought's wildernesses") কল্পনা-কানন বিহারী অশরীরী অঙ্গের সমীর-চুম্বন;—এক অতি সুমধুর সত্ত্বা; অস্থি মজ্জা-মেধ-মাংস-হীন, আকার-অবয়ব-হীন; অথচ সম্মুখস্থ সজীব মনুষ্য-দেহ অপেক্ষা অধিকতর অস্তিত্ব-সম্পন্ন, দৃঢ়তর সত্য প্রত্যক্ষ, তাহা অমর

"More real than living man, nurslings of immortality.

কবি গোপনে, অল্পাধিক পরিমাণে এই প্রকৃতির গীত গাইতেন; কখন কখনও এই গীতের অশরীরী স্বরূপের শরীর "ছন্দ বন্ধ" দ্বারা গঠিতও করিতেন। যাহা গঠিত হইত, তাহা অপেক্ষা অধিক অগঠিত থাকিত;—অথচ ইঁহার অসাধারণ গঠন-নৈপুণ্য ছিল; যাহা গঠন করিতেন, তাহা সুগঠিত হইত; কিন্তু তদীয় গীত-স্বরূপের সর্ব্বাঙ্গ গঠনে তিনি

স্বামী ছিলেন, এখনও বলিতে পারি না। গান, সান্ত, সঙ্কীর্ণ; ধ্যান অসীম অনন্ত। অসীম সৌন্দর্য্য সসীম দ্বারা সুব্যক্ত করিতে কে কবে পারিয়াছে? কবি তাঁহার আত্মার আভ্যন্তরীণ ভাব-স্রোতে ভাসিয়া অজ্ঞাতে ইন্দ্রিয়াতীতের এক মহা দেশে, কল্পনার কি এক মায়া-রাজ্যে, কিম্বা স্বপ্নের কেমন-এক ছায়া-রাজ্যে চলিয়া যাইতেন;—শরীরী ও অশরীরী উভয় রাজ্য ব্যাপিয়া এক অবিমিশ্র অতি কোমল, তরল এবং শীতল সৌন্দর্য্য-স্রোত প্রবাহিত হইত; ধ্যানমগ্ন কবি আত্মস্থ বা আত্ম বিস্মৃত হইয়া তাহা উপভোগ করিতেন, তাহাতে অবগাহন করিতেন; ইহ সংসারের কোলাহলের সহিত সংস্রব রাখিতে চাহিতেন না;—গান তিনি অতি অল্পই গাইয়াছিলেন।

সে গান সাঙ্গ হইয়াছে। সে ধ্যান, ধ্যেয় ও ধ্যাতের সহিত মিশিয়াছে। জীবন-সঙ্গীত সাঙ্গ করিয়া,লোক-অপরিজ্ঞাত আমাদের এই কবি, যেমন লোক-দৃষ্টির অগোচরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং লোক-দৃষ্টির বাহিরে কবি-জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তেমনি লোক-বিখ্যাতির অতীত ভাবেই অন্তর্হিত হইয়াছেন!

কবি গিয়াছেন। কবিতা কিছু আছে। সে অতি কোমল কবিতা। কোমলাদপি কোমল। মিষ্ট, মসৃণ, মোলায়েম। আবেশময়ী;—ইথরবৎ আকাশ-বিহারিণী।

"সুকোমল চরণ-কমল দুটি
ছোঁয় কি না-ছোঁয় মাটী, আঁচল ধরায় পড়ে লুটি,
অরুর গন্ধ-ফুল
করে দুল-দুল,
অলসিত কিঙ্কিণীর আধো আধো বুলি,

কঠিন মাটির কর্কশ স্পর্শ সহে না। অতি সাবধানে তাহা ছুঁইতে হয়। নহিলে নবনীতবৎ এলাইয়া যায়,—নক্ষত্রবৎ ছুটিয়া পলায়। এই ধরি ধরি ধরিলাম, ভাবিতেছি, অমনি তখনি কোথায় চলিয়া গেল, সে সূত্র নাই—সে সৌন্দর্য্য নাই, অপর এক অলক্ষ্য সূত্র সহযোগে ভিন্ন প্রকৃতির সৌন্দর্য্য আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত! একই মুহূর্ত্তে বহুমূর্ত্তিমতী,—বহুরূপিনী, বহু ভাবময়ী এই কবিতা। স্বপ্নরাজ্যের সূত্র দ্বারা যেন ইহা গ্রথিত, সন্ধি ও মিলন-স্থল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যেন ভিত্তিহীন এক অপরূপ অট্টালিকা; শূন্যের পরে কুসুম-সৌরভের সমুন্নত সৌধ সৌন্দর্য্য গ্রথিতে স্তবে স্তরে গাঁথা! সৌন্দর্য্য রাজ্যের রসাভিজ্ঞেরই তাহা উপভোগ্য। উপভোগের সন্ধান ও সঙ্কেত না জানিলে সৌধ খসিয়া পড়ে; সৌরভ সরিয়া যায়; সে কবিতা খাঁটি সৌন্দর্য্যের খাদহীন স্বর্ণ; সুতরাং তাহাতে গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী বাসন কোষণ বা গৃহিণীর গহনা গঠিত হইবার উপায় নাই। এ হিসাবে, তাহা একান্ত অব্যবহার্য্য; কারণ খাদহীন। কিছু খাদ মিশ্রিত থাকিলে লোকের ব্যবহারোপযুক্ত হইতে পারিত। খাঁটি সোণা মানুষ মানুষীর সৌন্দর্য্য-স্পৃহা পরিতৃপ্ত করিতে পারে, কিন্তু ঘর সংসারে ব্যবহারে আসে না;—শেকরা সোণায় খাদ মিশাইলেই তবে তাহা সুন্দরীর সংস্পর্শ-যোগ্য হয়, তিনি তাহার অস্তিত্ব মঞ্জুর করেন।

কবি গিয়াছেন। কবিতা আছে। চিরকাল থাকিবে। তাহা অতি জীবন্ত কবিতা। অথচ তাহার কবি অপরিজ্ঞাত। অপরিজ্ঞাত ছিলেন; তদ্রূপ গিয়াছেন। অমর কবিতার কবি লোক সাধারণের অজ্ঞাত,—হেতু কি?

তদীয় কবিতা অমর, উজ্জ্বল, কোমল, মিষ্ট, হৃদয়ে সুধা-সিঞ্চিনী। কিন্তু, সৌন্দর্য্য-রাজ্যের এমন সূক্ষ্ম কথায় পূর্ণ সে কবিতা যে, তাহা প্রচলিত সাহিত্য-সমালোচকের অনায়ত্ত, সাহিত্য-ব্যবসায়ের অবিজ্ঞাপিত; তাহা সৌন্দর্য্য-মন্ত্রে অদীক্ষিত লোক সাধারণের অবোধগম্য; অথচ সংসারে সেইরূপ লোকের সংখ্যাই অধিক। অতএব এই কবিতা সাহিত্য-বিপণিতে বিরল, অবিক্রেয়। কবি অপরিজ্ঞাত।

কিন্তু ইহাও এই কবির সৌভাগ্য। কারণ আমি বিবেচনা করি, তাঁহার কবিতা জন সাধারণের মধ্যে বহু বিস্তার লাভ করিলে, তাহা নিশ্চয়ই ইতরীকৃত হইত; তাহার আত্মায় অপবিত্রতা স্পর্শিত। * কোনও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ, র'থো সাহিত্য (Street literature) হয় না; হওয়া উচিত নয়। উৎকৃষ্ট গান গাড়োয়ানের মুখে মারা পড়িয়াই থাকে। পক্ষান্তরে, গাড়োয়ানী গীত গাড়োয়ানে রচিলেই তাহার অধিক ... হয়; হওয়া স্বাভাবিক, হইয়াও থাকে তাই। অপিচ, গর্দ্দভ-সমাজে যদি গ্রন্থ প্রের... আবশ্যক হয়, তবে রজক-গৃহই বোধ হয় তাহার রচনা কার্য্যের পরিপাটী স্থান। অন্যথা, মনুষ্যকেই মুহূর্ত্তের জন্য সেই গরীয়ান আসন গ্রহণ করিয়া গ্রন্থ লিখিতে হয়। নহিলে সে সুবিজ্ঞ "পাবলিকে" পাঠ্য বিষয়ের পশার সম্ভবে না। ফলতঃ উপযোগিতা অনুসারেই দ্রব্যের আদর হয়। যাহা সাধারণ রুচি প্রবৃত্তির পরিপোষক নয়, তাহা যতই উৎকৃষ্ট, উপাদেয় বা উন্নত হউক না, সাধারণ্যে আদৃত হইতে পারে না। আবশ্যকতা তাহার প্রভূত পরিমাণেই থাকে; কিন্তু আদৃত হয় না।

অতএব এই অপরিজ্ঞাত কবি, আমাদের মধ্যে যদি অপরিজ্ঞাতই থাকেন, আমরা তদীয় কাব্যের আদর, আহ্বান ও অনুসন্ধান না করিয়া, গর্দ্দভেশ চন্দ্রদিগের গাড়োয়ানী গ্রন্থ গাদা গাদা সংগ্রহ করি,—সে দোষ আমাদের নহে। স্বভাব, শিক্ষা ও সাহিত্য-সমাজের অবস্থা, তাহার জন্য দায়ী।

কিন্তু, এই অপরিজ্ঞাত কবি কে? অভিজ্ঞের পক্ষে ইঙ্গিতই যথেষ্ট। সৌভাগ্যের বিষয়, বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্মশানে, শতকরা অন্ততঃ একজন করিয়া লোকও এখনও থাকা অসম্ভব নহে, যাঁহারা অনুশীলনে ও উদারতায় অবস্থাজ্ঞ। অবস্থাজ্ঞ ইঙ্গিতেই বুঝিয়াছেন, এই কবি কে? কিন্তু, সকলে বুঝিবেন না। বিশেষতঃ গৌড়ীয় সাহিত্যের উপস্থিত অতিসার অবস্থার অধ্যাপক ও ছাত্রেরা যদি ঘটনাক্রমে এই প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাঁহাদের সাহায্যার্থে সবিস্তারে আমার বলা কর্ত্তব্য, এই কবি কে? কিন্তু

---

* উচ্চ শ্রেণীর কবিদিগকে ইতরের হাতে ইতরীকৃত হওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বিশেষতঃ যে সকল কবি আত্ম প্রকাশে অকাতর এবং যাঁহাদের অভিনব সুর ও ছন্দের কবিতা, তাঁহাদিগকে প্রায়ই উপহাসের বিষয়ীভূত হইতে দেখা যায়। মেঘনাদ বধ কাব্যের কবির দুর্গতি আমরা অনেক দেখিয়াছি। তাঁহার সুরের ছন্দের ইতরীকরণ অদ্যাপিও একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। রবীন্দ্র বাবুর কবিতা তাঁহার শত্রু মিত্র উভয় শ্রেণীর লোকেই ইতরীকৃত করিয়া থাকে। অনুকারীদের হস্তে ইনি অধিক পরিমাণে ইতরীকৃত। উপরে যে কবির কথা বলা হইতেছে, তাঁহার কোনও কাব্যের দুই চারিটি শ্লোক কোনও বিষয়ী ব্যক্তি পাঠ করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন;—তাহা আদৌ বলিবার নয়। কবি-হৃদয়ের বিমলানন্দের অস্তিত্ব যে থাকিতেই পারে, এমন ধারণাই কত লোকের নাই। তাহারা সে কথা শুনিয়া উপহাস করে, গালাগালি দেয়।

...উক করি, কেহ খুব একটা প্রকাণ্ডতার কল্পনা করিবেন না। এই কবি, যেমন বিখ্যাত নহেন, তেমনি বৃহতও নহেন, আমি অগ্রেই বলিয়াছি। খ্যাতি, প্রতিপত্তি এবং বৃহত্ব, ইনি বুঝিতেনও না তেমন। এই শব্দ কয়টা তাঁহার অভিধানে একেবারে ছিল না বলিয়াই আমার আশঙ্কা হয়। এই কবি, কলিকাতা রাজধানীর সঙ্কীর্ণ অবস্থাপন্ন কোনও গৃহস্থ সন্তান। কিন্তু, রাজধানীর রাজা, রাজার রাজা অপেক্ষাও অতুল ঐশ্বর্য্যশালী। সে অলিক বা অমূলক ঐশ্বর্য্য নহে, অধিকারসম্বন্ধে তিনি তাহা অতি মাত্র উপভোগ করিতেন। এবং সে উপভোগ রাজৈশ্বর্য্যের আরাম অপেক্ষা অধিকতর সুখ প্রদ, তাহা শান্তি রাজ্যের সৌন্দর্য্যোপভোগ। সৌন্দর্য্যের সংখ্যাতীত মূর্ত্তি। সে মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া এই সংকীর্ণ অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণ শান্তি-সম্পদে, আপনাকে "ব্রহ্মাণ্ডের পতি" বিবেচনা করিতেন। নিঃস্বার্থ সৌন্দর্য্যানুভব আনন্দ, হায়! এমনই বটে! এখনকার কোনও গৃহী লোক ধন মানের মায়া কাটাইয়া কোনও একটী মানসিক আনন্দে একেবারে ডুবিয়া যাইতে পারে, চিরজীবন তাহাতে ডুবিয়া থাকিতে পারে, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন বটে। বিশ্বাস ত বিশ্বাস; ইহা এখন বিদ্রূপই আকর্ষণ করে। কথাটা শুনিলে আমরা হাসিয়াই খুন হই। তা হউক। এই ব্যক্তি বস্তুতই সৌন্দর্য্য-সাগরে একেবারে ডুবিয়া গিয়াছিলেন:—তিনি আত্মহারা হইয়া তাহার উপাসনা করিতেন, তাহাকে উপভোগ করিতেন, তাহার সহিত যেন মিলিত হইয়া যাইতেন।

"তুমি তুলা দূরে রাখি,
তোমা হয়ে বসে থাকি,
নয়ন পরশি তোরে দেখি অনিবার।
তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী,
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি
হোক্ গে এ বসুমতী যার খুসি তার।"

সৌন্দর্য্যের শান্তি সম্ভোগে ইহার এই প্রকারের উক্তি। এরূপ উক্তি আরও অনেক আছে এবং আমি যতদূর শুনিয়াছি, তাহাতে এই ব্যক্তির জীবন কার্য্য, সেই সকল উক্তির সম্পূর্ণ অনুরূপ। অথচ ইনি খুব সেকালের লোক নহেন। খুব সেকালেরও নহেন, খুব একালেরও নহেন, মধ্য সময়ের, বরং নাতি মধ্য সময়ের লোক। এই সম্ভ্রম-সমালোচনা-সম্পদ পিপাসাতুর সময়েরই লোক। ধর্ম্মযোগী বা কর্ম্মযোগীও নহেন। কাব্য-কবিতার উপাসক লোক, অপরিজ্ঞাত কবি। ইঁহার নাম ছিল বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী। নেহাত অজ্ঞাত নাম নয় কি?

বিহারিলাল চক্রবর্ত্তীকে আমি স্বচক্ষে কখনও দেখি নাই।* তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমার কখনও পরিচয় ছিল না। তৎকৃত কবিতা কখনও কখনও পাঠ করিয়া এবং তদীয় শান্তি সেবিত জীবনের ও সৌন্দর্য্য-ধ্যান নিমগ্নতার কোন কোনও কথা কচিৎ শুনিয়া, আমি তাঁহাকে মানস চক্ষে যেরূপ দেখিতে পাইতাম, উপরে

* স্বচক্ষে দেখার সুযোগ বহুকালাবধি ছিল না; তাহার পরে হইয়াছিল। কিন্তু, কখনও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়ার অভিলাষ হয় নাই। অথচ সাহিত্য-চর্চ্চায়, কেবল সাধারণভাবে নহে, সবিশেষ ভাবে তাঁহার নিকট হইতে আমি উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। যে অনুগ্রহ তিনি অনেককে করেন নাই, অপরিচিত সত্ত্বেও তাহা এই লেখককে করিয়াছিলেন। কিন্তু, তথাচ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করার অবসর হয় নাই। আমাদের কবিতানুরাগ ও হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা এমনি অপ্রত্যয়ের পদার্থ!!

তাঁহার তদনুরূপ একটী প্রতিরূপ অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। হইতে পারে, উহা প্রকৃত প্রতিরূপ নহে; হইতে পারে, উহা অতিরঞ্জিত বা অপূর্ণ। তাহা হইবারই সমূহ সম্ভাবনা। আমি নিজের চক্ষে যেমন দেখিতাম, তাহাই বলিয়াছি। কিন্তু পাঠককে পরের চক্ষে দেখার অনুরোধ করি না। সহৃদয়ের হৃদয়ে এই কবিকে কিঞ্চিন্মাত্রায় প্রতিভাত করিবার জন্য, তদীয় কবিতা এক্ষেত্রে, অল্পাধিক পরিমাণে আলোচিত হওয়া আবশ্যক। উপরে এ আলোচনা যতটুকু করিয়াছি এবং যেরূপ ভাবে করিয়াছি, তাহা পর্য্যাপ্ত নহে।

বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী প্রকৃতির অতি কোমল অংশের উপাসক। সে অংশ বিশাল স্বভাবের সুকুমার সৌন্দর্য্য। চক্রবর্ত্তী মহাশয় সেই সৌন্দর্য্যের কবি। খাঁটী, অবিমিশ্র, নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্য্য অথবা সেই সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে, ইঁহার ধ্যান ধারণা ও উপাসনার বিষয়ীভূত; এবং সেই উপাসনা অর্চ্চনা হইতেই ইঁহার সঙ্গীত উদ্ভূত। সৌন্দর্য্য বা সুকুমার কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে এদেশীয়েরা বলেন, সরস্বতী, ইয়ুরোপীয়েরা বলেন "Muse"। গ্রীসে ইঁহার অপর এক নাম ছিল "Grace"। সৌন্দর্য্যের সারভূতা এই মহাদেবী, দেশীয়, বিদেশীয় সকল কবি কর্তৃকই সেবিতা;—আমাদের এ কবিও অবশ্য ইঁহারই সেবক। কিন্তু এই সৌন্দর্য্যেশ্বরীকে সাধারণতঃ অন্যান্য কবি যেরূপভাবে দেখিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা কিছু স্বতন্ত্র ভাবে, এই কবি তাঁহার সত্তানুভব করিতেন। সে অনুভূতি কিছু অসাধারণ এবং অভিনব। পরন্তু সেই অনুভূতিই এই কবির একমাত্র "আইডিয়া",—তাঁহার যাবতীয় কাব্যের যথাসর্ব্বস্ব। সেই অনুভূতির আকুঞ্চন, প্রসারণ হইতে উৎপন্ন বিবিধ সৌন্দর্য্য-বৈচিত্র্য, তাহাদেরই সমাবেশ এবং অতি মহৎ চিত্র এই কবির কাব্যে। একদিকে সৌন্দর্য্য সাধারণতঃ এই কবি কর্তৃক গীত, পক্ষান্তরে, পার্থিব সৌন্দর্য্যের জীবন্ত প্রতিকৃতি,—রমণী জাতির মাহাত্ম্য-মাধুরী ইঁহার সঙ্গীতে প্রতিভাত। দ্বিতীয়, প্রথমেরই রূপান্তর। কিন্তু, এরূপভাবে, একাধারে লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং জগদ্ধাত্রী রূপিণী রমণীকে, জগতের অতি অল্প কবিই অর্চ্চনা করিয়াছেন। বিশেষতঃ বঙ্গীয় কবিদিগের মধ্যে একজন ব্যতীত অপর কেহ নারীজাতি সম্বন্ধে, ইঁহার ন্যায়, উচ্চ আদর্শ কখনও অনুভব ও অভিব্যক্ত করেন নাই; অন্ততঃ আমার এইরূপ ধারণা।

এখন মোটের উপর কথা এই যে, প্রথমতঃ সৌন্দর্য্য এবং দ্বিতীয়তঃ পার্থিব সৌন্দর্য্যের সারভূতা রমণীজাতি এই কবির কবিতার বা সঙ্গীতের উদ্দীপনা ও উপজীব্য। অতএব তাঁহার কবিত্বানুভব কল্পে কেবল এই দুই বিষয় অনুধাবনীয়। কিন্তু বড়ই বিস্তৃত এই বিষয় দুইটী।

বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী নিছক সৌন্দর্য্যের কবি। তাঁহার কবিতা ও কবিত্ব কি প্রকারের, বুঝাইতে হইলে, সৌন্দর্য্য পদার্থের স্বরূপ কি, বুঝাইতে হয়। কিন্তু তাহা সহজ নহে। তাহা সহজ ত নহেই, তাহা, আদৌ সাধ্য কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ইহা মনো-বিজ্ঞানের একটী মহা জটিল তত্ত্ব। সাংখ্য পতঞ্জলী বা প্লেটো পিথাগোরাস হইতে এ কাল পর্য্যন্ত কোনও মনস্বী এ তত্ত্বের সম্যক মীমাংসা করিতে পারিয়াছেন কিনা,

সে বিষয়ে পণ্ডিতেরা নিজেই সংশয়ী।* অধ্যাত্মবাদী (idealist) দার্শনিকদিগের মতে সৌন্দর্য্যের আদৌ কোনও বহিঃসত্বা নাই; তাহা সম্পূর্ণরূপে অন্তরের বস্তু। মনুষ্যের মনে সৌন্দর্য্যানুভব শক্তি না থাকিলে বাহিরের কোন বস্তুতেই তাহা অনুভূত হইত না। সৌন্দর্য্য-মাধুরী মনেরই সৃষ্টি মাত্র; কুৎসিৎ কদাকারও তাহারই সৃষ্টি। সে সৃষ্টি স্বতঃনাংত ও অনুশীলন-মার্জ্জিত মানসিক শক্তিসম্ভূত। বস্তুগত দ্রব্য স্বরূপের কোনও স্বাধীন সত্বা নাই; কেন না, মনের অনুভব শক্তি ব্যতীত তাহা অনুভূত হইবার উপায়াভাব। অগ্নির উত্তাপ বা শর্করের মিষ্টত্ব তোমার অনুভূতি ও স্বাদগ্রহণ শক্তির পরিচায়ক অথবা উক্ত দুই দ্রব্যের বস্তুগত উত্তাপ ও মিষ্টত্ব স্বরূপ বিদ্যমান আছে: দার্শনিক বলেন, অগ্নি নিজের উত্তাপ যখন নিজে অনুভব করে না; এবং শর্কর যখন নিজের মিষ্টত্ব স্বাদ নিজে গ্রহণ করিতে অসমর্থ; তখন বস্তুগত ঐ সকল গুণ উহাদেরই, ইহা বলিতে পারি না। পরন্তু, উহাদের স্বরূপ যখন তোমা কর্ত্তৃক অনুভূত হইতেছে, দেখিতেছি, তখন ঐ স্বরূপ তোমারই মানসিক শক্তিসম্ভূত অবশ্যই বলি। † অনুভূতি উত্তেজনার্থে বহিঃপদার্থ কেবল উপলক্ষ মাত্র; আর কিছুই নহে। মানুষের যদি মিষ্ট রসাস্বাদশক্তি না থাকিত, তবে শর্করের শর্করত্ব সম্ভাবিত না। বহিঃদ্রব্যের স্বরূপ মাত্রেই এই কথা। সৌন্দর্য্য সম্বন্ধেও কথা এই। তোমার যদি সৌন্দর্য্যানুভব ক্ষমতা না থাকে, তবে নিশ্চয়ই কোনও দ্রব্য সুন্দর হইতে পারে না। সৌন্দর্য্য কুসুমেও নহে, কামিনীর কোমল কটাক্ষেও নহে, উহা তোমার মনে।

ইয়ুরোপীয় আইডিয়ালিজিম বা অধ্যাত্মবাদের অভিমত এইরূপ। এদেশীয় দার্শনিক মতও এতদনুরূপ। জড়বাদের মত ইহার বিপরীত। কিন্তু জড়বাদের কঠোর আক্রমণে এবং বহুকালের তর্ক যুদ্ধেও আইডিয়ালিজিমের উপরোক্ত অভিমত অদ্যাবধি খণ্ডিত হয় নাই। ইয়ুরোপে বার্কেলে এই মতের অধিনায়ক। এ সম্বন্ধে তাঁহার যুক্তি তর্ক একরূপ অখণ্ডনীয়। জড়বাদী হিউম/বলেন, দ্রব্য স্বরূপের স্বাধীন সত্তাভাব সম্বন্ধে বার্কেলের যুক্তি তর্ক (admits of no answer) খণ্ডন করিয়া কোনও উত্তর দেওয়া যায় না। পরন্তু, আলেকজেণ্ডার বেইন বলেন;—"All the ingenuity of a century and a half has failed to see a way out of the contradiction exposed by Berkeley.' ইহার তাৎপর্য্য হিউমের উক্তিরই অনুরূপ। ফলতঃ আইডিয়ালিজিম এতাবৎকালাবধি অখণ্ডনীয়। তথাচ ইহাই যে পূর্ণ সত্য, এমনও বলা যায় না। কোনও ইয়ুরোপীয় লেখক বলেন, "Idealism is but the moiety of a more comprehensive truth."

* "The science of aesthetics—the causes or conditions of beauty and sublimity seems to be still unsettled. Plato and Leibnitz, Hutcheson and Hogarth, Burke and Reynolds, Diderot and Alison have attacked the subject theorising and refuting, composing and criticising and they have done well, for any man who has anything to offer on such an issue is bound to put it forth and let it go for what it is worth."
—The Science of Beauty By A. W. Holmes-Forbes.

† Applied to beauty the idealism would show that beautiful qualities are mental creations; that they have no more existence in the objects themselves than heat in the fire or sweetness in sugar."
The Science of beauty.

অতএব দেখা যাইতেছে যে, সৌন্দর্য্যের অস্তিত্ব সর্ব্ববাদীসম্মত হইলেও, তাহার অবস্থিতি স্থানের থিয়োরী সম্বন্ধে প্রথমেই মহা বিতণ্ডা। পরন্তু, সৌন্দর্য্যের উপাদান কি, তাহা কি কি উপকরণে গঠিত, তাহার প্রকৃত স্বরূপ ও স্বভাব কি প্রকার, এক কথায় প্রকৃত প্রস্তাবে সুন্দর কি অথবা সৌন্দর্য্য কেমন পদার্থ,—এবিষয়েও দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক গণ্ডগোল আরও বেশী। দ্রব্যের উপকারিতা ও উপযোগিতায় সৌন্দর্য্য, তাহার পূর্ণতায় অথবা উচ্চতায় কিম্বা এক মাত্র মনোহারিতার উপরেই মাধুরী নির্ভর করে? তাহা বর্ণে, রূপ, রস গন্ধে অথবা ভাব-বৈচিত্র্যে? এই সকল প্রশ্নের ভিন্ন ভিন্ন উত্তর আছে এবং তাহাদের মধ্যে সত্যাসত্য উভয়ই অল্পাধিক পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু, সৌন্দর্য্য তত্ত্ব বিশ্লেষণের স্থান ইহা নহে। এবং তদ্দ্বারা উপস্থিতক্ষেত্রে ফলও যে কিছু হইবে, তাহাও নহে। সৌন্দর্য্যকে তাহার উপাদান, আধার ও আধেয়কে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া তাহার শিরা ধমনী নাড়ী নক্ষত্র নখ দর্পণে রাখিলেও হয় ত বুঝা যাইবে না, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে পদার্থটী কি? পরন্তু, তাহা যদি বুঝাও যায়, তথাচ শক্তির বিরহে তাহা সম্যক অনুভব করিয়া আরাম অনুভব করিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। সৌন্দর্য্য গত না বুঝিবার বস্তু, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে অনুভব ও উপভোগের বস্তু। তাহা বরং বুঝান যায়, কিন্তু অনুভব করাইয়া দেওয়া যায় না। কবি ও ভাবুক, দর্শনে ও বিজ্ঞানে সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব পাঠ করিয়া কবিও ভাবুক হয়েন না। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যানুভব শক্তি অনুশীলনে উন্নত ও মার্জ্জিত হইয়া কবিকে কবি ও ভাবুককে ভাবুক করে। ফলতঃ সৌন্দর্য্য কি, তাহা বরং বুঝাইয়া দেওয়া যায়, কিন্তু, কেহ কাহাকেও তাহা অনুভব করাইয়া দিতে পারে না। সৌন্দর্য্য বস্তুগত বা হৃদয়গতই হউক, তাহার উপাদান কারণ যাহাই হউক, তাহা আত্ম-শক্তি দ্বারা অনুভবনীয়। সে শক্তির সহায়তা করা যাইতে পারে, সৃষ্ট করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। স্বয়ং কবিগুরু বাল্মীকি আসিয়া অজগর গর্দ্দভের পেটে সে শক্তি পুরিয়া দিতে পারেন না। কালিদাস পণ্ডিত যেমন এক গণ্ডূষে কবিত্ব সাগরটা সটান উদরস্থ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত; এখনকার অনেক কুষ্মাণ্ড চন্দ্রেরা তেমনি কয়ের আঁকুড়ি টানিতে শিখিয়াই কাব্য কবিতার সৌন্দর্য্য সুখানুভব করা সম্ভব মনে করেন; সেটা সম্ভব হয় না; সুতরাং কাব্য কবিতা ও কবিদিগের স্কন্ধে আপনাদের কুষ্মাণ্ডত্বের অপরাধটা আরোপ করিয়াই পুরুষার্থ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তবে এরূপ কুষ্মাণ্ড প্রকৃতির কবিরও বাজারে অভাব নাই। কবিত্বটা তাঁদের অত্যুর্ব্বর হৃদয়-কাননে কলা কচুর মত অনবরতই ফলবান।

সৌন্দর্য্য আদৌ দ্রব্য স্বরূপগত নহে, আমি এমন কথা বলিতে পারি না। তবে স্বাধীন ভাবে দ্রব্যস্বরূপে তাহার সত্ত্বা না থাকিতে পারে। কিন্তু, সৌন্দর্য্য যে একেবারেই শূন্য পদার্থ, এমনও নয়। তাহা পদার্থের স্বরূপগত বটে। কিন্তু, তাহা হইলেও ত সেই স্বরূপগত সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার শক্তি চাই। সৌন্দর্য্য এক দিকে পদার্থের স্বরূপ সাপেক্ষ বটে; কিন্তু তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে উহা অনুভব শক্তির অস্তিত্ব, উপযুক্ততা এবং তীক্ষ্ণতা

সাপেক্ষ। দ্রব্যস্বরূপে হৃদয়ে একটী আঘাত মাত্র করে; সেই আঘাতজনিত হৃদয়ের যে ভাব, অর্থাৎ সৌন্দর্য্যানুভূতি এবং তজ্জনিত সুখানুভব, প্রীতি বিস্ময় প্রশংসাদি (admiration and appreciation of beauty) তাহা হৃদয়েরই ক্রিয়া। তাহা অর্থাৎ সেই ভাব উৎপাদনার্থে বুদ্ধি-শক্তি ও হৃদয় বৃত্তি পরিচালনার আবশ্যক। সে পরিচালনায় যে যে পরিমাণে সমর্থ, ঠিক সেই পরিমাণে সে সৌন্দর্য্যানুভবক্ষম এবং সেই অনুভূতির অনির্ব্বচনীয় আনন্দের অধিকারী। অতএব সাধারণতঃ বুদ্ধি শক্তির মার্জ্জিত বা অমার্জ্জিত ভাব এবং হৃদয় বৃত্তির অনুশীলন বা তদ্বিরহ ভেদে সৌন্দর্য্যানুভূতি ও তজ্জনিত আনন্দের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। * ইহা সহজ কথা, তথাচ আরও বিস্তার ভাবে এ কথাটী বুঝাইতে পারিলে ভাল হইত, কারণ বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার সবিশেষ আবশ্যকতা আছে বলিয়া বিবেচনা করি;—কিন্তু, এক্ষেত্রে তাহার স্থান হইবে না।

সাধারণতঃ সৌন্দর্য্যানুভব সম্বন্ধেই যখন এই, তখন কাব্য-সৌন্দর্য্যানুভব কল্পে কি পরিমাণে অনুশীলন (Culture) আবশ্যক, তাহা কেবল অনুভবনীয়। ইতর লোকে যে উচ্চতর কাব্যের রসাস্বাদনে সমর্থ হয় না; তাহার প্রধান কারণ, ইতরের অনুশীলনাভাব; তাহা উচ্চতর কাব্যের অপরাধ নহে। পরন্তু, সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে, তথা কাব্য-রসের বিষয় সম্বন্ধে বিকৃত সংস্কার যে সমাজে প্রচলিত আছে, তাহাও ইতরের এই ইতরতা ও অনুশীলনের অভাব জনিত, ইহাও এ স্থলে বক্তব্য।

কবিতা ও কাব্য-রসের অর্থাৎ তদন্তর্গত সৌন্দর্য্যের অবশ্য নানা লক্ষণ আছে। সকল লক্ষণই যে বিষয়ের স্বরূপ ব্যঞ্জক, তাহা নহে। এমন কি, প্রায় এমন একটী লক্ষণও কচিৎ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যাহা সম্যক্‌রূপে কবিতার বা কাব্য-রসের সম্যক্‌ স্বরূপ ব্যঞ্জক। কবি সম্প্রদায়ের নিজের এবং আলঙ্কারিকদিগের লক্ষণ ছাড়িয়া দিয়া, কবিতার বৈজ্ঞানিককৃত লক্ষণ কি, বারেক দেখা যাউক। বৈজ্ঞানিক বলেন;—

"Poetry consists in the liberation of beautiful analogies. * * It is the people's part to experience beautiful analogies, it is the poet's province to liberate those analogies, and it is the people's again to appreciate them." বৈজ্ঞানিকের এই লক্ষণ, অগ্রেই বলা আবশ্যক, বিলক্ষণ অসম্পূর্ণ;—কিন্তু তাই বলিয়া একান্ত অর্থশূন্য নহে। আলঙ্কারিক যাহা বহু কথায় বুঝাইয়াছেন, বৈজ্ঞানিক তাহা এক কথায় সারিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, সৌন্দর্য্য-বৈচিত্র্যের সৌসাদৃশ্য সৃষ্টিই কবিতা। এক কথায়, সুন্দর উপমার অভিব্যক্তিতেই, বৈজ্ঞানিকের মতে কবিতা। কথাটা শুনিতে খুব উদ্ভট বটে, কিন্তু, বিজ্ঞানবিদ্‌ বিশ্লেষণ দ্বারা এ কথা প্রমাণ করিতে অগ্রসর। বৈজ্ঞানিক পুনশ্চ বলেন যে, জন সাধারণে সুন্দর সৌসাদৃশ্য বা উপমেয় উপমানের বস্তুগত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, কবি সেই সৌসাদৃশ্য-

* "The appreciation of beauty * * * requires intelligence and if upon examination, it be found that some sentient creatures do not exhibit that appreciation, we may conclude that they want the requisite amount of intelligence or are possessed of a lower order of mind than those who do exhibit such an appreciation; and further, if we find that some persons exhibit that appreciation in a lower or less perfect manner we may conclude that their intellect has been inciously or imperfectly developed."—*The Science of Beauty.*

দিগকে স্বাধীন জীবন দেন, পুনঃ জনসাধারণ তাহা উপভোগ করিয়া আনন্দ অনুভব করে।

এখন বৈজ্ঞানিক দিক হইতে দেখা যাইতেছে,—সুন্দর সৌসাদৃশ্য নিচয়কে স্বাধীনতা দান (অথবা সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি?) কবির কার্য্য। তিনি ভাব-বৈচিত্র্য দেখাইবেন,—কিন্তু, পাঠকের মনে যদি ভাবেরই একান্ত অভাব হয়, "এনালজির এক্সপিরিয়েন্স" যদি একেবারেই না থাকে, তবে কবি বেচারী তাহা কিছু আর উৎপন্ন করিয়া দিতে পারেন না।

বিষয়টী একদিকে যেমন সহজ ও স্বাভাবিক, অপরদিকে তেমনি কঠিন ও জটিল। সৌন্দর্য্য পদার্থ কি এবং তাহা অনুভব করার প্রক্রিয়া কিরূপ, বুঝাইয়া দেওয়া বড়ই দুষ্কর। অথচ সৌন্দর্য্যানুভূত হইয়া আনন্দ উপভোগ হওয়ার মত সহজ ও স্বাভাবিক আর কিছুই নাই। "আনন্দ" পদার্থটী কি, অশেষ চেষ্টা করিয়াও যেমন কেহ কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে পারে না, সৌন্দর্য্যের সত্তা কি, বুঝান প্রায় তদনুরূপ কঠিন। পরন্তু, সৌন্দর্য্য উপভোগ কল্পে উহার ফলও কিছু নাই, অগ্রেই বলিয়াছি। আনন্দ উপভোগ করার ক্ষম তাই যদি আমার না থাকে, তুমি কি আমায় বুঝাইয়া দিতে পার, আনন্দ সামগ্রী খানা কি? তাহা পাতিয়া শুইতে বা গায়ে প্রলেপ দিতে হয়? সৌন্দর্য্য সম্বন্ধেও প্রায় এই কথা। পরন্তু, বৈজ্ঞানিক-শীলে ছেঁচিয়া গুঁড়া গুঁড়া করিলেও সুন্দরের টিকা সম্ভবে না। সৌন্দর্য্য যদি আদৌ উপভোগ্য হয়, তাহা অখণ্ডভাবেই উপভোগ্য, কাটিয়া চিরিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া নহে।

আমাদের আলোচ্য কবির সৌন্দর্য্যময়ী এবং সৌন্দর্য্যের কবিতা। কিন্তু সৌন্দর্য্য কি পদার্থ, আমি তাহা বুঝাইতে অক্ষম। পরন্তু, তদীয় কবিতার সৌন্দর্য্য বিশ্লেষ করিয়াও আমি তাহার ব্যাখ্যা করিব না; সেরূপ ব্যাখ্যা এস্থলে নিশ্চয়ই ব্যর্থ হইবে। এই কবি কিরূপভাবে সৌন্দর্য্যানুভব করিয়াছিলেন এবং সৌন্দর্য্যেশ্বরী সারদাকে অবলোকন করিতেন, তাহারই কিঞ্চিন্মাত্র আভাস তাঁহার কবিতা হইতে দেওয়া যাইবে। সৌন্দর্য্য পদার্থ কি, পুনঃ বলিতেছি, আমরা বুঝাইতে অক্ষম। কবি নিজেও বুঝ বুঝার পর তবে তাহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হন নাই। তিনি বলেন—

"বুঝিতে পারি না, শুধু আঁখি ভরি' দেখি তায়"

প্রাজ্ঞ গণনাপর বটেন। সকল বিষয়েই তিনি পূর্ব্বাপর নিরূপণ ও "কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ" করিয়া কার্য্য করিতে চাহেন। কিন্তু পড়িয়া পড়িয়া, ঘসা মাজা করিয়া বোধ হয় রূপ লাবণ্য দেখা চলে না, প্রণয় পীরিতি করাও সম্ভবে না। প্রাজ্ঞ যাহাই করুন, প্রেমিকের রীতি স্বতন্ত্র।

অগ্রেই উল্লেখ করিয়াছি, ধ্যানই এই কবির কবিত্বের প্রাণ, পরমাত্মা। কিন্তু, সে ধ্যান, প্রকৃত প্রস্তাবে, কাহার উদ্দেশে,—সে ধ্যান কি প্রকারের এবং কিসের জন্য? ইহ-সংসার হইতে পরিত্রাণার্থে, পারলৌকিক নির্ব্বাণ মুক্তি কামনাতেই কি কবি ধ্যাননিমগ্ন? না, তাহা নহে। তবে কি? কি, তাহা, কবি নিজেও বলিতে অক্ষম। কেন না, তাহার কারণ নির্ণয় কল্পে তিনি কখনও উদ্যোগ করেন নাই,—তাহার অবসর পান নাই; সে কথা, তাঁহার মনেই কখনও উদয় হয় নাই। কাজেই বলেন—

"ধেয়াই কাহারে দেবি! নিজে আমি জানিনে"

ইহা ভিন্ন আর কি বলিবেন? আর কিছুই ঠিক বলিবার নাই। কবি ধ্যান-নিমগ্ন। কাহার ধ্যান করেন, ঠিক জানেন না। কিন্তু, ধ্যান নিমগ্ন তাঁহাকে রাখে কিসে? কবি আত্ম প্রকাশে কাতর নহেন। সরলভাবে আপাদ মস্তক আত্ম প্রকাশেই তাঁহার কবিতা। কবি এ প্রশ্নের উত্তর দেন;—

মধুর মাধুরী বালা,
কি উদার করে খেলা!—
অতি অপরূপ রূপ!

কবি এইরূপে মোহিত; ধ্যান-মগ্ন! একপ 'কেবল হৃদয়ে দেখেন' সম্যকরূপে 'দেখাইতে পারেন না।' সে "রূপ" জগতে অতি জগতে ব্যাপ্ত—বিস্তৃত।

কহে সে রূপের কথা
বসন্তের তরুলতা;
সমীরণ সেকে সঙ্গে নির্জ্জন কানন ফুল;
শুনে, সুখে তটিনীর আঁখি করে ঢুল ঢুল।
হাসি হাসি ইন্দ্রধনু নীল গগনে তার,
জাবদ নীরদ গণে কি কথা বলিতে চায়।
স্বপনে কি দ্যাখে শিশু নিমীলিত নয়নে,
ঘুমা'য়ে ঘুমা'য়ে হাসে, জানি না কি কারণে।
ভোরে শুকতারা রাণী
কি যেন দেখায় আনি,
বুঝিতে পারি না, শুধু আঁখি ভরি' দেখি তা'য়।

সুসুপ্ত শিশু কি স্বপ্ন দেখে, কি স্বপ্ন দেখিয়া ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া হাসে, কেহ জানেন কি? জানিবার কিছু উপায় আছে কি? যদি না থাকে, তবে এই কবির স্বপ্ন কি, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা জানা অসম্ভব। স্বভাবের সরল শিশু সৌন্দর্য্য মগ্ন, স্বপ্ন সেবিত সুপ্তবৎ হাসেন, কাঁদেন। চেতনার অচেতনে, স্মৃতি বিস্মৃতিতে, ইহলোক পরলোকে, যেন এক সঙ্গম সূত্রে সংমিশ্রিত হইতেছে; স্মৃতি, সুপ্ত, সজাগ, যেন কেমন ছায়ালোকের মধ্যে ক্রীড়া করিতেছে, সব কথা স্মরণ হয় না, অথচ বিস্মৃতিও নহে; আত্মার এই অনির্ব্বচনীয় অবস্থায় কবি বলিতেছেন—

প্রাণের ভিতরে থেকে কে যেন আমারে ডাকে,
ভুলিবার নয়, তবু ভুলে যেন গেছি কাকে।

সৌন্দর্য্য মাধুরীর যত মূর্ত্তি এই কবি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা কোথায়ও একটী নির্দ্দিষ্ট সূত্র বদ্ধ নহে। যখন যে মূর্ত্তি হৃদয়ে উদিত হইয়াছে, ঠিক তাহাই চিত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মুন্সিআনার মাপে সৌন্দর্য্যটাকে সার্ভে করিয়া, তিনি তাহার ছবি তুলেন নাই। সুতরাং পদার্থের প্রকৃতি অনুসারে পরে পরে তাহা সাজান নহে। এই দেখিলাম,—

চলেছে যুবতী সতী
আলো কোরে' বসুমতী,
স্নানান্তে প্রসন্ন মুখী, বিগলিত কেশপাশ,
প্রাণপতি দরশনে
আনন্দ ধরে না মনে,
বিকচ আননে কিবে সুমৃদুল মধুর হাস।

ইহার পর পর্য্যায়েই সৌন্দর্য্যের এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মূর্ত্তি;—

উদার অনন্ত নীল হে ধাবন্ত অম্বুরাশি
আনন্দে উন্মত্ত হ'য়ে কোথায় যেতেছ ভাই!
বল, কা'রে দেখিয়াছ? কোথা গেলে দেখা পাই।

তুমি, সৌন্দর্য্যের এই মহান বিশাল মূর্ত্তি ভাল করিয়া অনুধাবন করিতে না করিতেই, তাহার অপর মহিয়সী মাধুরী তোমার সম্মুখে প্রতিভাত! কবি সহসা সৌন্দর্য্যেশ্বরীকে উপস্থিত করিলেন,—

অয়ি! বিশ্ব-প্রকাশী
উদার সৌন্দর্য্য রাশি
জলে স্থলে আকাশে সদাই বিরাজিত;
যে দিকে ফিরিয়া চাই
সৌন্দর্য্য ভরিয়া যাই,
অন্তরালবাসী, অয়ি
পরম আনন্দময়ী!—
কে তুমি, মা! কান্তিরূপে সর্ব্বভূতে বিভাবিত?

ইহা উন্নত, মহৎ, সুব্লাইম, কিন্তু, ইহার অব্যবহিত পরেই আবার ললিত, মধুর, মনোমোহিনী মূর্ত্তি—

সৌন্দর্য্য-সাগর মাঝে
কে গো এ সুন্দরী রাজে
আকাশের নীল জলে প্রফুল্ল নলিনী!

পরে পরে সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্যের এই রূপ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মূর্ত্তি। অপর্য্যায়ে কখনও কোমল, কখনও করুণ, কখনও ললিত মধুর, কখনও বিরাট, বিস্ময়কর, সুব্লাইম সৌন্দর্য্য! ইহা যেন মনুষ্য মনের সচরাচর পরিলক্ষিত ভাব যোগের (association of ideas) অতীত এক অভিনব নিয়মে উদ্ভূত। কবি মধুর হইতে পুনঃ মহানে উপস্থিত। সৌন্দর্য্য-দেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন;—

কে তুমি জননী, পিতা
নন্দিনী, রমণী মিতা,
প্রেম-ভক্তি-স্নেহ-রস-উদার-উচ্ছ্বাস?
কে তুমি মা জল স্থল,
মহান্ অনিলানল,
নক্ষত্র খচিত নীল অনন্ত আকাশ?
কে তুমি? কে তুমি এই বিরাট বিকাশ?

* * *

নিতি নিতি তরুলতা
নধর নূতন পাতা,
কেমন প্রফুল্ল আহা কুসুম সুন্দর!
ঝরে যায় পরক্ষণ
বাথিয়া নয়ন মন,
আবার তেমনি ফুল ফোটে থরে থর!

* * *

আকাশ, পাতাল, ভূমি
সকলি; কেবল তুমি।
এক করে বরাভয়,—
বিশ্বের নিয়তোদয়;
প্রলয় হয় অন্ধ করতলে।
দশদিকে পায় স্ফূর্ত্তি,
তোমার মহান্ মূর্ত্তি
অনাদি অনন্তকাল লোটে পদতলে!

* * *

প্রত্যক্ষে বিরাজমান
সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠান
তুমি বিশ্বময়ীকান্তি, দীপ্তি অনুপমা;

এই দেবী, সৌন্দর্য্য বিধায়িত্রী,—ইহাঁকে সারদাই বল বা সর্ব্বমঙ্গলা বল, মিউজই বল, আর মহেশ্বরীই বল,—ইনিই এই কবি কর্ত্তৃক অর্চ্চিত, পূজিত, ইহাঁরই মঙ্গল গীতি তিনি গাইয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কাব্য "সারদা-মঙ্গলে" ইহাঁরই মহাগীতি; তাঁহার সব কয়খানি কাব্যেই এই একই 'আইডিয়ার অপূর্ব্ব সম্প্রসারণ।

কবির শেষ এবং অসম্পূর্ণ খণ্ড কাব্য "সাধের আসন' হইতে উপরের সমস্ত কবিতাগুলি উদ্ধৃত। "সাধের আসনের" সর্ব্বপ্রথম অধ্যায় হইতে আমরা যাহার আভাস দেখাইয়াছি, "সারদামঙ্গলে" তাহারই বিবিধ বিকাশ;—"সারদামঙ্গল" এক অপূর্ব্ব কাব্য। অপূর্ব্বত্বের কারণ উপরেই উল্লেখ করিয়াছি। সৌন্দর্য্যের অসাধারণ তীক্ষ্ণানুভূতি, তাহার সূত্রহীন সুধা-সিঞ্চিনী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চিত্র; পরন্তু, সারদাকে এক অভিনব ভাবে অর্চ্চনা, আমরা সারদামঙ্গলে দেখিতে পাই। জীবনের যত কিছু কোমল, করুণ ও মধুর বন্ধন আছে,—তাহার সবই সারদা এই কবির। সারদা কখনও জননী, কখনও নন্দিনী, কখনও প্রণয়িনী,—প্রাণের প্রাণ পরমেশ্বরী! শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, মধুর, প্রায় সকল রসেই এই কবি সৌন্দর্য্যেশ্বরীর সেবা করিয়াছেন। তাঁহার প্রাণের প্রেমোচ্ছ্বাস কোমলতায় পৃথিবীর কোনও প্রধান কবি অপেক্ষা ন্যূন নহে। "সারদামঙ্গল" কতকগুলি খণ্ড কবিতার সমষ্টি। এ কবির সব রচনাই এইরূপ। কিন্তু এখন সারদামঙ্গল হইতে কিছু সৌন্দর্য্য চয়ন করা যাউক।

সারদামঙ্গলের আরম্ভে, চক্রবর্ত্তী মহাশয়, আদি কবি বাল্মীকের পুণ্য তপোবনে করুণ কবিতা সমভিব্যবহারিণী সারদা-দেবীর আবির্ভাব কল্পনা করিয়াছেন। গভীর নিশীথ কাল,—বসুমতী তিমির বসনাবৃতা,—

নাহি চন্দ্র সূর্য তারা,
অনল-হিল্লোল-ধারা
বিচিত্র বিদ্যুদাম-দ্যুতি ঝলমল,
তিমিরে নিমগ্ন ভব,
নীরব নিস্তব্ধ সব
কেবল মরুত রাশি করে কোলাহল।

পরন্তু, বসুন্ধরা ধীরে ধীরে অন্ধকারের অবগুণ্ঠন খসাইতেছেন, উষা আসিয়া তাঁহার অধর প্রান্তে মৃদু চুম্বন করিতেছে। তমঃ অবসানে উষার আবির্ভাব সহিত, তাহার সেই কোমল করুণ কিরণে স্নাত হইয়া সর স্বতী আদি কবির কবিত্ব-সম্পদ হস্তে দেখা দিতেছেন। সারদার শুভাগমনের ইহা অতি প্রশস্ত সময় বটে। পাঠক প্রথমতঃ উষার কোমল-কান্তি উপভোগ করুন,—

হিমাদ্রি শিখর পরে
আচম্বিতে আলো করে
অপরূপ জ্যোতি ওই পুণ্য তপোবনে।
বিকচ নয়ন চেয়ে
হাসিছে দুধের মেয়ে,—
তামসী তরুণ উষা কুমারী রতন।
কিরণে ভুবন ভরা,
হাসিয়ে জাগিল ধরা,
হাসিয়ে জাগিল শূন্যে দিগঙ্গনাগণে
হাসিল অম্বর তলে
পারিজাত দলে দলে
হাসিল মানস সরে কমল কানন।

কবির রচনা-ঐশ্বর্য্য পাঠক অনুধাবন করিবেন। একদিকে উষার কোমল কিরণ; অপরদিকে ক্রৌঞ্চ-বধে ক্রৌঞ্চীর কাতর ক্রন্দন;—তপোবন করুণার স্বচ্ছ দুগ্ধে প্লাবিত! কবিতাদেবী, সর্ব্ব প্রথম, করুণ রসেই, আদি কবির ললাটে উদিতা হইলেন!

সহসা ললাট ভাগে
জ্যোতির্ম্ময়ী কন্যা জাগে,
জাগিল বিজলী যেন নীল নবঘনে।
কিরণে কিরণময়
বিচিত্র আলোকোদয়,
ম্রিয়মান রবিছবি ভুবন উজলে।
চন্দ্র নয় সূর্য্য নয়,
সমুজ্জ্বল শান্তিময়,
ঋষির ললাটে আজি না জানি কি জ্বলে।
*   *   *
কোটি শশী উপহাসি
উথলে লাবণ্য রাশি,
তরল দর্পণে যেন দিগন্ত আবরে।

কবি প্রতিভার আদ্যাশক্তি,—সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের জননী ইনি। আমাদের কবির আত্মত্ব এই দেবী-মন্দিরে বিলুপ্ত। তিনি আর কিছুই চাহেন না, আর কাহাকেও চাহেন না। সংসারীর সর্ব্বশুভদায়িনী লক্ষ্মীকে পর্য্যন্ত তফাৎ হইতে বলেন;—

যাও লক্ষ্মী অলকায়,
যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এস না এ যোগী-জন-তপোবন স্থলে।

কবি লক্ষ্মীকে চাহেন না। সারদা বা সৌন্দর্য্য-দেবীকে বলেন,—

তোমারে হৃদয়ে রাখি
সদানন্দ মনে থাকি,
শ্মশান অমরাবতী দু-ই ভাল লাগে,
গিরিমালা কুঞ্জবন
গৃহনাট নিকেতন,
যখন যেখানে যাই যাও আগে আগে।
জাগরণে জাগ হেসে
ঘুমালে ঘুমাও শেষে
স্বপনে মন্দার মালা পরাইয়া দাও গলে।
*   *   *

থাক হৃদে জেগে থাক
রূপে মন ভরে রাখ
তপোবনে ধ্যানে থাকি এনগর কোলাহলে।

কবি, প্রকৃতই, "এ নগর কোলাহলে" তপোবন-তপস্বীর মত ধ্যান-মগ্ন ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশকে সম্বোধন করিয়া "বন্দে মাতরং" অমর গীত গাইয়াছিলেন। চাই কি, এই একটী মাত্র গীতে স্বদেশীয় সাহিত্যে চিরজীবী হইতে পারিতেন। গে এক "এলিজি"তে ইংরেজী সাহিত্যে অমর। বাঙ্গালীর কোনও ব্যক্তি তাঁহার "যমুনা-লহরী" সঙ্গীতে বিখ্যাত। বঙ্কিমবাবুর "বন্দে মাতরং" ইহাদের সমশ্রেণীস্থ সুমহান সঙ্গীত। "বন্দেমাতরং" এর একটী চরণে গীত হইয়াছিল—

বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।

বঙ্কিমের এই মহা গীতির বহুপূর্ব্বে বিহারিলাল সৌন্দর্য্য জননীকে সম্বোধন করিয়া গাইয়াছিলেন ;—

তুমিই মনের তৃপ্তি
তুমি নয়নের দীপ্তি
তোমা-হারা হ'লে আমি প্রাণ হারা হই ;

* * *

যে ক'দিন আছে প্রাণ
করিব তোমার ধ্যান
আনন্দে ত্যজিব তনু ও রাঙ্গা চরণ তলে।

কভু বিরহ, কভু বিলাস, কভু উপাসনা, কখনও অভিমান, কবি ভাবুক ভক্তের এবং অত্যগ্র অনুরাগী প্রেমিকের যাবতীয় আবেগে উন্মত্ত। হৃদয়বাসিনীর বিলাসে এই তিনি সর্ব্বপৃথিবীর সম্রাট অপেক্ষাও সুখী,—পরক্ষণেই হৃদয়েশ্বরী যেন কোথায় লুকাইলেন, কবির করুণ ক্রন্দনে দারু পাষাণ গলিতেছে! কিন্তু, কাতরতার মধ্যেও তিনি কর্ত্তব্য-পরায়ণ ধীর ;—তিনি "অমরাবতীর বর-মালার" কামনায় মনুষ্যত্বের কর্ত্তব্য বিস্মৃত নহেন ; স্বর্গের মোহে তিনি নরকের জীবের প্রতি উদাসীন নহেন ;—

* * *

যাই যাব রসাতল
চাইনে এ বরমাল, এ অমরাবতী

* * *

নরকে নারকী-দলে
মিশিগে মনের বলে
পরাণ কাতর হ'লে ডাকিব তোমায় ;

* * *

মর যদি মরা চাই মানুষের মত ;
থাকি বা প্রিয়ার বুকে,
যাই বা মরণ-মুখে,
এ আমি, আমিই রব ; দেখুক জগত।
মহান মনেরি তরে
আশা জ্বলে চরাচরে,
পুড়ে মরে ক্ষুদ্রেরাই পতঙ্গের প্রায় ;
জলুক যতই জ্বলে
পর জ্বালা মালা গলে,
নীলকণ্ঠ কণ্ঠে জ্বলে হলাহল দ্যুতি ;
হিমাদ্রিই বক্ষ পরে
সহে বজ্র অকাতরে,
জঙ্গল জ্বলিয়া যায় লতায় পাতায় ;
অস্তাচলে চলে রবি,
কেমন প্রশান্ত ছবি!
তখনো কেমন আহা উদার বিভূতি॥

এ গীতি অসাধারণ। বিশেষতঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের বক্ষপরে এরূপ গীতি মরকত-মালার অপেক্ষাও অধিকতর মূল্যবান।

কোমল, করুণ,মহান, মহিমান্বিত সৌন্দর্য্য-মঙ্গল-সঙ্গীত মন্দাকিনী-প্রবাহবৎ অমৃত-লহরী ছুটাইয়া চলিয়াছে! কখনও মধুর

মোলায়েম মৃদু মলয় নিশ্বাস, কখনও উচ্চ, উচ্চাদপি উচ্চ প্রীতি-বিস্ময়কর সুব্লাইম সংগীতোচ্ছ্বাস! কত উদ্ধৃত করিব, কোন্‌টী ছাড়িয়া কোন্‌টী শুনাইব? কবি হিমালয়ের বিশালত্ব বর্ণনা করিতেছেন;—

রেখ যেন ফেলে পাছে
কি এক দাঁড়ায়ে আছে।
কি এক প্রকাণ্ড কাণ্ড মহান ব্যাপার।

* * *

পদে পৃথ্বী, শিরে ব্যোম,
তুচ্ছ তারা সূর্য্য সোম
নক্ষত্র নখাগ্রে যেন গণিবারে পারে;
সম্মুখে সাগরাম্বরা
ছড়িয়ে রয়েছে ধরা,
কটাক্ষে কখন যেন দেখিছে তাহারে।

* * *

ঝটিকা দুরন্ত মেয়ে
বুকে খেলা করে ধেয়ে
ধরিত্রী গ্রাসিয়া সিন্ধু লোটে পদতলে।
অনন্ত অনল ছবি
ধ্বক ধ্বক জ্বলে রবি,
কিরণ-জ্বলন-জ্বালা মালা শোভে গলে।

* * *

সানু আলিঙ্গিয়ে করে
শূণ্যে যেন বাজি করে
বপ্র-কেলি-কুতুহলে মত্ত করিগণ;
নবীন নীরদমালা
সঙ্গে সঙ্গে করে খেলা,
দশন বিজলী-কলা বিলসে কেমন!

* * *

ফেনিল সলিল রাশি
বেগ ভরে পড়ে খসি
চন্দ্রলোক ভেঙ্গে যেন পড়ে পৃথিবীতে
সুধাংশু প্রবাহ পারা
শত শত ধার ধারা,
ঠিক্‌রে অসংখ্য তারা ছোটে চারিভিতে।

পরন্তু, এক স্থানের এক বিন্দু মোলায়েম ভাব অনুভব করুন;—

মধুর রজনী
মধুর ধরণী
মধুর চন্দ্রমা মধুর সমীর!
ভাগিরথী বুকে
ভাসি ভাসি সুখে
চলে ফুলময়ী তরী ধীর ধীর।
আলু থালু কেশ
আলু থালু বেশ,
ঘুমায় কামিনী রূপসী রুচির।
অপরূপ হাস
আননে বিকাশ
অধর পল্লব অলস অধীর!
না জানি কেমন
দেখিছে স্বপন
মধুর—মধুর—মুরতি মদির।

পুনশ্চ, সৌন্দর্য্য-প্রীতিতে বিভোর হইয়া সৌন্দর্য্য সম্বোধন করিতেন;—

নয়ন-অমৃত রাশি প্রেয়সী আমার।
জীবন-জুড়ান ধন, হৃদি ফুলহার!
মধুর মুরতি তব
ভরিয়ে রয়েছে ভব,
সম্মুখে সে মুখ-শশি জাগে অনিবার!
কি জানি কি ঘুম ঘোরে
কি চোকে দেখেছি তোরে
এ জনমে ভুলিতে রে পারিব না আর!

এ সোহাগ স্বর্গের! পৃথিবীর ময়লা মাটীর নহে। কিন্তু, এই কবি, সৌন্দর্য্য সর্ব্বাঙ্গীন উপভোগ করিয়াও, পরিতৃপ্ত [illegible]। সৌন্দর্য্যের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া যাইতে চাহেন;—

সেই আমি, সেই তুমি
সেই এ স্বরগ ভূমি,
সেই সব কল্প-তরু সেই কুঞ্জবন;
সেই প্রেম, সেই স্নেহ
সেই প্রাণ, সেই দেহ;
কেন মন্দাকিনী-তীরে দুলারে দুলাল?

সেক্ষপীয়র বলেন "সৌন্দর্য্যের বদন সরোজের উপরে

ভগবানের আদেশাবলী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অঙ্কিত।" কবি কিটস্‌ বলেন "সৌন্দর্য্যই সত্য, সত্যই সৌন্দর্য্য, জগতে ইহাই তুমি জান, ইহাই জ্ঞাতব্য, ইহাই জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন।" বায়রণ বলেন, "সৌন্দর্য্যের স্বর্গীয় জ্যোতির কণিকামাত্র অঙ্কিত করা সুকঠিন।" টেনিসন বলেন, "সৌন্দর্য্যই জগৎকর্ত্রী।" বিদ্যাপতি সৌন্দর্য্য-সন্দর্শন বিরতায় অতৃপ্ত হইয়া সন্তপ্ত হৃদয়ে বলিয়াছিলেন,—

"সজনি ভাল করি পেখন না ভেল
মেঘমালা সঙে তড়িত-লত জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল।"

চণ্ডীদাস সৌন্দর্য্যের অসীমতায় মজ্জিত হইয়া গাইয়াছিলেন;—

"জনমি অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

রস্কিন বলেন, "পাপ-প্রলোভ-সংস্পর্শ-শূন্য আত্মাকর বিমলানন্দ কেবল সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে।" বঙ্কিম বাবু বলেন;—"সৌন্দর্য্য-স্পৃহা যেরূপ বলবতী, সেইরূপ প্রশংসনীয়া ও পরিপোষণীয়া। মনুষ্যের যত প্রকার সুখ আছে, তন্মধ্যে এই সুখ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, কেন না, ইহা পবিত্র, নির্ম্মল, পাপসংস্পর্শ-শূন্য, সৌন্দর্য্যের উপভোগ কেবল মানসিক সুখ, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ইহার সংস্পর্শ নাই। সত্য বটে, সুন্দর বস্তু অনেক সময়ে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট, কিন্তু সৌন্দর্য্য-জনিত সুখ ইন্দ্রিয় তৃপ্তি হইতে ভিন্ন।"

ফলতঃ সৌন্দর্য্য অপার্থিব বা পার্থিব হউক, সৌন্দর্য্য-সম্ভোগ জনিত যে সার সুখ, তাহা অপার্থিব। পৃথিবীর ময়লা এক বিন্দুও তাহার সহিত মিশ্রিত নহে। অপার্থিব সৌন্দর্য্যের পূর্ণপ্রভা—পরম রমণীয় [illegible] কবি কল্পনায় ও জ্ঞানীর অন্তর্দৃষ্টিতে, কেবল সেইখানে তাহা অভিব্যক্ত, যেথানে—

'রূপ আছে, নাহি রিপু দুরন্ত'

সক্রেটিশ সমস্ত সৌন্দর্য্যের সমাহার করিয়া বলেন;—"পর্য্যায়ানুক্রমে সৌন্দর্য্যের অনুধাবন ও ধ্যান করিয়া সৌন্দর্য্যের প্রতি যাহার প্রেম নিয়মিত ও কেন্দ্রীভূত হয়; তিনি অকস্মাৎ এক অতি আশ্চর্য্য ও অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আকর সন্দর্শন করিতে সমর্থ হন। সেই সৌন্দর্য্য অসীম, অনন্ত, অব্যয় ও অবিনশ্বর;—সে সৌন্দর্য্যের ক্ষয় নাই, তাহা কোনও প্রকার পদার্থেরই অনুরূপ নহে; আংশিক সুন্দর ও আংশিক অসুন্দর নহে, তাহা কোনও দ্রব্য সম্বন্ধে সুন্দর, কোনও দ্রব্য সম্বন্ধে অসুন্দর নহে, তাহা এক স্থলে সুন্দর, অপর স্থলে অসুন্দর নহে; * * সেই সৌন্দর্য্যেরই প্রভায় সংসারের ও স্বর্গের অন্যান্য দ্রব্য সুন্দর। * * সে অনন্ত সৌন্দর্য্য-সাগরের ক্ষয় নাই, বৃদ্ধিও নাই; অল্পত্ব, আধিক্য ও পরিবর্ত্তন নাই। যখন মনুষ্য প্রকৃত সৌন্দর্য্য-প্রেমের নিম্নস্তর হইতে উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়া সেই অপার সৌন্দর্য্য সন্দর্শন ও তাহার ধ্যান ধারণা করিতে সমর্থ হয়, তখনি তাহার জীবনের সার্থকতা ঘটে। * * বহুবিধ বিশ্বাস ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠান তৎকালাবধি যে কাল পর্য্যন্ত অনন্ত সৌন্দর্য্য-প্রেম প্রস্ফুট না হয়, তাহা প্রস্ফুটিলে তাহারই জ্ঞানে ও তাহারই ধ্যানে, মনুষ্য অনির্ব্বচনীয় অনন্ত আরাম লাভ করে।" *

এ "আরাম" আমাদের এই কবি কি পরিমাণে আয়ত্ত করিয়াছিলেন, অন্ততঃ, অনুসন্ধান করিতেছিলেন, তাহা তাঁহার কবিতাই বলিয়া দিতেছে।

আমি উপরে বলিয়াছি, সৌন্দর্য্যের অদ্বিতীয় পার্থিব প্রতিকৃতি রমণী জাতি এই কবির কবিত্বের অন্যতম এক অতি প্রধান উদ্দীপনা। ইঁহার সর্ব্বপ্রথম কাব্য এই উদ্দীপনা হইতে উদ্ভূত এবং তৎপরবর্ত্তী কবিতা নিচয়েও ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আমি এ সম্বন্ধে, বিহারিলাল চক্রবর্ত্তীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহার কিয়দংশ এই;—"নারীজাতির প্রতি কবি-হৃদয়ের প্রগাঢ় পবিত্র প্রীতি, আধ্যাত্মিক স্নেহভক্তি, অনুরাগ এবং আন্তরিক উদারতা, স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ব্যতীত কেবল এক বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী প্রদর্শন করিয়া গেলেন। রমণীকে অনেকেই,

* "The Banquet of Plato." Shelley's Translation.

অনেকেই কেন, [illegible] সচরাচর দেবী বলে ; কিন্তু দেবী বলিয়া [illegible], প্রকৃত প্রস্তাবে দেবীবৎ-ব্যবহার তাঁহাকে কয়জন লোকে করিয়া থাকে ;— এই পাপ পৃথিবীতে একাল পর্য্যন্ত ছোট বড় কয়জন লোকে করিয়াছে ? অস্মদ্দেশীয় আর্য্যশাস্ত্রে নারী পূজার ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু, পূজকের পবিত্রতা এবং আন্তরিকতার অভাবে তাহার আধ্যাত্মিকতা নষ্ট হইয়া, সে ব্যবস্থা ক্রমে কৃত্রিম, প্রাণশূন্য এবং শুষ্ক লোকাচারে, [illegible] অথবা, বিকৃত ব্যভিচারে পরিণত হইয়াছিল,— পরিণত হইয়াই আছে। পরন্তু, পাশ্চাত্য পৃথিবীতে পুরাকালের পণ্ডিত সমাজের মধ্যে নারীসমাজ বা সমষ্টিত নারী জাতির প্রতি আধ্যাত্মিক অনুরাগের অভিমত আমরা দেখিতে পাই, কেবল প্লেটোতে। পাশ্চাত্য ভূমে প্লেটো রমণী পূজার প্রবর্ত্তক। সে পূজা ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ-শূন্য প্লেটনিক প্রণয় সম্ভূত। পরবর্ত্তী কালে ম[illegible] অগস্ত কোমৎ এ পূজার আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠাতা। মহা মনস্বী জন ষ্টুয়ার্ট মিলেও আমরা এই অনুরক্তির আভাস পাই। ইহারা সকলেই দার্শনিক। কিন্তু, কবিকুলে এই মহামন্ত্রের উপাসক লোক কই ? মহাজন বৈষ্ণব কবিগণ ? হাঁ, এ কথা অসত্য নহে। বৈষ্ণব কবি সম্প্রদায় এবং শাক্ত কবিদিগেরও কেহ কেহ বটে রমণী মাহাত্ম্য অনেক বর্ণনা করিয়াছেন। রমণীর সর্ব্বাঙ্গীন শক্তিও তাঁহারা অনুভব না করিয়াছিলেন, এমন নহে। কিন্তু, তাহা সুরলোকের আদর্শ বা অবতাররূপিণী দেবী মাহাত্ম্যের বিবৃতি মাত্র, কচিৎ আন্তরিক অনুভূতিও বটে। এই সকল কবিদিগের কেহ নরলোকের নারী জাতির সমষ্টিতে জগদ্ধাত্রী ও জগৎপালয়িত্রী মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া সম্যক রূপে মোহিত হইয়াছিলেন এবং তাহার আধ্যাত্মিকতা অনুভব করিয়া কবিত্ব উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়াছিলেন, এমত বলা যায় না। পক্ষান্তরে, কালিদাস হইতে একালের কালাচাঁদ পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই কেবল রমণীর রূপ বর্ণনা ও রমণীকে লইয়া [illegible] করিয়াছেন। আধ্যাত্মিক ভাবে রমণী মাহাত্ম্য [illegible] সর্ব্বাঙ্গীন অনুভব করিতে সমর্থ [illegible]। পাশ্চাত্য কবিদিগের মধ্যেও প্রায় এই ভাব [illegible] মাহাত্ম্যানুভব করে শক্তির সন্ধান আছে [illegible] সহিত দুর্গামণ্ডিত। অতএব, [illegible] প্রকাশিত হইলেও [illegible] সত্যের খাতিরে বলিতে পারি যে, আমাদের এই অধঃপতিত বাঙ্গালী জাতির আধুনিক কালের বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে এমন দুইটী কবি জন্মিয়াছিলেন, যাঁহাদের অকৃত্রিম কাব্যোচ্ছ্বাস রমণী মাহাত্ম্য মূলক এবং সে উচ্ছ্বাস, করুণ ও অকৃত্রিম, মর্ম্মস্পর্শী এবং সার্ব্বভৌমিক ; সুতরাং পৃথিবীর কোনও কবির গীতি-উচ্ছ্বাস অপেক্ষা হীন নহে। আমরা উপরেই বলিয়াছি, এই দুই কবির এক জন "মহিলা" নামক ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থের চির স্মরণীয় কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, অপর "বঙ্গসুন্দরী" ও "সারদা-মঙ্গল" প্রণেতা বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী, যাঁহার মৃত্যুতে ব্যথিত হইয়া অদ্য আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যের হটগোলের ভিতর উপরোক্ত কথাটী বলিতে সাহসী হইয়াছি।"

কিন্তু, কবির এতৎ সম্বন্ধীয় সঙ্গীত উদ্ধৃত করিতে স্থান নাই। এ বিষয়টীও বিস্তৃত। ইহার স্বতন্ত্র আলোচনা হওয়া উচিত।

বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী যে প্রকৃতির কবি-তাহা আমি কিয়ৎ পরিমাণে বলিয়াছি। ইনি অপরিজ্ঞাত কবি, সুতরাং ইহাঁর জীবনীও অজ্ঞাত। জীবনীর যাহা জ্ঞাত হইয়াছি, তাহা তিন কথায় সমাপ্ত।

১২৪২ সালের ৮ই জ্যৈষ্ঠ বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, ১৩০১ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ। পিতার নাম দীননাথ চক্রবর্ত্তী। নিবাস কলিকাতা। প্রথম শিক্ষা পাইয়াছিলেন, কালকাতা সংস্কৃত কালেজে।

ইহার অধিক আমরা আর কিছুই জানি না। তবে ইহা জানি বটে যে, বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর পরবর্ত্তী প্রধান-দিগের মধ্যে [illegible] ন। [illegible] চক্রবর্ত্তীই প্রকৃ[illegible] বিহারিলাল অমঙ্গ[illegible] নহেন। আনন্দ[illegible] মর্ম্মে মর্ম্মে প্রতি[illegible] অথবা সংসার-সংগ্রা[illegible] জনিত অমঙ্গল, ঘৃণা

কবি-হৃদয়ের একটা প্রবণতা বটে; উদাহরণ হেনরিচ হায়েন, কাউপার প্রভৃতি। কিন্তু ইহা যে খুব স্বাভাবিক, তাহা নহে। বরং বিকৃত ও মানসিক অস্বাস্থ্যজনিত বলিয়াই পরিগণিত। কিন্তু, এ আলোচনাও বিস্তার সাপেক্ষ। অতএব আপাততঃ ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারি না। এ সম্বন্ধে বিহারিলাল বাবুর দুই একটা উক্তি এই;—

এত যে কঠিন ধরা
বজ্জাতি-বিষের ভরা;
মনের আনন্দে আছি অন্তরে যন্ত্রণা নাই।

* * *

এস বোন, এস ভাই
হেসে খেলে চলে চাই
আনন্দে আনন্দ করি আনন্দ কাননে!
এমন আনন্দ আর নাই ত্রিভুবনে!

বিহারিলালের দুইখানি সম্পূর্ণ ও এক খানি অসম্পূর্ণ কাব্য বিদ্যমান আছে। ঘটনা ক্রমে এই তিনখানি কাব্যই প্রথমতঃ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। "বঙ্গসুন্দরী" "অবোধ বন্ধু"তে এবং "সারদামঙ্গল" "আর্য্য-দর্শনে" প্রকাশিত হওয়ার পর পুস্তকাকারে পুনঃ প্রকাশিত হয়। "সাধের আসন" এই প্রবন্ধের লেখক কর্ত্তৃক এক সময়ে সম্পাদিত একখানি মাসিক পত্রে প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। বঙ্গসুন্দরীর ২য় সংস্করণ আমাদের সম্মুখে দেখিতেছি। "সারদা মঙ্গলের" বোধ হয় ২য়সংস্করণ হয় নাই। "সাধের আসন" সম্পূর্ণ হয় নাই।

বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী (জীবিতাবস্থার ন্যায়) মৃত্যুর পর অন্য কাহারও কর্ত্তৃক অর্চ্চিত না হউন, এ সময়ের শ্রেষ্ঠতর কবির হস্তে সুবিচার প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত [illegible]ন্দ্রনাথ বাবু, সুদীর্ঘ [illegible]লোচনায় চক্রবর্ত্তী [illegible]ছেন। স্বভাব- [illegible]মালোচনা কবির [illegible]হে। কবি-হৃদয় [illegible]ঝিতে পারে না। [illegible] নিকট আত্মশ্লাঘ [illegible]হয়েন নাই। ইহা [illegible]স্থ্যেরই পরিচায়ক। [illegible]ন্দ্র বাবুকে বাল্যকাল হইতে প্রভাবিত করিয়াছিল। রবীন্দ্র বাবু বলেন;—

"বাল্যকালে বাল্মীকি প্রতিভা নামক একটি গীতি নাট্য রচনা করিয়া "বিদ্বজ্জন সমাগম" নামক সম্মিলন উপলক্ষে অভিনয় করিয়াছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র এবং অন্যান্য অনেক রসজ্ঞ লোকের নিকট সেই ক্ষুদ্র নাটকটি প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। সেই নাটকের মূল ভাবটি, এমন কি, স্থানে স্থানে তাহার ভাষা পর্য্যন্ত বিহারিলালের সারদা-মঙ্গলের আরম্ভ ভাগ হইতে গৃহীত।"

পুনঃ—

"বর্ত্তমান সমালোচক এক কালে বঙ্গসুন্দরী ও সারদা-মঙ্গলের কবির নিকট হইতে কাব্য শিক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল, কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছে, বলা যায় না, কিন্তু, এই শিক্ষাটী স্থায়ীভাবে হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়াছে যে, সুন্দর ভাষা কাব্য-সৌন্দর্য্যের একটি প্রধান অঙ্গ; ছন্দে এবং ভাষায় সর্ব্বপ্রকার শৈথিল্য কবিতার পক্ষে সাংঘাতিক।"

সর্ব্ববিধ প্রাথমিক শিক্ষাতেই অনুকরণ আবশ্যক। অতএব রবীন্দ্রনাথ বাবু বিহারিলালের অনুকরণ করিয়াছিলেন, ইহা আশ্চর্য্য নহে। রবীন্দ্রবাবু, তাহাতে "কতদূর কৃতকার্য্য" হইয়াছেন, তাহা বলিবার স্থান ইহা নহে। প্রসঙ্গক্রমে কেবল ইহাই বলিতে পারি যে, অনুকরণে কৃতকার্য্য হওয়ার আবশ্যকতা রবীন্দ্রনাথ বাবুর কিছুমাত্র নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে, রবীন্দ্র বাবু কাহারও অনুকারী কবি বলিয়া আমার মনে হয় না। তদীয় কবি প্রতিভা নিজেই মৌলিক ভাবাপন্ন।

বাঙ্গালা ভাষার উপর বিহারিলাল চক্রবর্ত্তীর অসাধারণ প্রভুত্ব ছিল। ছন্দ শৃঙ্খলায় তিনি অদ্বিতীয়, কিন্তু তাঁহার ছন্দের সুর তদীয় সৌন্দর্য্যের নিজেরই সুর। ভাব সম্পদের নিজেরই সুর, নিজেরই নূতন নূতন ছন্দ থাকে। অন্ততঃ আমার ইহা ধারণা। ভাষা ভাবের অভ্যন্তর হইতে স্বতঃ নির্ম্মিত হইয়া আসে। ভাবের সহিত তাহা অবিচ্ছিন্নভাবে সংমিলিত; যে কাব্যে তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, তাহা শাব্দিক কবির কবিতা।

এই অকিঞ্চিৎকর আলোচনা, রবীন্দ্র বাবুর সমালোচনার সহিত সকল বিষয়ে এক মতাবলম্বী না হইলেও, তাঁহার নিকট অঋণী নহে। শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

দ্বাদশ খণ্ড—পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যা। ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩০১।

নব্যভারত।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত।

প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

কলিকাতা,

১/১ শঙ্করঘোষের লেন, নব্যভারত-বসুমতী প্রেসে, শ্রীউমেশচন্দ্র নাগ দ্বারা মুদ্রিত,

২১০/৪নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট, নব্যভারত-কার্য্যালয় হইতে

সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৭ই ভাদ্র, ১৩০১।

ডাকমাসুল সমেত বার্ষিকমূল্য ৩৲] [এই সংখ্যার মূল্য ৷৶০ আনা।

সম্পাদকের নিবেদন।

১। পূজার ছুটীর জন্য ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের নব্যভারত একত্রে প্রকাশিত হইল। আশ্বিন মাসের বাকী ৩ ফর্ম্মা কার্ত্তিক সংখ্যায় সংলগ্ন হইবে।

২। পূজার সময় আমাদের সমস্ত দেনা পরিশোধ করিতে হইবে। বহু গ্রাহকের নিকট মূল্য বাকী, এদিকে টাকার অভাবে আমাদিগের যারপর নাই কষ্ট হইতেছে। এই সময়ে গ্রাহকগণ দয়া করিয়া কিছু কিছু দিলে যারপর নাই উপকৃত হইব।

৩। নূতন গ্রাহকগণ "নূতন" শব্দটী লিখিয়া দিবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ পত্রাদি লেখার সময় নামের নম্বর না দিলে পত্রানুসারে কাজ করা যায় না।

৪। বাবু শরচ্চন্দ্র মজুমদার, বাবু রজনীকান্ত মিত্র এবং বাবু যজ্ঞেশ্বর মল্লিক মহাশয়গণ নব্যভারতের এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়া মূল্য আদায় করিতে গিয়াছেন। আমাদের স্বাক্ষরিত রসিদ লইয়া ও চেকের মুড়িতে প্রদত্ত টাকার পরিমাণ লিখিয়া দিয়া গ্রাহকগণ মূল্য প্রদান করিবেন। ইহার অন্যথা করিলে আমরা দায়ী নহি। নব্যভারত কার্য্যালয়ে বঙ্কিমবাবুর দুই প্রকার ছবি পাওয়া যায় ; মূল্য ./০, মাশুল ৴১০।

নব্যভারত সম্পাদকের বিশেষ পরিচিত।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় ও বিদ্যালয়।

কবিরাজ শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র সেন।

৩৮ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, চোরবাগান, কলিকাতা।

এই স্থানে আয়ুর্ব্বেদীয় অমৃতপ্রাশ, চ্যবনপ্রাশ, ছাগাদি ও চরক সুশ্রুতোক্ত নানাপ্রকার বৃষ্যঘৃত, মহামাষ, মহারুদ্র, কন্দর্পসার, বৃহদ্‌বিষ্ণু, মধ্যমনারায়ণ, বাসারুদ্র, সপ্তশতী প্রসারণী প্রভৃতি তৈল ; নানাবিধ বটিকা, মোদক, বটিকা চূর্ণ, অবলেহ, অরিষ্ট, আসব ও জারিত ধাতু দ্রব্যাদি সকল সুলভমূল্যে পাওয়া যায়। মফঃস্বলে ভ্যালুপেবল ডাকে পাঠান হয়। ব্যারামের অবস্থা সহ রিপ্লাই কার্ড, কি টিকিট্ পাঠাইলে ব্যবস্থা লিখিয়া পাঠান হয়।

"আমি শ্রীযুক্ত কবিরাজ ক্ষীরোদচন্দ্র সেন মহাশয়ের চিকিৎসা প্রণালী দেখিয়া মোহিত হইয়াছি। ইনি অতিশয় বিচক্ষণ ব্যক্তি, আমার বাড়ীতে নানাপ্রকার কঠিন-পীড়া অল্প সময়ের মধ্যে আরোগ্য করিয়া আমাকে চিরঋণী করিয়াছেন। স্বভাব উত্তম, প্রকৃতি মধুর, ব্যবহার অতি সুন্দর। ইঁহার দ্বারা যিনি কোন রোগীর চিকিৎসা করাইবেন, তিনিই মোহিত হইবেন, বিশ্বাস করি।"

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, নব্যভারত-সম্পাদক।

একবার পড়িয়া দেখুন।

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম, এ প্রণীত বনফুল ॥০, প্রেমহার ॥০, এবং বিবিধ প্রবন্ধ ॥০। এই তিনখানি পুস্তক এক টাকায় বিক্রীত হইতেছে। ডাকমাশুল লাগিবে না। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ম্যানেজার, সংস্কৃত ডিপজিটারি, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সোণারতরী। (নূতন কবিতা পুস্তক)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। মূল্য দুই টাকা।

ছোট গল্প। (১৬টী ছোট উপন্যাস) মূল্য ১৲।

এই গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক গুলি ২০১ নম্বর কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট শ্রীযুক্ত

উপনিষদঃ।

অর্থাৎ ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য এই ছয়খানি উপনিষৎ। "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীসীতানাথ দত্ত কৃত "শঙ্কর-কৃপা" নাম্নী সরল ও সংক্ষিপ্ত টীকা ও "প্রবোধক" নামক বঙ্গানুবাদ সমেত। সুপ্রসিদ্ধ বেদাচার্য্য শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী কর্ত্তৃক সংশোধিত। মূল্য ১৲ টাকা, ডাকমাশুল ./০ আনা। ২১০।৩২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, লেখকের নিকট প্রাপ্তব্য।

ফরিদপুর সুহৃদ সভা।

ফরিদপুরের দুর্ভিক্ষের জন্য এবার আশ্বিন মাসে পরীক্ষোত্তীর্ণ বালক, বালিকা ও মহিলাগণের পারিতোষিক বিতরণ হইবে না। শীত কালে হইবে। তত্ত্বাবধায়কগণ সে জন্য উদ্বিগ্ন হইবেন না।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী।

নব্যভারত সম্পাদকের সুপরিচিত।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রতাপ বাবু, ব্রজেন্দ্র বাবু, অক্ষয় বাবু, দয়াল বাবু এবং মিঃ ডি, এন রায়, এম, ডি, মহোদয়গণের বিশেষ অনুগৃহীত। মাদার টিং ড্রাম ।৴০, ডাঃ ১২ পর্য্যন্ত ।০, ৩০ ক্রম ।৵০ ; ১২ শিশির ঔষধপূর্ণ কলেরা বাক্স পুস্তকাদি সহ ৩৲ ঐ ২৪ শিশির ৮॥০, ৩০ শিশির ১০॥০ ইত্যাদি। গার্হস্থ্য চিকিৎসার ঔষধপূর্ণ বাক্স সহ পুস্তক, ফোঁটা ফেলার যন্ত্র ২৪ শিশির ৮/০ ; ৩০ শিশির ২॥৵০ ; ৩৬ শিশির ১২৲ ইত্যাদি থার্মমিটার ২/০ ; সুগর অব মিল্ক "হিগ" ৩, ৪॥০, ৫৲. ক্ষুদ্র শিশির কার্কের ১ আউন্স ৸০, অর্দ্ধ আউন্স ॥০।

এমেরিকান ও জার্ম্মেন ফার্ম্মাকোপিয়ার বাঙ্গালা অনুবাদ সংক্ষেপ সংস্করণ ২৲। শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং,

রূপ ও সনাতন গোস্বামী।

মালদহ জেলায় রূপ ও সনাতন গোস্বামীর অনেক কিম্বদন্তী আজিও শুনিতে পাওয়া যায়। এই দুই ভ্রাতার প্রকৃত অর্থাৎ পিতা মাতার রক্ষিত নাম কি ছিল, তাহা জানা যায় না। তাঁহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে উপরোক্ত নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইংরাজবাজারের অপর পারে মহানন্দা তীরে এক্ষণে যে গ্রাম শা-পুর বলিয়া উল্লিখিত হয়, তাহার কিঞ্চিদধিক এক ক্রোশ পূর্ব্বে বরেন্দ্র ভূমির সীমার মধ্যে মোরগ্রাম মাধাইপুর নামে দুইটি সংশ্লিষ্ট গ্রাম দেখা যায়। কথিত আছে, এই মোরগ্রাম মাধাইপুরে রূপ ও সনাতনের মাতুলালয় ছিল। এবং এই মাতুলালয়েই তাঁহারা বাল্যে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। উক্ত গ্রামের সন্নিকটে "সাকরমা" বলিয়া আর একটি গ্রাম আছে, তাহা অধিকাংশই কাঠাল বা জঙ্গলময়। ঐ জঙ্গলও সাকরমার কাঠাল বলিয়া বিখ্যাত। সাকর মল্লিক হইতে সাকরমা শব্দের উৎপত্তি, এবং এইরূপ কথিত হয় যে, রূপ—যিনি পূর্ব্বে সাকর মল্লিক নামে বিখ্যাত ছিলেন, তিনি বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া এই গ্রামে নূতন বাটী নির্ম্মাণ করেন। তিনি বসতি করায় এই স্থান সাকর মল্লিকের গ্রাম বলিয়া বিখ্যাত হয়। তাহা ভাষা কথায় সাকরমা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গৌড়নগরের ভগ্নাবশেষের মধ্যে যে স্থানে বড়সোনামস্‌জীদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, তাহারই অনতিদুরে রামকেলি নামক গ্রাম। বৎসর বৎসর এইখানে বৈষ্ণবদের একটি মেলা হয়। এখানে একটি পুষ্করিণী আছে, তাহা রূপসাগর নামে বিখ্যাত।

রূপ সনাতন কোন্ জাতীয় লোক ছিলেন, ইহা লইয়া অনেক বাদানুবাদ দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণের সন্তান। কেহ বলেন, তাঁহারা মুসলমানের সন্তান। কেহ বলেন, তাঁহারা প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু মুসলমান রাজসরকারে চাকুরি করার সময় মুসলমান হইয়াছিলেন।

চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে দেখা যায়, তাঁহাদের এক তৃতীয় ভ্রাতা ছিল। তাঁহার আদিম নাম অনুপম এবং তিনি বৈষ্ণব হইলে তাঁহার নাম হয় শ্রীবল্লভ। ইনিই জীব গোস্বামীর পিতা। অনুপম হিন্দু নাম। তাহাতে তিনি জাতিতে হিন্দু ছিলেন দেখা যায়। সুতরাং রূপ ও সনাতনকেও হিন্দু পিতা মাতার সন্তান বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। অপিচ শ্রীকান্ত নামে সনাতনের এক ভগিনীপতিও গৌড়ের রাজ সংসারে চাকুরী করিতেন বলিয়া উক্ত গ্রন্থে প্রকাশ। যৎকালে সনাতন গৌড় হইতে পলাইয়া যান, পথে হাজিপুরে শ্রীকান্ত বাদসাহের জন্য ঘোড়া খরিদ করিতেছিলেন, তথায় সনাতনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। হাজিপুরের নিকট হরিহর ছত্রে অদ্যাপিও ঘোড়া ক্রয় বিক্রয় হয়। শ্রীকান্তও হরিহর ছত্রে ঘোড়া কিনিতে গিয়াছিলেন বোধ হয়। শ্রীকান্তও হিন্দু নাম; এবং তিনি যখন সনাতনের ভগিনীপতি ছিলেন, তখন সনাতনকেও হিন্দুর সন্তান না বলিয়া থাকা যায় না।

তাহার পর রূপ ও সনাতন সংস্কৃতে যেরূপ কৃতবিদ্য ছিলেন দেখা যায়, তাহাই তাঁহাদের আদিম ব্রাহ্মণত্বের সম্পূর্ণ পরিচায়ক। উদাহরণ স্বরূপ রূপ গোস্বামীর একটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যথা—

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণায়াবতীর্ণঃ কলৌ।
"সমর্পয়িতুমুন্নতো জ্বলরসাং স্বভক্তি শ্রিয়ং।
"হরিঃ পুরট সুন্দর দ্যুতি কদম্ব সন্দীপিতঃ।
"সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতুবঃ শচীনন্দনঃ॥"

বাল্যে সংস্কৃতে শিক্ষিত না হইলে এমন কবিতা লেখনীতে আসা অসম্ভব।

কথিত আছে যে দুই ভ্রাতাই বাল্যে নবদ্বীপে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন। বোধ হয়, পঠদ্দশাতেই প্রথমে বিশ্বম্ভর মিশ্র শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের সহিত তাঁহাদের পরিচয় হইয়াছিল।

দুই ভ্রাতার মধ্যে কে বড়, কে ছোট, এ বিষয়েও মতামত দেখা যায়। কবি কর্ণপুর, যিনি সনাতনের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি সনাতনের কথা এইরূপ লিখেন—

গৌড়েন্দ্রস্য ধভাবিভূষণ মণিস্ত্যক্ত্বা য ঋদ্ধাং শ্রিয়ং।
"রূপস্যাগ্রজ এব এষ তরুণীং বৈরাগ্য লক্ষ্মী' দধে।"
ইত্যাদি।

ইহাতে সনাতনকে রূপের অগ্রজ বলা হইয়াছে। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতে যেখানে হুসেন সাহ সনাতনকে তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন,—

"তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার।
"জীব পশু মারি কৈল চাকলা সব নাশ॥"

এখানে রূপেরই কথা হইতেছে বলিয়া বুঝা হইয়া থাকে। তাহা হইলে চরিতামৃতের মতে রূপই জ্যেষ্ঠ। ফলতঃ আমি এই মতদ্বৈধের মীমাংসায় সক্ষম নহি।

বৈষ্ণব হইবার পূর্ব্বে গৌড়ের রাজসরকারে নিযুক্ত থাকার সময়ে সনাতন "দবীর খাস" ও রূপ "সাকর মল্লিক" বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। দবীর শব্দের অর্থ লেখক—কায়স্থ বা কেরাণী। সনাতন গৌড়াধিপতি হুসেন সাহার "খাস কেরাণী" বা প্রাইবেট সেক্রেটারী ছিলেন। সাকর মল্লিকের অর্থ বড় পরিষ্কার নহে। বোধ হয় ইহা "সাকের মল্লিক"।—সে যাহা হউক, রূপ বাদসাহের এক জন সভাসদ্ বা মোসাহেব গোছের লোক ছিলেন বলিয়া বিবেচনা হয়।

ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও দুই ভ্রাতাতেই যবনাচারী হইয়াছিলেন জানা যায়। রীতিমত কল্মা পড়িয়া মুসলমান হইয়াছিলেন কি না, প্রকাশ নাই; কিন্তু তাঁহারা যে জাতিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। চৈতন্যের অনুচরবর্গের মধ্যে কেবল তিন জন জগন্নাথের মন্দিরের ভিতরে যাইতেন না, হরিদাস, রূপ ও সনাতন। ইহাতে হরিদাসের ন্যায় রূপ সনাতনও যে একদা যবন ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট জানা যায়। তাই তাঁহারা সঙ্কুচিত হইয়া জগন্নাথের মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতেন না। রামকেলীতে চৈতন্যের সহিত যখন তাঁহাদের কথোপকথন হয়, তখন (চৈতন্যচরিতামৃত অনুসারে) উভয় ভ্রাতাই আপনাদিগকে "ম্লেচ্ছ জাতি, ম্লেচ্ছ সঙ্গী, করি ম্লেচ্ছ কর্ম্ম" বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করেন। এবং জগাই মাধাইএর সহিত আপনাদের তুলনা করিয়া চৈতন্যকে বলেন—"প্রভু! জগাই মাধাই মহাপাপী হইলেও তাহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিল, তাহাদিগকে উদ্ধার করা আপনার পক্ষে সহজ। কিন্তু আমরা পাপী, তাহার উপর ম্লেচ্ছ জাতি, আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন কি রূপে?" এই উক্তিতে তাঁহারা যে ব্রাহ্মণত্ব হারাইয়াছিলেন, ইহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। অপিচ যখন সনাতন কারাগারে আবদ্ধ হইয়া কারারক্ষকের সহিত কথাবার্ত্তা কহেন, তখন বলিয়াছিলেন, "ভাই আমাকে ছাড়িয়া দাও, তোমার কোন ভয় নাই; কেননা আমি

দরবেশ হইয়া মক্কায় যাইব। এদেশে আর আসিব না। গঙ্গায় ডুবিয়া মরিয়াছে বলিলে কেহ তোমাকে অবিশ্বাস করিতে পারিবে না।” কারারক্ষকও মুসলমান। সনাতন যদি তখন হিন্দু থাকিতেন, তবে দরবেশ হইয়া মক্কা যাইব, একথা তিনি বলিতেন না, বলিলেও কারারক্ষক বিশ্বাস করিত না। অবশেষে ইহাও লিখিত আছে যে, কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া যখন তিনি কাশীতে চৈতন্যের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার বেশভূষা সম্পূর্ণ মুসলমানের ন্যায় ছিল।

পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও রূপসনাতন অর্থ লোভে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ ও যবনাচার গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা অতি শোচনীয় ঘটনা। তাঁহারা যদি মহম্মদীয় ধর্ম্মকে পরিত্রাণের উপায় বলিয়া শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে বলিবার কোনও কথা ছিল না। কিন্তু তাঁহাদের শেষ জীবনের বৃত্তান্তে জানা যায় যে, মুসলমান ধর্ম্মে তাঁহাদের অণুমাত্র আস্থা ছিল না। এরূপ অবস্থায় মতিচ্ছন্নতা বশতই তাঁহারা যে যবনাচারী হইয়াছিলেন, তাহা স্বীকার করিতে হয়। বিষয় বৈভবের প্রলোভনই ঐরূপ মতিচ্ছন্ন হওয়ার কারণ ছিল। অন্য কারণ দেখা যায় না।

এমন এক দিন আসিল, যখন দুই ভ্রাতা আপনাদের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া ঘোর অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। কিরূপ ঘটনায় এইরূপ ভাবের উদয় হয়, তাহা বলা যায় না। কিন্তু দেখা যায়, দুই ভ্রাতা অবশেষে রাজপ্রসাদ হারাইয়াছিলেন। যে রাজানুগ্রহের কুহকে পড়িয়া তাঁহারা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, যখন সেই রাজানুগ্রহ হারাইলেন, তখন অনুতাপ হইবারই কথা। জাতিও গেল পেটও ভরিল না! রূপ দণ্ডভয়ে গৌড় হইতে পলায়ন করিলেন, সনাতন কারারুদ্ধ হইলেন। কি জন্য তাঁহারা রাজার বিষনয়নে পতিত হয়েন, বৈষ্ণব গ্রন্থে তাহার প্রকৃত বৃত্তান্ত লিখিত হয় নাই। আভাসে জানা যায়, রূপকে হুসেন সাহ প্রজাপীড়ক অত্যাচারী দস্যু বলিয়া জানিতে পারেন—

“তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার।
জীব পশু মারি কৈল চাকলা সব নাশ॥”

ইহাই যদি রূপের প্রকৃত চিত্র হয়, তবে তিনি যে রাজার কোপ দৃষ্টিতে পড়িবেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

সনাতনের কি দোষ ছিল, তাহা স্পষ্ট জানা যায় না। এই পর্য্যন্ত লিখিত আছে যে, রূপ পলাইয়া গেলে পর তিনি হঠাৎ পীড়ার ভান করিয়া রাজবাটীতে যাওয়া আসা বন্ধ করিলেন। হুসেন সাহ বৈদ্য পাঠাইয়া দিয়া জানিলেন, পীড়ার কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। ইহাতে আভাসে সনাতন যে মিথ্যাবাদী ও কপটাচারী ছিলেন, তাহা জানা যায়। হুসেন সাহ ক্রুদ্ধ হইয়া তুমি আমার সকল কর্ম্মনাশ করিয়াছ বলিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। ফলতঃ এ ব্যক্তিও দুষ্কর্ম্ম করিয়া ভ্রাতার ন্যায় পলাইবার ফিকিরে আছে, এই সন্দেহ করিয়াই তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল, অনুমান হয়। তাঁহার দোষের কোনও বিচার হওয়ার কথা প্রকাশ নাই। বৈষ্ণবেরা বিবেচনা করেন যে, কেবল বৈরাগ্য বশতই রূপসনাতন রাজকার্য্য পরিত্যাগ করেন। ইহা প্রকৃত বিবেচনা হয় না। চৈতন্যচরিতামৃতে তাঁহাদের বিষয় ত্যাগের যেরূপ বিবরণ আছে তাহা অসংলগ্ন বোধ

হয়। প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয় হইলে এক-খানা কৌপীন পরিধান করিয়া বাহির হইয়া গেলেই হয়, তাহার জন্য বড় ভাবনা চিন্তা বা ফন্দী ফিকির করিতে হয় না। রূপসনাতনের স্পষ্টই তাদৃশ বৈরাগ্যের উদয় হয় নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লেখেন

শ্রীরূপ সনাতন রহে রামকেলি গ্রাম।
প্রভুকে মিলিয়া গেল আপন ভবন।
দুই ভাই বিষয় ত্যাগের উপায় সৃজিল
বহু ধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণ বরিল।
কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চরণ।
অচিরাতে পাইবারে চৈতন্য চরণ।

এ কথা বিশ্বাস করা দুরূহ। তাঁহারা যখন পতিত হইয়াছিলেন, তখন ব্রাহ্মণে তাঁহাদের পুরশ্চরণ করিবে কেন? তবে হইতে পারে, অত ধনের লোভে কোনও ব্রাহ্মণ ঐরূপ করিয়াছিল। কিন্তু পুরশ্চরণের কথা সত্য হইলেও, তাহার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ভিন্নরূপ ছিল। গ্রহ দুর্বিপাকের কোন শান্তি কার্য্য করাইয়াছিলেন, হইতে পারে নতুবা চৈতন্য চরণ পাইতে দুই ভ্রাতার পুরশ্চরণ করার কোনও আবশ্যক ছিল না। কথা না বলিয়া বাহির হইলেই চৈতন্য চরণ পাওয়া যাইত।

তাহার পর কবিরাজ মহাশয় বলেন

শ্রীরূপ গোসাঞি তবে নৌকাতে ভরিয়া।
আপনার ঘরে আইলা বহু ধন লঞা।

এত "পাগলা বুড়া আগলের" কথা। এখানে ত বিষয়ত্যাগ বৈরাগ্যের কোনও চিহ্নই দেখি না। চৈতন্য চরণ পাইবার জন্য এক নৌকা ভরা ধনের আবশ্যক কি?

কবিরাজ মহাশয় পরে বলেন—

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দিল তার অর্দ্ধ ধনে
এক চৌঠি ধন দিলা কুটুম্ব ভরণে।
দণ্ড বন্ধ লাগি চৌঠি সঞ্চয় করিল।
ভাল ভাল বিপ্রস্থানে স্থাপ্য রাখিল।
গৌড়ে রাখিল মুদ্রা দশ হাজারে।
সনাতন ব্যয় করে রহে মুদি ঘরে।

এ বড় বিচিত্র বৈরাগ্যের কথা! বৈরাগী হইয়া পলায়নের সম্বল স্বরূপ সনাতন দশ হাজার মুদ্রা রাখিলেন।—স্বর্ণ না রৌপ্য মুদ্রা তাহা লেখা নাই। রৌপ্য হইলেও তখনকার দশ হাজার এখনকার অন্যূন সার্দ্ধ লক্ষ। ইহা বৈরাগ্যের উপযুক্ত পুঁজি বটে। কিন্তু এখানে প্রকৃত কথার একটুকু আভাস রহিয়াছে। রূপ যে বহুতর অর্থ লইয়া গৌড় হইতে সাকরমায় পলাইয়া আসিলেন, তাহার কিছু বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণের নিকট পুতিয়া গচ্ছিত রাখিলেন কেন? রাজদণ্ড ভয়ে। রাজদণ্ডের ভয় কেন? তিনি কি অপরাধ করিয়াছিলেন যে রাজদণ্ডের ভয়?—সে কথা প্রকাশ নাই। তবে তাঁহার যে রাজদণ্ডের ভয় ছিল, ইহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। সেই রাজদণ্ডের ভয়েই তিনি গৌড় হইতে পলায়ন করিলেন, বৈরাগ্যের খাতিরে বোধ হয় না। তিনি বিশেষ কোনও রাজকর্ম্মে আবদ্ধ ছিলেন না। সুতরাং তাঁহার পলায়ন অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। কিন্তু সনাতন কেরাণীগিরি কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় তাঁহার পলায়ন তত সহজে সিদ্ধ হয় নাই। রূপ পলায়ন করিয়াছে প্রকাশ হইলেই হুসেন সাহ সনাতনকে কারারুদ্ধ করেন। কিন্তু তিনিও অবশেষে কারারক্ষককে উৎকোচ দিয়া পলায়ন করেন।

বৈষ্ণবগ্রন্থে যতদূর লেখা আছে, তাহা বিশেষ প্রণিধানের সহিত আলোচনা করিলে জানা যায়, রূপ ও সনাতনের পূর্ব্ব জীবন পাপপঙ্কে মলিন ছিল। রাজস্ব বিভাগের রাজকীয় কার্য্য হিন্দু রাজাদের আমলে

যেমন কায়স্থেরা নির্ব্বাহ করিতেন, মুসলমান রাজাদের আমলেও তাঁহারা তেমনি নির্ব্বাহ করিতেন। সনাতন দবীরখাস প্রকৃত পক্ষে একজন কায়স্থের কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। এই সময়ে কায়স্থদের রীতি চরিত্র কৃষ্ণদাস কবিরাজই অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি লেখেন "লোভী কায়স্থগণ রাজকার্য্য করে।" সনাতনও এই "লোভী কায়স্থগণের" অন্যতর ছিলেন। এই লোভেই তিনি জাতি দিয়াছিলেন, এবং ঐ লোভপ্রসূত দুষ্ক্রিয়াতেই বোধ হয় রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়েন। রূপ বোধ হয় কোনও নিয়মিত বেতন পাইতেন না, সনাতনেরও বেতন একজন বড় মুহুরির বেতন মাত্র ছিল। ঠিক তাহা কত ছিল, জানা যায় না তবে বড় বেশী হইবে না। অথচ দেখা যায় তাঁহারা প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। আর চোরের ন্যায় অন্যের নিকট সেই সঞ্চিত অর্থ লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন। গৌড়ে একজন মুদির নিকট তাঁহাদের ধন স্থাপ্য ছিল দেশেও বিশ্বাসী ব্রাহ্মণদের ঘরে স্থাপ্য ছিল।

বোধ হয়, যে সময়ে তাঁহাদের রাজদণ্ডের সম্ভাবনা হয়, সেই সময়েই তাঁহারা চৈতন্যকে স্মরণ করেন। তাঁহারা জানিতেন যে, চাকুরি গেলে এবং রাজানুগ্রহ হারাইলে তাঁহাদের আর সমাজে দাঁড়াইবার স্থল নাই। রাজধানী হইতে পলাইতে হইবে, কিন্তু যান কোথা?—এই সময়ে চৈতন্য এক নূতন সমাজ গঠন করিতে আরম্ভ করেন। সেই সমাজে জাতি বিচার ছিল না। এমন কি, মুসলমানকেও তিনি বৈষ্ণব করিয়া আপন সমাজে স্থান দিতে ছিলেন। তাঁহার এই অভিনব কার্য্যে রাঢ়ে বঙ্গে ধূম পড়িয়া গেল। দেশ বিদেশে তাঁহার নাম বিখ্যাত হইল। রূপসনাতন বোধ হয় পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাকে চিনিতেন। তাঁহারা এক্ষণে চৈতন্য সমাজে প্রবেশ লাভের অভিসন্ধি করিলেন। গোপনে গোপনে তাঁহারা চৈতন্যকে পত্র লিখিতে লাগিলেন। সেই সকল পত্রে কি লেখা ছিল, তাহা অপ্রকাশ, কিন্তু শুনা যায়, চৈতন্য প্রত্যুত্তরে এক সংস্কৃত শ্লোক লিখিয়া পাঠান, তাহার মর্ম্ম এই –

উপপতিতে আসক্ত কুলকামিনী গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত থাকিয়াও মনে মনে নব সঙ্গমজাত রস বিশেষ আস্বাদন করিয়া থাকে।

উপমাটা বড় নোংরা সন্দেহ নাই। ইহা চৈতন্যের উপযুক্ত হয় নাই। চৈতন্য মোটের উপর কুলটা স্ত্রীলোকের ন্যায় কিছুকালের জন্য কপটাচরণ করিয়া মনের ভাব গোপন করিয়া থাকিতে রূপসনাতনকে পরামর্শ দিলেন।

এই পরামর্শ অনুসারে রূপসনাতন একবারে বিষয় ত্যাগ না করিয়া রাজকার্য্যে রহিয়াছেন, এমন সময় হঠাৎ এক দিন চৈতন্য রামকেলীতে উপস্থিত। বৃন্দাবন যাইবার ছলে বহির্গত হইয়া তিনি বাঁকিয়া গৌড়ে আসিলেন। রূপসনাতনের মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল। হবে কি? মুণ্ডিতমস্তক কৌপীনধারী চৈতন্য সহচরেরা মুসলমান রাজধানীতে হরিবোলের স্বর উঠাইলে মুসলমানেরা ক্ষেপিয়া উঠিল, কতকগুলা ন্যাংটা সন্ন্যাসীতে আসিয়া হাঙ্গামের সূত্রপাত করিয়াছে, এ কথা হুসেন সাহের কর্ণগোচর হইল। এক্ষণে ব্রহ্মহত্যার যোগাড় হইয়া দাঁড়াইল। কেশব ছত্রি নামে হুসেন সাহের একজন বিশ্বাসী হিন্দু শরীর রক্ষী সেনাপতি ছিলেন; হুসেন সাহ তাহাকে চৈতন্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ছত্রি দেখিল বিপদ। সে বাদ

শাকে কহিল,—"ও এক জন সামান্য ফকির তীর্থ যাত্রা যাইতেছে। উহা হইতে কোনও বিপদ আশঙ্কা নাই। উহাকে মারিয়া কোনও ফল নাই।" এ দিকে গোপনে এক জন ব্রাহ্মণকে চৈতন্যের নিকট পাঠাইয়া দিয়া বলিল "ঠাকুর দেখ কি? শীঘ্র এখান হইতে পলায়ন কর।"

রূপসনাতন সাহস করিয়া দিবাভাগে চৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা আজিও চৈতন্যের সমাজে প্রবিষ্ট হইতে প্রস্তুত হইতে পারেন নাই। বিষয় বৈভবের একটা কিনারা বা বন্দোবস্ত হয় নাই—একবারে রাজকর্ম্ম ধনসম্পত্তি ছাড়িয়া দিতে তখনও তাঁহারা কৃতনিশ্চয় হয়েন নাই। করেন কি? রাত্রি দুই প্রহরের সময় ছদ্মবেশে চৈতন্যের নিকট গেলেন, অনেক দৈন্য প্রকাশ করিলেন, কিন্তু অবশেষ সনাতন প্রভুকে কিছু মিষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া শীঘ্র রাজধানী হইতে পলায়ন করিতে পরামর্শ দিলেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহাতে চৈতন্য সনাতনকে বলিতেছেন,

"গৌড় নিকটে আসিতে নাহি প্রয়োজন,
"তোমা দোঁহা দেখিতে মোর ইহাঁ আগমন।
"এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে
"সবে বলে কেন আইলা রামকেলি গ্রামে?"

চৈতন্য নিশ্চয়ই অতি সরল-হৃদয় লোক ছিলেন, মনে যাহা হইত, তাহাই করিয়া ফেলিতেন, বড় ভাল মন্দ ভাবিতেন না। তিনি এইরূপ ভাল মন্দ না ভাবিয়াই গৌড়ে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার বৈষ্ণবেরা তখন তাঁহাকে এখানে কেন আইলা বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন। রূপসনাতনের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি কহিলেন "দেখ আমার অনুচরেরা আমাকে তিরস্কার করিতেছে, আমার কেবল তোমাদের দুই জনের জন্যই এখানে আসা।" পরে দবীরখাস-মহাশয় অর্থাৎ সনাতন প্রভুকে বিদায় দিবার সময় বলিতে লাগিলেন ;—

"ইহাঁ হইতে চল প্রভু ইহাঁ নাহি কাজ,
"যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ।
"তথাপি যবন জাতি না করি প্রতীতি,
"তীর্থ যাত্রায় এত সংঘট্ট ভাল নহে রীতি।
"যার সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষ কোটি,
"বৃন্দাবন যাবার এ নহে পরিপাটি।
"যদ্যপি বস্তুত প্রভু কিছু নাহি ভয়,
"তথাপি লৌকিক লীলা লোকচেষ্টাময়।
"এত বলি চরণ বন্দি গেলা দুই জন,
"প্রভুর সেই গ্রাম হইতে চলিতে হইল মন।"

চৈতন্য এত বলিলেন, তোমাদের দুই জনার জন্যেই আমি বাঘের-মুখে মাথা দিয়াছি, তথাচ রূপসনাতন বৈষ্ণব হইলেন না, এমন কি, প্রকাশ্য ভাবে চৈতন্যের সহিত দেখা পর্য্যন্ত করিলেন না। রাত্রিতে গোপনে গিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া যাউন বলিয়া তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিয়া আসিলেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ হুসেন সাহার মুখে চৈতন্যের কিছু গুণানুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা নিতান্ত খাপছাড়া হইয়াছে। বস্তুত হুসেন সাহার নিকট চৈতন্যের কিছুমাত্র সমাদরের সম্ভাবনা বা প্রত্যাশা ছিল না, বরং নিগ্রহের সম্ভাবনা ছিল, তাহা কেশব ছত্রির ব্যবহারে জানা যায়।

অবশেষে যখন রাজদণ্ডের ভয়ে দুই ভ্রাতা গৌড় পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন, তখন তাঁহারা চৈতন্যের সমাজভুক্ত বৈরাগী হইলেন। ভগ্নাঃ ক্রমের্ভাগবতা ভবন্তি—রূপসনাতন ইহারই উদাহরণ! জীবনের এই শেষ দশায় তাঁহারা ভক্ত বলিয়া বিখ্যাত

হইয়াছিলেন। চৈতন্যের পরামর্শ অনুসারে তাঁহারা অধিক সময় বৃন্দাবনে থাকিতেন, মধ্যে মধ্যে শ্রীক্ষেত্রে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। চৈতন্যের অন্যান্য অনুচরের ন্যায়, বৌদ্ধরীতি অনুসারে, ভিক্ষান্ন দ্বারা তাঁহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। আপনাদের পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া তাঁহারা ঘোর অনুতাপ করিতেন, এমন কি, এক সময়ে সনাতন আত্মহত্যারও প্রস্তাব করেন কিন্তু মহাপ্রভু তাঁহাকে নিবারণ করেন। তাহাদের কীর্ত্তির মধ্যে শুনা যায় যে, তাঁহারা বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থের আবিষ্কার করেন। আর দুই ভ্রাতা ভক্তি শাস্ত্রীয় কিছু কিছু গ্রন্থও লেখেন, কিন্তু বৈষ্ণব সমাজের বাহিরে সে গ্রন্থের বিশেষ প্রতিপত্তি নাই। তবে রূপের সংস্কৃত রচনা স্থানে স্থানে মধুর বলিয়া বোধ হয়। বৈষ্ণবদের বৃন্দাবন এক বড় বিচিত্র জিনিস, কখনও তাহা আধ্যাত্মিক পদার্থ, আবার কখনও তাহা ইন্দ্রিয় ভোগের স্থান। মহাপ্রভুর রামানন্দ রায়ের সহিত যে রূপ কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাতে জা- যায়, বৃন্দাবন পৃথিবীর দেশ বিশেষ নহে। সুতরাং বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থের আবিষ্কারের কোনও অর্থ নাই। সনাতন যদি পৃথিবীর কোনও স্থানকে বৃন্দাবন বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, এ মনে হয়, তবে তিনি মহাপ্রভুর বৈষ্ণব ধর্ম্মের মর্ম্মই বুঝেন নাই।

ফলতঃ রূপসনাতনের জীবনে অনুকরণীয় কিছুই নাই। তাঁহারা উভয়েই জীবন যাত্রার পথহারা পথিক। উভয়েরই গতি সরল পথ ছাড়িয়া কুটিল ভাব ধারণ করিয়াছিল। ধর্ম্ম বিরুদ্ধ অর্থ কামের সেবাই তাঁহাদের সরল পন্থা, তাহার এক দিকে পাপের পঙ্ক, অন্য দিকে বৈরাগ্যের মরু। তাঁহাদের জীবনের এক ভাগ সেই পঙ্কে, অপর ভাগ সেই মরুতে যাপিত হয়। তবে যদিও তাঁহারা আমাদের অনুকরণের যোগ্য না হয়েন, তথাচ আমাদের শিক্ষার স্থান বটেন। লোভ পরতন্ত্র হইয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে কি বিষময় ফল ফলে, মনুষ্য কিরূপ হতোভ্রষ্ট স্ততোনষ্ট হয়, তাহা এই দুই ভ্রাতার জীবনে দেখা যায়।

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

সুখী।

১

ভেবনা "অভাগা" মোরে
ভেবনা "জনম দুখী"
আমার সুখের কথা
শুন আজি বিধুমুখি।

২

চিরদিন পথে পথে
ফিরিয়াছি শ্রান্ত দেহ,
চাহেনি মুখের পানে
নিকটে ডাকেনি কেহ,

৩

একেলা, ফেলেছি অশ্রু
মুছেছি সে আঁখি জল,
নাহিতে তপত শ্বাস
ফিরেনি রে ধরাতল।

৪

চাঁদেতে ছিল না সুধা
উষাতে ছিল না হাসি,
ছিল না, ফুলেতে শোভা
সঙ্গীতে অমিয়া রাশি।

৫

হৃদয়ে ছিল না টান
মরমে ছিল না আশা,
ছিল না আমার তরে
এক ফোঁটা ভালবাসা!

৬

দাঁড়া'তে মিলেনি ঠাঁই,
কাঁদিতে মিলেনি বন,
মিলেনি ব্যথার ব্যথী
ধরাতলে একজন!

৭

অনাথ ভিখারী হেন
ফিরিয়াছি দো'রে দো'রে,
একটু আদরে কেউ,
নিকটে ডাকেনি মোরে!—

৮

সেধে সেধে কাছে গেছি
প্রাণ বিকাইব বলে,
নিঠুর সংসার হায়,
চরণে দিয়েছে দলে!

৯

কি দারুণ সে আঘাত
কি যে হৃদি চুরমার,
কি বেদনা কি যাতনা,
নহে তা তো কহিবার!

১০

এমনি অভাগা দেখি
তুমি ত্রিদিবের বালা,
সাধিয়া লইলে কাছে
আঁচলে মুছাযে জ্বালা!

১১

সে শুভ মাহেন্দ্র যোগ
জীবনে রয়েছে লেখা—
মানসে দেবতা-পূজা
স্বপনে স্বরগ-দেখা!

১২

শুকানো পরাণ মম
অই স্নেহ ধারা পেয়ে,
বরিষার দূর্ব্বা সম
আবার উঠিল ছেয়ে!

১৩

তোমার মমতা, দয়া,
তোমার সোহাগ, প্রীতি,
এ বুকে, নীরবে দিল
জাগায়ে অমৃত-স্মৃতি!

১৪

অনন্ত অভাব মম
মুহূর্ত্তে পূরিয়া গেল,
শূন্য বুকে, মৃত বুকে
অমর জীবন এল!

১৫

ভ'রে গেল সারা ধরা,
পূরে গেল প্রাণ মন,
সে হ'তে হলেম আমি
সংসারের "একজন"।

* *

১৬

আজি যদি ঠাঁই মোর
নাহি থাকে ধরাতলে,
আমারে জগত যদি
শত পদাঘাতে দলে,

১৭

সুখ-সাধ সুখ-আশা
হয় যদি অবসান,
শ্মশানে মিশিয়া যায়,
সে পূরবী বীণাতান,

১৮

তবু,ও' অমর-গাথা
এ পরাণ জুড়ি' রবে
তাতেই মরমে মম
অমৃত তুফান ব'বে!

১৯

জপিয়া তোমারি নাম
আনন্দে সকলি স'ব,
দেখেছি যে প্রেমময়ী,
তাই পূজি সুখী হ'ব!

২০

এ বুকে, ও পূত গন্ধ
উথলিবে যত বার,
ততই হইব আমি
জগতের "আপনার"

২১

কেন "ভাগ্যবান" আমি,
কেন আমি "চিরসুখী"
সে সুখের ইতিহাস
শুনিলে তো বিধুমুখি?

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

বৌদ্ধ-সঙ্ঘ।

ভিক্ষুণী সঙ্ঘ।

কথিত আছে, মাতৃষসা বিমাতা এবং পালয়িত্রী মহাপ্রজাপতির একান্ত অনুরোধে বুদ্ধদেব ভিক্ষুণীসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মহাপ্রজাপতি তিনবার পুত্রের নিকট উপসম্পদা প্রার্থনা করেন, তিনবার প্রত্যাখ্যাত হন। তখন তিনি মস্তক মুণ্ডন ও গৈরিক পরিধান করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আনন্দের নিকট উপস্থিত হন। আনন্দ, প্রতিপালক, সেবক, সখা ও শিষ্য—বিশেষ পীড়াপীড়ি করিলে গৌতম অনিচ্ছাক্রমে সম্মত হন। ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর ব্রত কোমল-হৃদয় কামিনীগণের সাধ্যায়ত্ত কি না, সে বিষয়ে তাঁহার সংশয় ছিল না। কিন্তু ভারতবর্ষে মহিলাগণকে কখনও স্বতন্ত্রতা দেওয়া হয় নাই। বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর, অতি বৃদ্ধ হইলেও জননী পুত্রের অনুষায়িনী। কামিনী ও কাঞ্চনের মধ্যে, বুদ্ধ কাঞ্চন অপেক্ষা কামিনীকে অধিক ভয় করিতেন। "মস্তক-শূন্য মনুষ্য কেবল দেহ লইয়া যেমন জীবিত থাকিতে পারে না, স্ত্রীসংসর্গী তেমনি ভিক্ষু হইতে পারে না।" "শুষ্ক-পত্র বৃক্ষচ্যুত হইলে যেমন পুনরায় হরিদ্বর্ণ হয় না—কাঞ্চনকামী তেমনি ভিক্ষু হইতে পারে না।"

বুদ্ধ শিষ্যগণকে বার বার বলিতেন, স্ত্রীলোকের মুখপানে তাকাইও না। সঙ্ঘমধ্যে নারীগণকে আশ্রয় দিয়া গৌতম ভিক্ষুগণের নিপাতের পথ নির্ব্বিঘ্ন করিয়া দিতে বিমুখ হইবেন, সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বিনয়সূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রব্রজ্যাপ্রার্থী ব্রহ্মচারীকে পরীক্ষা সময়ে, অন্যান্য প্রশ্নের সময়, ইহাও জিজ্ঞাসা করা হইত যে, তিনি পুরুষ কি না। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, যখন বৌদ্ধসঙ্ঘের সূচনা হয়, তখন গৌতম ভিক্ষুণীসঙ্ঘের কল্পনা করেন নাই। এবং ভিক্ষুণী সঙ্ঘ ভিক্ষুসঙ্ঘের পরে গঠিত হইয়াছিল। বিনয়সূত্রে গৌতম কর্তৃক ভিক্ষুণী সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু আমার অনুমান হয়, ভিক্ষুণীসঙ্ঘ গৌতমের পরবর্ত্তী। ভিক্ষুণীসঙ্ঘের প্রাচীনতা প্রতিপাদনের জন্য গৌতমের ভিক্ষুণী প্রতিষ্ঠা আরোপিত হইয়াছে। সে যাহা হউক, ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সঙ্ঘ একত্রে উভতো সঙ্ঘ নামে উল্লিখিত হইলেও, উভয় সঙ্ঘের নামে প্রদত্ত উপহারে ভিক্ষুণী সঙ্ঘের অর্দ্ধেক অধিকার

থাকিলেও, বস্তুতঃ ভিক্ষুণীসঙ্ঘ সর্ব্ব বিষয়ে ভিক্ষুসঙ্ঘের আদেশানুবর্ত্তী, হিন্দু সমাজের অস্বাতন্ত্রতা বৌদ্ধসঙ্ঘে গৌতম আরও সঙ্কুচিত করিয়াছিলেন। মালতীমাধব প্রভৃতি নাটকে ভিক্ষুণীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। স্থবিরা গাথা বা থেরীগাথা গ্রন্থে ভিক্ষুণীর আত্মপরিচয়ে যে আশা ভরসার চিত্র দেখা যায়, তাহাঁতে স্পষ্ট বোধ হয়, গৌতমের আশঙ্কা অমূলক প্রতিপাদিত হইয়াছিল। সংযম সাধনে ভিক্ষুণী ভিক্ষুর সম্পূর্ণ সমকক্ষতা করিয়াছিলেন। এবং ব্যভিচারে বৌদ্ধসঙ্ঘ কখন কলুষিত হয় নাই। কিন্তু গণনায় ভিক্ষুণী সংখ্যা কখন ভিক্ষু সংখ্যার সমতুল্য হয় নাই। চরিত্রের কোমলতা, মধুরতা ও পবিত্রতায় কলুষচরিত্র উচ্ছৃলিত বারাঙ্গনাও ভিক্ষুণীর সমক্ষে তটস্থ, সঙ্কুচিত ও ভীত হইয়া তাঁহার পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। তথাপি ভিক্ষুণীসঙ্ঘ চিরদিন ভিক্ষুসঙ্ঘের অভিভাবকতায় পরিচালিত হইয়াছে।

১। শত বৎসর পূর্ব্বে উপসম্পদা গ্রহণ করিয়া থাকিলেও সদ্যোপসম্পন্ন ভিক্ষুকেও তিনি যথোচিত সম্মান করিবেন, তাঁহাকে ভক্তির সহিত অভিবাদন করিবেন, তাঁহার সমক্ষে করযোড়ে দণ্ডায়মান থাকিবেন। আজীবন তিনি ভক্তির সহিত এই আদেশ পালন করিবেন।

২। বর্ষার তিন মাস (চাতুর্ম্মাস্য) তিনি একাকিনী কোথায়ও থাকিবেন না। যেখানে ভিক্ষুগণ বর্ষাপাত করিবেন, তিনিও সেইখানেই কিন্তু অন্য গৃহে থাকিবেন।

৩। অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় ভিক্ষুণীগণ একজন প্রতিনিধিকে পাঠাইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘে উপসোথ ও বিনয় প্রার্থনা করিবেন। ভিক্ষুণীগণের পাতিমোক্ষ কিছু স্বতন্ত্র। উহার নাম ভিক্ষুণী পাতিমোক্ষ। ভিক্ষুণীদিগকে পাতিমোক্ষ পাঠ শিখাইতে এবং অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিতে ভিক্ষুগণ আদিষ্ট হইয়াছেন।

৪। চাতুর্ম্মাস্য অতীত হইলে বিদায়ের পূর্ব্বে ভিক্ষুণীগণ পরস্পরের নিকট পবারণা প্রার্থনা করিবেন। তদনন্তর প্রতিনিধি দ্বারা ভিক্ষুগণের নিকট পবারণা প্রার্থনা করিবেন। প্রতিনিধি ভিক্ষুসঙ্ঘে উপস্থিত হইয়া সমবেত ভিক্ষুগণের নিকট তিনবার প্রার্থনা করিবেন, একসঙ্গে থাকিবার সময় যদি কোন ভিক্ষুণীর কোন অপরাধ দৃষ্ট, শ্রুত বা সন্দিগ্ধ হইয়া থাকে, তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা দেখাইয়া দিবেন। ভিক্ষুগণ ভিক্ষুণীদিগের নিকট পবারণা প্রার্থনা করেন না।

৫। গুরুতর বা পারাজিক, কি সঙ্ঘাতিশেষ অপরাধে অপরাধিনী ভিক্ষুণীকে উভতোসঙ্ঘের সমক্ষে মানত্ত করিতে হয়।

৬। প্রব্রজ্যা গ্রহণের দুই বৎসর পরে এবং "ছসু ধর্ম্মেসু" বিনীত হইয়া থাকিলে প্রব্রাজিতা উভতো সঙ্ঘের অনুমতিক্রমে উপসম্পদা গ্রহণে অধিকারিণী হন। কেবল ভিক্ষুণী সঙ্ঘের সমক্ষে উপসম্পদা গ্রহণ করিলে কেহ উপসম্পন্না বলিয়া পরিগণিত হন না। প্রব্রজ্যা গ্রহণের সময় প্রব্রাজিতাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হয় ;—(১) তিনি কোন প্রাণীকে হিংসা করিবেন না। (২) চুরি করিবেন না। (৩) ব্যভিচার করিবেন না। (৪) মিথ্যা কথা বলিবেন না। (৫) মাদক সেবন করিবেন না এবং (৬) বিকাল ভোজন করিবেন না। ইহারই নাম ষড়্‌ধর্ম্ম। প্রব্রাজিতের উপসম্পদা গ্রহণ উপধ্যায় প্রস্তাব করেন, কিন্তু প্রব্রাজিতার উপসম্পদা কোন ভিক্ষুণীকে প্রস্তাব করিতে হয়। তাঁহার নাম প্রবর্ত্তিনী। ভিক্ষুদিগের তিন

খানি বস্ত্র। কিন্তু ভিক্ষুণীদিগকে একখানি স্নানবস্ত্র উদক সাটিকা ও একটী সংকচ্ছিকম্ কঞ্চুলিকা ব্যবহার করিতে দেওয়া হইত।

৭। কোনও কারণে ভিক্ষুকে নিন্দা বা তিরস্কার করিবার অধিকার ভিক্ষুণীর নাই।

৮। উপসম্পদা গ্রহণের দিন হইতে আজীবন ভিক্ষুর বিরুদ্ধে বচন-পথ ভিক্ষুণীর আবদ্ধ। কিন্তু ভিক্ষুণীর বিরুদ্ধে নিন্দা বা অভিযোগের অধিকার ভিক্ষুর সম্পূর্ণ আছে।

পাতিমোক্ষ ও বিনয় শ্রবণের জন্য ভিক্ষুণী-দিগকে আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইতে হয়। আচার্য্য একাকী পাতিমোক্ষ পাঠ শিখাইতে পারেন না। আর একজন উপাধ্যায় তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকে। নির্দ্দিষ্ট স্থানে আচার্য্য উপাধ্যায় সঙ্গে পূর্ব্বেই উপবিষ্ট হন। ভিক্ষুণীগণ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পুরঃসর তাঁহার আদেশক্রমে তাঁহার সম্মুখে উপাবিষ্ট হইলে আচার্য্য এই অষ্টগরু ধর্ম্মা পাঠ করেন এবং ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যা উপলক্ষে তিনি কোন জাতকের কথা উল্লেখ করিয়া বা অন্য প্রকারে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দেন এবং তাহাদের অপরাধ স্বীকার গ্রহণ করেন।

বিশেষ কারণ না থাকিলে আচার্য্যেরও অধিকার নাই, ভিক্ষুণী বিহারে প্রবেশ করেন। কোন ভিক্ষুণী সাঙ্ঘাতিক পীড়িত হইলে এবং আচার্য্যের ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেই আচার্য্য ভিক্ষুণী বিহারে প্রবেশ করিতে পারেন। ভিক্ষুণী সঙ্গে পাদচারণা করিতে, তাঁহার সঙ্গে এক নৌকায় চড়িয়া দূরদেশে যাইতে, নির্জ্জনে তাঁহার নিকট বসিতে ভিক্ষুর বিশেষ নিষেধ। নির্জ্জনবাস ভিক্ষুর জন্য উপযোগী বলিয়া বিহিত হইয়াছে। নির্জ্জনবাস ভিক্ষুণীর জন্য বিধান করা হয় নাই। বনবাস তাঁহার নিষিদ্ধ। ভিক্ষু নগর প্রান্তে বাস করিবেন, ভিক্ষুণী নগর মধ্যে দ্বার বিশিষ্ট গৃহে দুই বা ততোধিক ভিক্ষুণী সঙ্গে বাস করিবেন। একাকিনী বাস করিবার তাঁহার অধিকার নাই।

আনন্দের অনুরোধে গৌতম ভিক্ষুণী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠা করিবার পরে গৌতম আনন্দকে বলিয়াছিলেন,—

"আনন্দ! মহিলাগণকে গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রাজিতা হইতে যদি অনুমতি না দিতাম, তবে তথাগতের বিমল ধর্ম্ম জগতে চিরকাল প্রচারিত থাকিত—ভিক্ষুণী সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করিয়া আমি সেই বিমল ধর্ম্মের জীবন মাত্রা অর্দ্ধেক সঙ্কুচিত করিয়াছি, অতঃপর পাঁচশত বৎসরের অধিক সে নির্ব্বাণপ্রদ বিমল সত্য ভারতে প্রতিভাত হইবে না। যে গৃহে পুরুষের সংখ্যা মুষ্টিমেয়, রমণীর সংখ্যা অধিক, চোর ও দস্যুগণ সে গৃহে অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে। যে ধর্ম্ম নারীগণকে সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসিনী করে, সে ধর্ম্ম অধিক দিন স্থায়ী হয় না। শস্যপূর্ণ হরিদক্ষেত্রে কীট সঞ্চার হইলে ক্ষেত্র অবিলম্বে শস্যশূন্য হয়। যে ধর্ম্মে রমণীগণকে সংসার ছাড়িয়া বিরাগিনী করে, সে ধর্ম্ম অধিক দিন স্থায়ী হয় না। শোভন ইক্ষুক্ষেত্রে কীটসঞ্চার হইলে অনতিবিলম্বে ক্ষেত্র বিনাশ হয়। যে ধর্ম্মে রমণীগণকে সংসার ছাড়িয়া পান্থবাসিনী করে, সে ধর্ম্ম অধিক দিন স্থায়ী হয় না। উদ্বেল তরঙ্গিণীর উপদ্রব নিবারণ হেতু লোকে বন্ধনী প্রস্তুত করে, আমিও পূর্ব্ব হইতে এই অষ্টগুরু ধর্ম্ম বন্ধন করিলাম।"

চুল্লবর্গে লিখিত হইয়াছে, আনন্দ এই অষ্টবিধি মহাপ্রজাপতিকে নিবেদন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন,—

"আনন্দ, অলঙ্কারপ্রিয় যুবক ও যুবতীগণ কমলমালা, মালতীমালা বা অতিমুক্ত কুসুম মঞ্জরী পাইলে দুই হস্তে ধরিয়া যত্নে যেমন শিরোধার্য্য করে—তথাগতের অষ্ট সদ্বিধান আমি তেমনি সমাদরে শিরোধার্য্য করিলাম।"

ভিক্ষুণীদিগের মধ্যে মহাপ্রজাপতি, উৎপলবর্ণা, নন্দা অম্বপালী পতাচার এবং রাজকুমারী সুমেধা ও সঙ্ঘমিত্রা সুবিখ্যাত। অশোকের রাজ্যকালে ভিক্ষুণীসঙ্ঘের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। বৈরাট গিরিশাসনে অশোক ভিক্ষুণীসঙ্ঘের উল্লেখ করিয়াছেন। "ভিক্ষুপা যেচ ভিক্ষুণী যেচ অভিক্ষুণায় সুনয়ুচা উপধালিয়ে য়ুচ হেৱমেব উপাসকা চ উপাসিকা চ এতোম্ভুভন্তে ইমাম লিখাপিয়ামি অভিপেতি মে জানন্তিতি।" কিন্তু কি ভারতবর্ষে, কি সিংহলে ভিক্ষুণী সঙ্ঘে রমণীগণকে সংগ্রহ করিতে, গৃহত্যাগিনী করিতে, কখন উৎসাহ দেওয়া হয় নাই। সিংহলে এখন আর একটীও ভিক্ষুণী দেখা যায় না। ব্রহ্মদেশে এখনও বিস্তর ভিক্ষুণী দেখা যায়।

তথাগত সমুদ্রের সহিত সঙ্ঘের তুলনা করিতেন। সমুদ্রের আটটী গুণ আছে। (১) সমুদ্রের গভীরতা —গভীর হইতে গভীরতম হইয়া শেষে অতল হইয়াছে। বৌদ্ধসঙ্ঘে ধ্যান, ধারণা, ও সমাধিও গভীর হইতে গভীরতর, ক্রমে অতলস্পর্শ প্রজ্ঞা সমাগত হইয়াছে। (২) গোদাবরী বা আশীবরতী সিন্ধু বা কাবেরী সমুদ্রে সমাগত হইলে সকলেই আপনার বিশেষত্ব হারাইয়া সমুদ্রের নীলজলে পরিণত হয়। ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র তথাগতের সঙ্গমে উপস্থিত হইলে সকলেরই ব্যক্তিত্ব ঘুচিয়া যায়, নাম জাতি হারাইয়া সকলেই "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ" নামে অভিহিত হন। (৩) সমুদ্র মৃতদেহ পোষণ করে না—তরঙ্গের পর তরঙ্গ তাড়নায় মৃতদেহ তটোৎক্ষিপ্ত হইয়া সমুদ্রের পবিত্রতা কলঙ্কমুক্ত করে। ব্যভিচারীও প্রবৃত্তিপরায়ণ বৌদ্ধসঙ্ঘে আশয়লাভ করে না, তাড়নার পর তাড়নায় সঙ্ঘ পরিত্যাগ করিয়া সংসারে বা অন্য মণ্ডলীতে শরণ গ্রহণ করে। (৪) বাত্যাপীড়িত হইলেও সমুদ্র বেলাভূমি অতিক্রম করে না, তাহার ধীরতা ও গাম্ভীর্য্য এতই প্রবল। সহস্র বাধা বিপত্তিসত্বে ভিক্ষু তথাগতের বিনয়সূত্র কখন অতিক্রম করেন না। (৫) সমুদ্রের সকল অংশে একই স্বাদ—লবণতা। সকল ভিক্ষুর একই সাধনা—নির্ব্বাণ লাভ। (৬) সহস্র নদীর জলপ্রপাতে বা বরষার অযুত ধারায় সমুদ্রের বৃদ্ধি নাই—মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড দহনে বা কোটী কলস আকর্ষণে সমুদ্রের হ্রাস নাই। সহস্র ভিক্ষুসঙ্ঘে আশ্রয় লইলে বা অযুতজনে পরিত্যাগ করিলে সঙ্ঘের হ্রাসবৃদ্ধি লক্ষিত হয় না। (৭) মণি মুক্তা প্লক্ষ ও মরকতে মহোদধি পরিপূর্ণ। ধর্ম্ম ও সূত্র, চতুরিদ্ধি পঞ্চশীল ও অষ্ট সন্মার্গে বৌদ্ধসঙ্ঘ উজ্জ্বলিত। (৮) তিমি, তিমিঙ্গিল, নাগ অসুর ও গন্ধর্ব্ব শত সহস্র মহাবল জীব সমুদ্রে সঞ্চরমান—তথাগতের বৌদ্ধসঙ্ঘে শ্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হতগণ সেইরূপ নিত্য বিদ্যমান। ইঁহাদের তেজস্বিতার পরিধি নাই।

তথাগতের অকুপার সমান বৌদ্ধসঙ্ঘের আজ চিহ্নমাত্র ভারতে নাই। যে বৌদ্ধধর্ম্ম জগতে ভারতের নাম প্রথম ঘোষণা করিয়াছিল—আজি ভারত হইতে তাহা নির্ব্বাসিত। প্রাচীন জীবের কঙ্কালাবশেষ অনুসন্ধান করিতে আবিসিনিয়ার ভূগর্ভে ডো ডো ও আমেরিকার ভূস্তরে মামথের অনুসন্ধান করিতে হয়—তথাগতের তিমি তিমিঙ্গলের কঙ্কালাবশেষ সন্ধানে সিংহলের তালবনে, চীনের প্রাচীর পার্শ্বে বা তিব্বতের গিরিগুহায় আজ আমাদিগকে অনুসন্ধান করিতে হইতেছে।

আনন্দের অনুরোধে গৌতম ভিক্ষুণীসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এজন্য ভিক্ষুণীগণ চিরদিন সসম্মানে আনন্দের নামে কৃতজ্ঞতা উপহার দিয়াছেন। বিশিষ্ট বৌদ্ধমঠে সারিপুত্র, মৌদ্গল্যায়ণ ও আনন্দের মঠ প্রতিষ্ঠিত হইত। ফাহিয়ান বলেন, ভিক্ষুণীগণ আনন্দমঠ ও শ্রমণের গণ রাহুল মঠের বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। ফাহিয়ানের সমগ্র ভ্রমণ বৃত্তান্তে ভিক্ষুণী সঙ্ঘ সম্বন্ধে আর কোন উল্লেখ নাই। মঠে কোথায় কতশত বা সহস্র ভিক্ষু বাস করিত, তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু সিংহলে কি ভারতবর্ষে তিনি কোথায় কত ভিক্ষুণী দেখিয়াছিলেন বা তাহাদের আচার ব্যবহার কিরূপ, সে সম্বন্ধে একটি কথাও বলেন নাই। ফাহিয়ান খ্রীষ্টের পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহার দুইশত বৎসর পরে হুয়েনসাঙ্ এদেশে আসেন। তিনি বহুদিন ভারতবর্ষে বাস করিয়াছিলেন। ভারতের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সকল খণ্ডে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগেরও মত বিশ্বাস আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বৃহৎ ভ্রমণ বৃত্তান্তে ভিক্ষুণীদিগের একবার উল্লেখও করেন নাই। বোধ হয় ফাহিয়ান ও হুয়েনসাঙের পূর্ব্ব হইতেই ভিক্ষুণীসঙ্ঘ ভারতবর্ষ হইতে তিরোহিত হইয়াছিল। দু চারিটী ভিক্ষুণী কোথাও থাকিলেও ভিক্ষুণীসঙ্ঘের তখন অস্তিত্ব ছিল না। ভিক্ষুণী সমিতি আর্য্যপ্রকৃতির অননুমোদিত, গৌতম অনিচ্ছায় তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অশোকবর্দ্ধনের রাজত্বকালে তাহা উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করে। তার পর ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম যত তান্ত্রিক ধর্ম্মে বিকৃত হইতে আরম্ভ করিল, শুদ্ধাচারিণী ভিক্ষুণীগণ ভারতভূমি হইতে ক্রমে অন্তর্দ্ধান করিলেন। হুয়েনসাঙ্ বিশাখা ও প্রজাপতির মঠগুলি ভগ্নাবস্থায় দেখিতে পাইয়াছিলেন। দীপবংশে লিখিত হইয়াছে যে, অশোকবর্দ্ধনের রাজত্বকালে বৌদ্ধসঙ্ঘে অশিতিকোটি ভিক্ষু ও ষড়নবতি সহস্র ভিক্ষুণী বাস করিত। সংখ্যা যতই হউক, অশোকের সময়ে যে ভিক্ষুণী সঙ্ঘ শ্রীবৃদ্ধির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্ররায়।

আকাশের খুকী।

আকাশের খুকী,
এ মেঘের কোল থেকে, ও মেঘের কোলে যায়,
লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া হইয়ে কৌতুকী!
কোলে কোলে করে খেলা, শাওণে সায়াহ্ন বেলা,
এই দেখি এই নাই এই মারে উঁকি!
হাসিয়া ভৈরব রবে, বাখানে জলদ সবে,
করতালি শু'নে উঠে ধরণী চমকি!
আমি ও চপলা মেয়ে, বড় সাধে দেখি চেয়ে,
জলদের "বাহবায়" আমি বড় সুখী!
আমারো পরাণ নাচে, যাইতে ওদের কাছে,
আমারো আছিল এক মেয়ে সোণামুখী!
আমি বড় ভালবাসি আকাশের খুকী!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

ঐতিহাসিক মীমাংসা। (২)

যুধিষ্ঠিরের কাল নির্ণয় করিতে আমি পৌরাণিক মতই প্রশস্ত বোধ করিয়াছিলাম। কেন না, পুরাণে পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের অভিষেক পর্য্যন্ত যত বৎসর অতীত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা ধরিয়া দেওয়া আছে। যদিও পরীক্ষিতের বংশধরগণ হস্তিনা বা কৌশাম্বীতে কত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা প্রদত্ত হয় নাই, তথাপি যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক মগধরাজ জরাসন্ধের বংশধরগণের রাজ্যকাল নির্দ্দিষ্ট থাকায় সে অভাব দূরীভূত হইয়াছে। জরাসন্ধ ও তাঁহার পরবর্ত্তী ভূপতিগণ বংশপিতা বৃহদ্রথের নামানুসারে বার্হদ্রথ নামে খ্যাত। ভারতযুদ্ধের পরবর্ত্তী বার্হদ্রথ রাজগণ মগধে কত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে তাহা স্থির করা আবশ্যক হইয়াছিল। এজন্য পুরাণবিশেষ অবলম্বন করিয়া আমি বলিয়াছিলাম যে, জরাসন্ধের পৌত্র সোমাপি রাজার পরবর্ত্তী ভূপালগণের রাজ্যভোগকাল ছয় শত বৎসরের অধিক হইবে না। কিন্তু দেখিতেছি, শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় আমার মতটী "পুরাণবিরুদ্ধ" বলিয়া অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, মৎস্য, বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি পুরাণের সাহায্যে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, সোমাপি হইতে বৃহদ্রথ বংশীয় রাজগণ মগধে "সহস্র বা হাজার খানেক" বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি যে সকল প্রমাণের সাহায্য লইয়াছেন, সেগুলি আলোচনা করিবার অগ্রে যে শ্লোকটী লইয়া বিবাদ, তৎসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। শ্লোকটী এই—

যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্ বর্ষ সহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরং॥ ৩২।২৪।৪। বিঃ পুঃ

ইহার চির প্রচলিত অর্থ এই যে "পরীক্ষিতের জন্ম অবধি নন্দের রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত (১০১৫) এক সহস্র পঞ্চদশ বৎসর গত হইয়াছিল।"

পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় এই অর্থ গ্রহণ করেন নাই। তর্করত্ন মহাশয় বলিয়াছিলেন—

"এই বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চদশোত্তরং" "এই স্থানের 'পঞ্চদশ' শব্দটী একশেষ সিদ্ধ বলিতে হয়। যেমন 'ঘটৌ' বলিলে দুইটী ঘট বুঝায়, 'ঘটাঃ' বলিলে বহু ঘট বুঝায়, তদ্রূপ উক্ত পঞ্চদশ কথাটী বহু পঞ্চদশের অর্থাৎ চতুস্ত্রিংশ গুণিত পঞ্চদশের বোধক বলিয়া বোধ হয়। ১৫কে ৩৪ দ্বারা গুণ করিলে ৫১০ই হইয়া থাকে। অথবা উক্ত শ্লোকে লিপিকর প্রমাদ বশতঃ (শতং) স্থলে (জ্ঞেয়ং) হইয়াছে। এইরূপে একটু কষ্ট কল্পনা করিতেই হয়।"

তর্করত্ন মহাশয়ের সহিত "নন্দ ও যুধিষ্ঠিরের অন্তরকাল সম্বন্ধে" দেউস্কর মহাশয়ের কোন মতভেদ ছিল না; এবং এখনও নাই। তবে দেউস্কর মহাশয় এবার একটু সন্দিগ্ধ ভাবে বলিয়াছেন "জ্ঞেয়ং পঞ্চ শতোত্তরং" স্থানে লিপিকরপ্রমাদবশতঃ—

"জ্ঞেয়ং পঞ্চ দশোত্তরং" হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। বিশিষ্ট কারণ ব্যতিরেকে বিষ্ণুপুরাণের একটা সমগ্র অধ্যায়কে (যে অধ্যায়ে জরাসন্ধের পরবর্ত্তী নৃপতি সমূহের নাম কীর্ত্তিত ও অবস্থিতিকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে) ভ্রমপূর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা অপেক্ষা একটী শ্লোকের অন্তর্গত একটী পদকে লিপিকর প্রমাদ-জনিত অশুদ্ধ মনে করা আমি অধিক দোষাবহ মনে করি না।"

বিষ্ণুপুরাণের উক্ত অধ্যায় (৪র্থ অংশের ২৩ অধ্যায়) সম্বন্ধে তিনি বলেন,—

"বিষ্ণুপুরাণের এই অধ্যায়ে বৃহদ্রথ বংশীয় যে ভবিষ্যৎ ভূপালগণের কথা বলা হইয়াছে, জরাসন্ধ পৌত্র সোমাপি তাহাদের প্রথম। তার পর এই অধ্যায়ের উপসংহার এইরূপ করা হইয়াছে। এই বার্হদ্রথ নৃপতিগণ এক সহস্র বর্ষ রাজত্ব করিবেন। * * * *।

বিষ্ণুপুরাণকারের মতে বৃহদ্রথ বংশীয়গণের স্থিতিকাল সহস্র বৎসর নহে—উক্ত বংশের ভবিষ্যৎ অর্থাৎ জরাসন্ধপুত্র সহদেবের পরবর্ত্তী নৃপতিগণেরই রাজ্যকালের সমষ্টি সহস্র বৎসর। কেন না, এই অধ্যায়ে কেবল "ভবিষ্যৎ" নরপতিগণের কথাই বলা হইয়াছে।"

প্রথমতঃ, ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণের সাহায্য লইয়া দেউস্কর মহাশয় পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকের প্রামাণিকত্ব খণ্ডন করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, মৎস্য, বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ হইতে, সোমাপি হইতে রিপুঞ্জয় পর্য্যন্ত বার্হদ্রথ রাজগণের বংশ তালিকা ও রাজ্যকাল উদ্ধৃত করিয়াছেন। এবং মৎস্যপুরাণ মতে ৯৩৫, বায়ু মতে ৯২১, ব্রহ্মাণ্ড মতে ৮৮১ বৎসর—উক্ত "ভবিষ্যৎ" রাজগণের রাজ্যভোগ কালের ঐ তিনটী সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন; কিন্তু তিনি প্রধানতঃ ঐ তিনটী সংখ্যার উপর নির্ভর করিয়াছেন।

এক্ষণে আমরা দেউস্কর মহাশয়ের প্রধান যুক্তির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। বিবাদাস্পদীভূত শ্লোকে লিপিকর প্রমাদ ঘটিয়াছে কি না, তাহাই দেখা যাউক। দেউস্কর মহাশয় যেরূপ পুরাণ-বর্ণিত বংশ তালিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাই আমরা আপাততঃ স্বীকার করিয়া লইতেছি। তাহা হইলে বায়ুপুরাণমতে সোমাপি হইতে বার্হদ্রথগণের রাজ্যকাল ৯২১ বৎসর হইতেছে। উক্ত পুরাণমতে প্রদ্যোত বংশের রাজ্যকাল ১৩৮ বৎসর এবং শৈশুনাগ বংশের রাজ্যকাল ৩৩২ বৎসর। সুতরাং সর্ব্বশুদ্ধ ১৩৯১ বৎসর সোমাপি ও নন্দের অন্তর হইতেছে। কোথায় ১৫১০ আর কোথায় ১৩৯১! বেচারা লিপিকরের দোষ আর কি করিয়া বিশ্বাস হয়? না হয় ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মত ধরা হউক। ৮৮১ + ১৩৮ + ৩৬২ = ১৩৮১ বৎসর হইল। এতদনুসারেও ১৫১০ বৎসর সংস্থান হয় কি? এক্ষণে নির্দ্দোষী লিপিকরগণ অব্যাহতি পাইতে পারিবে বোধ হয়? এত 'একশেষ সিদ্ধ' করিয়া, অর্থের মারপেঁচ করিয়া, কষ্টকল্পনা করিয়া ১৫১০ বৎসর দেখাইতে পারিলেন কৈ? না হয়, ১৫০০শত বৎসর দেখাইলেও চলিত। অভাব পক্ষে ১৪৯৮ হইলেও হইতে পারিত।

দেউস্কর মহাশয় বার্হদ্রথ ভূপতিগণের যে রাজ্যকাল উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদপেক্ষা ন্যূন সংখ্যা ঐ তালিকা হইতেই সংগ্রহ করা যাইতেছে। কিন্তু আপাততঃ আমি দেউস্কর মহাশয়ের সংগৃহীত তালিকা হইতেই যাহা দেখাইলাম, তাহাতে সকলে বুঝিবেন যে, উক্ত-বংশতালিকার বলে বিষ্ণুপুরাণ বচনে লিপিকরপ্রমাদ কল্পনা করা অনভিজ্ঞতা প্রকাশ মাত্র। এই বংশতালিকা হইতে যে সংখ্যা গৃহীত হইতে পারে, তাহা স্পষ্টই দেউস্কর মহাশয়ের মতের প্রতিকূল। স্থানান্তরে ইহার আলোচনা করিব।

অতঃপর বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থ অংশের ২৩ অধ্যায় দেউস্কর মহাশয় কিরূপ বুঝিয়াছেন, দেখা যাউক। তিনি কোন্ যুক্তিবলে সোমাপিকে ভবিষ্য রাজগণের প্রথম ধরিয়াছেন, তাহা বুঝিয়া দেখা যাউক। যে সময়ে যে কথা বলা যায়, তাহার ভাবীকালকেই ভবিষ্যৎ বলে। ২৩ অধ্যায়বর্ণিত ভবিষ্যৎ রাজগণের নাম পরীক্ষিতের রাজ্যকালে পরাশর ঋষি মৈত্রেয় নামক ব্রাহ্মণকে বলিতেছেন। তৎকালে যে পরীক্ষিৎ রাজ্য করিতেছিলেন, তাহা পরাশর ১৯ অধ্যায়ে বলিয়াছেন। তাহা হইলে পরীক্ষিতের পরবর্ত্তীরাজগণই "ভবিষ্যৎ" নামে অভিহিত হইবেন। কিন্তু দেউস্কর মহাশয়ের মতে সোমাপি পরীক্ষিতের পরবর্ত্তী হইতেছেন। যখন পরীক্ষিৎ মাতৃগর্ভে বাস করিতেছিলেন,

তখন সোমাপি রাজাসনে উপবিষ্ট। যখন পরীক্ষিৎ সূতিকাগৃহে অবস্থান করিতে-ছিলেন,তখন অশ্বমেধের অশ্ব লইয়া অর্জ্জুনের সহিত সোমাপির মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়। সুতরাং দেউস্কর মহাশয়ের মতে পরীক্ষিতের পরবর্ত্তী সোমাপিকে হইতেই হইবে! এরূপ চাতুর্য্য প্রকাশ, এরূপ গোঁজামিলনের চেষ্টা বাহাদুরী বটে! ইচ্ছা করিয়া দেউস্কর মহাশয় এরূপ করিয়াছেন কি না, জানি না; কিন্তু শ্রীধর স্বামীর টীকা দেখিলে ত এই ভ্রম হইত না। পাঁচখানি পুরাণ লইয়া বিচার করিতে বসিয়াছেন, কিন্তু দেখিতেছি, মূলেই ভুল করিয়াছেন। স্বামীজী কি বলেন, দেখিয়াছিলেন কি? বিষ্ণুপুরাণের ৪র্থ অংশের ১৯ অধ্যায়টীতেও কি দেখেন নাই যে,সোমাপি ও শ্রুতশ্রবা পরীক্ষিতের সমসাময়িক নরপতি। স্বামীজী কি ২৩ অধ্যায়ের টীকায় সোমাপি হইতে তৃতীয় ব্যক্তিকে (অযুতায়ুকে) ভবিষ্যরাজগণের প্রথম ধরেন নাই? পুস্তক উদ্ঘাটন করিয়া যাহা দেখিয়াছেন, তাহাই দেউস্কর মহাশয় প্রামাণিক মনে করিয়াছেন, কিন্তু যুক্তিহীন বিচারে যে ধর্ম্মহানি ঘটিয়া থাকে, এ কথাটা ভাবিবারও কি সাবকাশ হয় নাই; বিতণ্ডা করিবার ইচ্ছা এতই বলবতী!

ভাগবতের "ভাব্যা" কথাটা লইয়াও তিনি একটু গোল করিয়াছেন। "ভাব্যা" অর্থে সোমাপি হইতে রিপুঞ্জয় পর্য্যন্ত রাজগণকেই অর্থাৎ ভারতযুদ্ধের পরবর্ত্তী নৃপতিদিগকে গণিয়াছেন। কিন্তু ঐ "ভাব্যা" কথার অর্থ ভাগবতের অন্যতম টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কি বুঝিয়াছেন? তিনি বলেন "জরাসন্ধাৎ সহস্র বৎসর পর্য্যন্তং" অর্থাৎ বৃহদ্রথের অব্যবহিত পরবর্ত্তী ভূপতি হইতেই ঐ সহস্র বৎসর ভোগ হইয়াছে। কেন না, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ এবং মহাভারত মতে জরাসন্ধ বৃহদ্রথেরই পুত্র। যদিও হরিবংশের মত অধিক আদরণীয়, তথাপি টীকাকার ভাগবতের মতেই বৃহদ্রথের অব্যবহিত পরে জরাসন্ধকেই ধরিয়াছেন। আর যদি টীকাকার বিশ্বনাথের মতে আস্থা স্থাপন না করেন, তাহা হইলে "ভাব্যা" অর্থে ভবিষ্যৎ রাজগণ অর্থাৎ অযুতায়ু হইতেই গণিতে হইবে। কেন না, ভাগবতেও সোমাপি ও শ্রুতশ্রবাকে পরীক্ষিতের সমসাময়িক বলা হইয়াছে। কিন্তু দেউস্কর মহাশয় যাহা দেখাইয়াছেন, তাহাতে সোমাপি হইতেই সহস্র বৎসর সংস্থান হয় না। অযুতায়ু হইতে ৯২১ − ১২২ = ৭৯৯ বৎসর হইবে। সুতরাং মানিতে হইতেছে, টীকাকার বিশ্বনাথের মতে জরাসন্ধ হইতে ঐ সহস্র বৎসর ভোগ ধরাই প্রশস্ত।

এক্ষণে আর একটী কথার উত্তর দিয়া আপাততঃ এ প্রবন্ধের শেষ করিব। বিষ্ণুপুরাণের ২৩ অধ্যায় (৪র্থ অংশ) কি ২৪ অধ্যায়ের ৩১।৩২ প্রভৃতি শ্লোকগুলি অধিক প্রামাণিক? অর্থাৎ বিবাদস্থলে কাহার প্রামাণ্য অধিক? দেউস্কর মহাশয়ের মতে ২৩ অধ্যায়ই অধিক প্রামাণিক। কিন্তু আমার মতে উক্ত দুই স্থলে বিবাদ নাই। আর যদি বিবাদের কারণ হয়, তাহা হইলে ২৪ অধ্যায়ের ৩২।৩৪ প্রভৃতি শ্লোকগুলিই মানিতে হইবে। কেন না, পুরাণকার ঐ শ্লোকগুলি "অত্রোচ্যতে" বলিয়া প্রামাণিক স্থল হইতে নিজের সমর্থনের জন্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। এইরূপ বিষ্ণুপুরাণের স্থানে স্থানে বিশেষ প্রামাণিক বলিয়া কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত আছে।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। *

(বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ)

প্রথম অধ্যায়।

অর্জ্জুন-বিষাদ।

"যদ্বক্ত্র পঙ্করুহ সম্প্রসূতং
নিষ্ঠামৃতং বিশ্ববিভাগ নিষ্ঠং।
সাধোত্তরাভ্যাং পরিনিষ্ঠিতাস্তং
তং বাসুদেবং সততং নতোঽস্মি ॥"

ধৃতরাষ্ট্র—

সঞ্জয়! যুদ্ধার্থে মিলি পুণ্য কুরুভূমে,
কি করিলা—আমার ও পাণ্ডবের দলে? ১

সঞ্জয়—

ব্যূহিত পাণ্ডবসেনা দেখি দুর্য্যোধন,
আচার্য্য সমীপে গিয়া কহিলা বচন—২
"হের গুরু! পাণ্ডবের অই মহা চমূ,
ব্যূহিত করেছে তব সুশিষ্য দ্রৌপদ। ৩
"হোথা বীর মহাধন্বা—যুদ্ধে ভীমার্জ্জুন
যুযুধান্ বিরাট দ্রুপদ মহারথ, ৪
"ধৃষ্টকেতু চেকিতান কাশীরাজ বীর,
পুরুজিৎ কুন্তীভোজ শৈব্য নরোত্তম, ৫
"মহাবল যুধামন্যু উত্তমৌজা বীর,
সৌভদ্র-দ্রৌপদীসুত-সবে মহারথ! ৬

টীকা।

(১) পুণ্য কুরুভূমে—কুরুক্ষেত্র—ধর্ম্মক্ষেত্র। এই স্থানে কুরুরাজ তপস্যা করিয়া সিদ্ধ হন। দেবগণ এই স্থানে যজ্ঞে উপস্থিত থাকেন। তাহারা এই স্থানে দেবযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। (মধু)

কি করিলা—অভিপ্রায় এই যে, স্থানমাহাত্ম্যে ধর্ম্মপ্রভাবে তাহারা যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়াছিল কি না? (মধু ও গিরি)

(২) ব্যূহিত—যুদ্ধকালে ও অভিনির্যাণকালে সেনাপতি যে বিশেষ বিশেষ প্রণালীতে সেনা বিন্যস্ত করেন, তাহাকে ব্যূহ বলে। ব্যূহ সাধারণতঃ ছয় প্রকার। যথা,—মকর, শ্যেন, সূচী, শকট, বজ্র ও সর্ব্বতোভদ্র, পাণ্ডবেরা কুরুক্ষেত্রে বজ্রব্যূহ সাজাইয়াছিলেন। (মধু)

(৩) সুশিষ্য মূলে আছে ধীমান শিষ্য। টীকাকারেরা বলেন ব্যঙ্গচ্ছলে দুর্য্যোধন এরূপ বলিয়াছিল। ধৃষ্টদ্যুম্ন শিষ্য হইয়া গুরুবধার্থে এইরূপ উদ্যোগ করিতেছিল, এই জন্য। (মধু) দ্রোণবধ জন্য দ্রুপদরাজ যজ্ঞকুণ্ড হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন, এই জন্য। (বলদেব) এ দূরার্থের বিশেষ প্রয়োজন বোধ হয় না।

(৪।৫।৬)—যুযুধান—সাত্যকি। ধৃষ্টকেতু—চেদীরাজ। পুরুজিৎ ও কুন্তীভোজ—পুরুজিতের ভ্রাতা কুন্তীভোজ বসুদেব কন্যা কুন্তীদেবীকে দত্তককন্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সৌভদ্র—অভিমন্যু। দ্রৌপদীসুত—দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, যথা, প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকীর্ত্তি, শতানীক ও শ্রুতসেন। মহারথী—মহারথীর লক্ষণ এই—

"একাদশ সহস্রাণি যোধয়েৎ যস্তুধন্বিনা
শস্ত্র শাস্ত্র প্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ।"

অনুবাদকের নিবেদন।

* আজ প্রায় দশ বৎসর অতীত হইল, আমি পদ্যে গীতার অনুবাদ করিয়াছিলাম। তখন গীতার উপর নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি পড়িতেছিল; গীতার অনেকগুলি সটীক সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছিল। নবীন বাবু তখন গীতার পদ্যানুবাদ করিতেছিলেন, শুনিয়াছিলাম। একারণ আমার এ অনুবাদ প্রকাশ করা অনাবশ্যক মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, আমি যে ভাবে অনুবাদ করিয়াছি, ও সকল সংস্কৃত প্রসিদ্ধ টীকাকারদের টীকার সার সংগ্রহ করিয়া ইহাতে যেরূপে আবশ্যকমত টীকা সন্নিবেশিত করিয়াছি—সেরূপ আর কেহই করেন নাই। এরূপ টীকা সহ গীতার বঙ্গানুবাদ সাধারণের প্রয়োজন হইতে পারে, এই বিবেচনায় এবং নব্যভারতের শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদকের অনুরোধে ইহা নব্যভারতে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আবশ্যক হইলে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে পারিব। শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

"আমাদের(ও) বিশিষ্ট যে সেনার নায়ক,
জ্ঞাতার্থ তোমায় কহি, শুন দ্বিজবর—৭
"আপনি ও ভীষ্ম কর্ণ কৃপ রণজয়ী,
অশ্বত্থামা বিকর্ণ ও সোমদত্ত সুত—৮
"আরও কত শূর—নানা প্রহরণ-ধারী,
যুদ্ধবীর—মম তরে প্রাণ দিতে রত। ৯
"অপর্য্যাপ্ত বল মম ভীষ্ম সুরক্ষিত,
পর্য্যাপ্ত এদের সেনা ভীমের রক্ষিত। ১০
"সকল অয়নে থাকি যথাভাগ মত,
ভীষ্মকে করুন তবে রক্ষা মিলি সবে।" ১১
কুরুবৃদ্ধ পিতামহ তারে উল্লাসিতে,
ধ্বনিলা প্রতাপে শঙ্খ উচ্চ সিংহনাদে। ১২

(৮) বিকর্ণ—দুর্য্যোধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সোমদত্তসুত ভূরিশ্রবা।

(১০) অপর্য্যাপ্ত ও পর্য্যাপ্ত—(১) অপর্য্যাপ্ত—যুদ্ধ করিতে অসমর্থ; পর্য্যাপ্ত—যুদ্ধ করিতে সমর্থ। (স্বামী ও রামানুজ) (২) অথবা—অপর্য্যাপ্ত—অপরিমিত ও অপরিগণিত; পর্য্যাপ্ত—পরিমিত। (গিরি, মধু ও বলদেব)। এই দুই বিপরীত অর্থ মধ্যে শেষ অর্থ অধিক সঙ্গত। প্রায় সকল টীকাকারগণই বুঝাইতে চান—যে দুর্য্যোধন পাণ্ডবকুলের মধ্যে ভীমার্জ্জুন সম অনেক যোদ্ধা মহারথী ও তাহাদের মহাচমু ব্যূহবদ্ধ দেখিয়া কিছু ভগ্নমন হইয়াছিলেন ও সেই জন্য ভীষ্ম তাঁহার হর্ষোৎপাদন জন্য পরে শঙ্খধ্বনি করেন। সুতরাং তিনি তাঁহার সৈন্যগণকে স্বভাবতঃই যুদ্ধ করিতে অসমর্থ ও কৌরবসেনাকে যুদ্ধ করিতে সমর্থ মনে করিতে পারেন। প্রথম টীকাকারগণ এই কথা বলেন। দ্বিতীয় টীকাকারগণ বলেন যে, দুর্য্যোধন পাণ্ডবদের সাত অক্ষৌহিণী সেনা অপেক্ষা তাঁহার একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা অনেক অধিক এবং তাহা ভীম অপেক্ষা অধিক রণনিপুণ ভীষ্ম কর্ত্তৃক রক্ষিত দেখিয়া তখন বিশেষ আশ্বস্ত হইয়াছিলেন।

(১১) অয়ন—মর্য্যাদা। যে অগ্রপশ্চাৎ অবস্থিতির স্থান। (গিরি ও মধু) ব্যূহপথ (স্বামী ও বলদেব)

ভীষ্মকে রক্ষা—ভীষ্ম প্রধান সেনাপতি বলিয়া ব্যূহ মধ্যস্থলে থাকিবেন ও অন্য সেনাপতিগণ তাঁহাকে পার্শ্ব হইতে রক্ষা করিবেন—তবে সকলে রক্ষিত হইবে। যুদ্ধকালে প্রধান সেনাপতিকে বিনাশ করার জন্য প্রধানতঃ বিপক্ষগণ চেষ্টা করিত। (মধু)

গোমুখ পণবানক শঙ্খ ভেরী তবে
সহসা বাজিল, শব্দ হইল তুমুল। ১৩
"তবে শ্বেত অশ্বযুত মহারথে থাকি,
নিনাদিল দিব্যশঙ্খ—মাধব অর্জ্জুন—১৪
কৃষ্ণ—পাঞ্চজন্য, দেবদত্ত—ধনঞ্জয়;
নাদে পৌণ্ড্র মহাশঙ্খ ভীমকর্ম্মা ভীম; ১৫
যুধিষ্ঠির নির্ঘোষিলা—অনন্তবিজয়;
সুঘোষ-নকুল, মনিপুষ্প-সহদেব। ১৬
ধৃষ্টদ্যুম্ন কাশীরাজ পরম ধানুকী,
বিরাট শিখণ্ডী রথী, অজিত সাত্যকি, ১৭
দ্রুপদ, দ্রৌপদীপুত্র, বীর ভদ্রাসুত,
হে রাজন্, সবে ঘোষে শঙ্খ নিজ নিজ। ১৮
কাঁপাইয়া নভঃ পৃথ্বী তুমুল আরবে,
বাজিল সে ধ্বনি গিয়া কৌরবের বুকে। ১৯
তবে পার্থ কপিধ্বজ—শরক্ষেপ হেতু
ধনু তুলি—রণোদ্যত কৌরবেরে হেরি,
হৃষীকেশে হে রাজন্, কহিল এ কথা। ২০

অর্জ্জুন—

অচ্যুত! রাখ এ রথ উভসেনা মাঝে—২১
যাবৎ না হেরি আমি যুদ্ধকামীগণে—
কে যুঝিবে মম সনে উপস্থিত রণে; ২২

(১৩) পণব—মাদল। আনক—পটহ। গোমুখ—শৃঙ্গ প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র।

(১৫) পাঞ্চজন্য—কৃষ্ণ প্রভাসকূলে গুরু সন্দীপনির পুত্রকে রক্ষা করিবার জন্য পঞ্চজন নামক সমুদ্রবাসী দৈত্যকে হত্যা করিয়া, তাহার অস্থি হইতে এই শঙ্খ প্রস্তুত করেন।

(২০) কপিধ্বজ—হনুমান অর্জ্জুনের ধ্বজে অধিষ্ঠিত ছিল।

(২১) অচ্যুত—যাহার চ্যুতি বা বিকার নাই। রণক্ষেত্রে অবিচলিত থাকা সারথির প্রধান গুণ। (মধু)

দেখি যারা রণ আশে আসিয়াছে হেথা—
দুর্য্যোধন দুর্ব্বোধের যুদ্ধে-প্রিয়কারী। ২৩

সঞ্জয়—

নিদ্রাজয়ী অর্জ্জুনের বাক্য শুনি তবে,
হৃষীকেশ স্থাপি রথ সেনা সন্ধিস্থলে—২৪
ভীষ্ম দ্রোণ নীত যত মহীপতি মাঝে,
কহিলেন "হের পার্থ অই কুরুদলে।" ২৫
দেখে পার্থ আছে তথা উভ-সেনা-দলে
পিতৃব্য ও পিতামহ আচার্য্য মাতুল
পুত্র পৌত্র ভাই বন্ধু শ্বশুর সুহৃদ ; ২৬
সেই সব বন্ধুগণে হেরি অবস্থিত,
কহিল অর্জ্জুন - বড় দুঃখ কৃপাযুত ২৭

অর্জ্জুন

হেরি এ স্বজনগণে রণ আশে স্থিত—
অবসন্ন দেহ মম—বিশুষ্ক বদন —২৮
কাঁপে অঙ্গ মম কৃষ্ণ— হয় রোমাঞ্চিত—
জ্বলে দেহ—হাত হতে খসিছে গাণ্ডিব —২৯
মোহ উপজিছে মম—না পারি থাকিতে—
হেরি কৃষ্ণ! বিপরীত লক্ষণ সকল। ৩০
স্বজনে বধিয়া রণে নাহি হেরি লাভ।
হে কৃষ্ণ চাহি না জয়- -কিম্বা রাজ্যসুখ; ৩১

(২২) কে যুঝিবে—অর্জ্জুনের সমকক্ষ কেহ যোদ্ধা ছিল না বলিয়া এই কথায় কিছু ব্যঙ্গ বা কৌতুকের ভাব আছে। (মধু)

(২৪) হৃষিকেশ—(হৃষীক) বিষয়েন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা, ইন্দ্রিয় প্রবর্ত্তক ও অন্তর্যামী (মধু)

(২৬) পিতৃব্য—মূলে আছে পিতৃগণ, অর্থাৎ পিতৃ স্থানীয় ব্যক্তিগণ—ভূরিশ্রবা প্রভৃতি; পিতামহ —ভীষ্ম, সোমদত্ত প্রভৃতি; আচার্য্য—দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি; মাতুল—শল্য শকুনি প্রভৃতি; ভ্রাতা—দুর্য্যোধন ইত্যাদি; পুত্র—লক্ষণ ইত্যাদি। পৌত্র —লক্ষণের পুত্র ইত্যাদি। বন্ধু—অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ প্রভৃতি; সুহৃদ—কৃতবর্ম্মা, ভগদত্ত প্রভৃতি (এবং সকল উপকারক ও মাতামহ প্রভৃতি)।

(৩০) বিপরীত লক্ষণ—যথা, বামনেত্র স্পন্দন। (গিরি) শকুনি প্রভৃতি দর্শন (স্বামী) অশ্ব ব্যতীত রথের আপনাপনি গতি ইত্যাদি।

কেন রাজ্য, ভোগ, কৃষ্ণ কেন বা জীবন—
যাহাদের তরে চাহি রাজ্যভোগ সুখ; ৩২
অই তারা যুদ্ধে স্থিত—ত্যজি ধন প্রাণ—
আচার্য্য পিতৃব্য আর পুত্র পিতামহ ৩৩
মাতুল শ্বশুর পৌত্র সম্বন্ধি শ্যালক।
মরিলেও—ইচ্ছা নাহি মারি এ সবারে। ৩৪
ত্রিলোকের(ও)রাজ্যতরে—ধরার কি কাজ?
কি প্রীতি লভিব বধি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণে? ৩৫
এই আততায়ী বধে হবে পাপাশ্রয়;
বন্ধুসহ কুরুগণে বধি নাহি কাজ—
কেমনে হইব সুখী স্বজন বধিয়া! ৩৬
লোভ-হত চিত্ত এরা, যদি নাহি হেরে
কুলক্ষয় কৃতদোষ -মিত্রবধ পাপ। ৩৭
কুলক্ষয় কৃত দোষ জেনে কেন মোরা
নিবৃত্ত না হব কৃষ্ণ হেন পাপ হতে? ৩৮
কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্ম্ম নাশে,
ধর্ম্ম-নাশে কুল হয় অধর্ম্মে পূরিত, ৩৯
অধর্ম্মেতে কুলস্ত্রীরা ব্যভিচারি হবে -
জন্মিবে শঙ্করবর্ণ নারী দুষ্টা হলে—৪০

(৩১) নাহি হেরি লাভ—যুদ্ধে মারিলে লাভ নাই, যদিও শাস্ত্র মতে মরিলে স্বর্গলাভ হয়, যথা,—

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডল ভেদিনৌ।
পরিব্রাড় যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখো হতঃ॥"

(৩৬) আততায়ীঃ—যে অগ্নি দ্বারা গৃহদাহ করে, যে বিষপান করায়, যে বিনাশার্থ অস্ত্র ধারণ করে, যে ধনাপহরণ করে, যে ভূমি অপহরণ করে, ও পরস্ত্রী হরণ করে "সেই আততায়ী।" এই সকল উপায়েই দুর্য্যোধন পাণ্ডবদের বিনাশ চেষ্টা করিয়াছিল। অর্থ শাস্ত্র মত আততায়ী বধে পাপ না থাকিলেও ধর্ম্ম শাস্ত্র মতে আছে। (মধু) অথবা আততায়ী বধে পাপ না থাকিলেও স্বজন বধ বা গুরুজন বধ জন্য পাপ আছে। (গিরি)

(৩৯) সনাতন—পরম্পরা প্রাপ্ত। কুল—অবশিষ্ট কুল।

(৪০) জন্মিবে শঙ্কর—পুরুষেরা যুদ্ধে হত হইলে স্ত্রীলোকে কুল ধর্ম্ম পালনে অক্ষম বলিয়া তাহা

সঙ্কর নরকহেতু—কুলঘ্নের কুলে
পতিত তাদের পিতা—জল পিণ্ড লোপে। ৪১
এই সঙ্করের সৃষ্টি দোষে কুলঘ্নের
চিরজাতি-কুল-ধর্ম্ম হইবে উচ্ছেদ ;
শুনিয়াছি জনার্দ্দন কুলধর্ম্ম নাশে,
নরগণ করে বাস নরকে নিয়ত। ৪৩

হায় মোরা হেন মহা পাপে সমুদ্যত,
রাজ্যসুখ লোভে ব্যস্ত বধিতে স্বজন! ৪৪
অস্ত্রহীন নিরুদ্যম মোরে বধে যদি
ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ রণে সেও ভাল মম।" ৪৫
সঞ্জয়—
এত বলি ধনুঃশর ত্যজি রণস্থলে,
বসে পার্থ রথক্রোড়ে শোক-মুগ্ধমনে। ৪৬

অভ্রান্ত গুরু কে?

পৃথিবী প্রকৃত তত্ত্ব গ্রহণ করিতে উদাসীন কেন? ইহার মূল অন্বেষণ করিলে ইহাই দেখা যায়, মানব-প্রকৃতি স্বভাবতই কল্পনা-প্রসূত অলৌকিক ঘটনার অধীন, জড়বিজ্ঞানের শক্তিকেই মহাশক্তির ব্যাপার সিদ্ধান্ত করিয়া পরিতৃপ্ত হয়; সুতরাং সত্যানুসন্ধানে পরাঙ্মুখ হইবে, আশ্চর্য্য কি? সাধু ও সাধকগণ যতই কেন উচ্চতম প্রদেশে অবস্থিতি করুন না, যদি জাত্যাভিমান, স্বার্থ, ও সম্মানকে পরিত্যাগ করিতে না পারেন, তবে অবশ্যই বলিতে পারি, তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান প্রচ্ছন্ন রাখিয়া অনুদার ভেদ ভাবকে প্রশ্রয় দেন। সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শন এবং বিবিধ পুরাণ-প্রমাণে গুরু ভাব দ্বারা মানব শক্তিকেই ঐশীশক্তি প্রদর্শিত করা হইয়াছে। ইহাতেই জানা যাইতেছে, বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান, স্বাভাবিক জীবন-বেদ, মধুর ভ্রাতৃত্ব তত্ত্বকে বিনাশ করিয়াছে। সংসার পরপিণ্ড-প্রত্যাশী হইয়া স্বয়ং শক্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

এস্থলে স্পষ্টই বলিতে পারি, গুরুবাদই ভেদের বীজ পুরুষ। ইহা হইতেই জাতি ভেদ, ধর্ম্মভেদ, মতভেদাদির সৃষ্টি হইয়াছে। কেন না, (গুরু-শিষ্য) শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট ভাবের আতিশয্য বশতঃ স্বার্থপরতা দ্বেষ হিংসাদির আক্রমণে উদার সরলতত্ত্ব পৃথিবী হইতে চলিয়া গিয়াছে। জটা, তুলসী, রুদ্রাক্ষধারী মানব-গুরু, ব্যাঘ্র ধর্ম্মের আসনে বসিয়া, শূদ্র শিষ্যের হস্তে একবিন্দু জল কিরূপে গ্রহণ করিবেন? একাসনেই বা কিরূপে বসিবেন? ভেদের কারণ দেখাইতে বাধ্য হইয়া, এই কথাটি বলিতে হইল। যাহা হউক, এক্ষণে যে বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।

আহা! এক বিন্দু শুক্র-শোণিত হইতে অস্থি মেদময় দেহভাবে ভূমিষ্ঠ হইলে মাতৃ স্তন্য ধরিয়া দুগ্ধপান করিবার জ্ঞান পাইয়াছি, উঠিতে, চলিতে, বসিতে শিখিয়াছি, ওঁমা শব্দে প্রথমেই আপনা হইতে কথা বলিয়াছি ইত্যাদি। ইহার উপদেষ্টা কে? কাহার শক্তি হইতে শিশুর ভিতরে যুবা, যুবার

লোপ হইবে। এবং স্ত্রীলোকে বাধ্য হইয়া অসবর্ণ বিবাহ করিবে অথবা ব্যভিচারী হইবে ও সে কারণ বর্ণ সঙ্কর জন্মিবে।

(৪১) জলপিণ্ড লোপ—পুত্রগণ যুদ্ধে হত হইয়াছে বলিয়া।

(৪২) কুল ধর্ম্ম—আশ্রম ধর্ম্ম-চিরন্তন অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়াকলাপ। জাতি ধর্ম্ম—বর্ণধর্ম্ম।

ভিতরে বৃদ্ধ, বৃদ্ধের ভিতরে স্থবীর এবং ক্ষুদ্রের মধ্য দিয়া বৃহৎ হয়? ইহা কি কোন মানুষে গড়াইয়া দেয়? যদি বলেন —না। তবে ইহার কর্ত্তা কে? একমাত্র ব্রহ্ম জীবের সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। আমার প্রত্যেক শ্বাস প্রশ্বাসে থাকিয়া আমাকে রক্ষা করিতেছেন। শরীরস্থ যন্ত্র সকলের কার্য্য সুশৃঙ্খলা মত চালাইয়া দিতেছেন। রক্তস্থলি হইতে প্রত্যেক শিরায় রক্ত সঞ্চালন দ্বারা জীবিত রাখিয়াছেন। দর্শন, শ্রবণ, আহার, নিদ্রা প্রভৃতির জ্ঞান এবং দুর্গন্ধ সুগন্ধ অনুভব শক্তি স্বাভাবিক ভাবেই পাইয়াছি। সেই জীবন্ত গুরু জীবনের সমস্ত কার্য্য করিতে পারেন, ঐ পরিত্রাণের পথটাই কেবল দেখাইতে পারেন না? তিনি কি এখন বার্দ্ধক্যের যাতনায় অক্ষম যে, এক একটি মানুষের প্রতি উদ্ধারের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত আছেন!

অপূর্ণ মানব শক্তির প্রতি নির্ভর করিলে জীবের মুক্তি হয়, ইহা কি ভ্রান্তির কথা নহে? মানব ব্রহ্মে ডুবিলেও তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারে না। পল্বল যেমন সমুদ্রের তরঙ্গে মগ্ন হইয়াও ক্ষুদ্রাবস্থাতেই অবস্থিতি করে, সেইরূপ, মানব শক্তিও মহাশক্তির নিকট বিন্দু তুল্য সীমাবদ্ধ। কাজেই, অন্যকে পরিত্রাণের পথ দেখাইতে পারে না। হয়ত অনেকে আপত্তি করিতে পারেন, বুদ্ধ, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি সাধুভক্ত এবং জাহাজের খালাসী মুটে মজুর সকলইত মনুষ্য। তবে এই উভয়বিধ ভাবে মানব শক্তি বিভিন্ন দেখিতে পাই কেন? ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়, ঈশ্বর জগতের পরিত্রাণের জন্য ব্যক্তি বিশেষে ঐশী শক্তি প্রদান করেন। এই প্রশ্নের কথা চিন্তা করিলে ঈশ্বরে পক্ষপাতিত্ব দোষ ঘটে। কেন না, তিনি দয়াময়। পাপীই হউক বা সাধুই হউক, সমভাবেই মানব যন্ত্রোপযুক্ত সকল শক্তি দিয়াছেন। মনুষ্য স্বাধীন শক্তি প্রভাবে উন্নতি অবনতির অবস্থায় অবস্থিতি করে। যেমন দুইটি লাণ্টন মধ্যে একটি স্বচ্ছ বা পরিষ্কৃত, তাহার ভিতর দিয়া আলো উজ্জল রূপে ফুটিয়া উঠিতেছে; অপরটি ধূলাদি আবর্জ্জনায় প্রচ্ছন্ন, ভিতরে আলো সমান জ্বলিতেছে, কিন্তু তাহার জ্যোতিঃ আদবেই দেখা যায় না। দোষ কি আলোকের, না পাত্রের? সেইরূপ, নিশ্চেষ্ট-মানব পরপিণ্ডপোষিত হয়, স্বয়ং শক্তি প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় না; সুতরাং দুরবস্থায় অবস্থিতি করে, মানব শক্তি ধরিয়া কৃতার্থ হইতে থাকে। এস্থলে বিজ্ঞানেরও একটি আপত্তি আছে। আপত্তিটি এই, পিতা মাতার শরীরের এবং মনোবৃত্তির অবস্থাভেদে সাধু অসাধু, জ্ঞানী মূর্খ ইত্যাদি ভাব সন্তানেও সংঘটিত হয়। কিন্তু মনুষ্যের তাহাতেও নিজের শক্তি প্রয়োজন হয়। প্রাণগত অধ্যবসায় এবং সাধন দ্বারা অসাধু—সাধু, মূর্খ—তর্কচূড়ামণি হইতে পারে। বর্ষা-তরঙ্গিণীর কলুষিত জল কি নির্ম্মল হয় না?

বাস্তবিক ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খ, সকল প্রকার মানবাত্মার ভিতরেই জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু স্থিতি করিতেছেন। অনন্ত মহাশূন্যে পিতা পুত্র ভিন্ন আর কিছুই নাই। কীটাদি পর্য্যন্ত সকলেই ভ্রাতৃ সম্বন্ধে আবদ্ধ। মানব কোন্ প্রাণ ধরিয়া গুরু বা আচার্য্য হইতে ইচ্ছা করেন, সমাসনে বসিতে ক্লেশ বোধ করিয়া গুরু-সম্মানিত স্বতন্ত্র আসন গ্রহণে সুখী হন? ইহাতে যে উদার প্রেম কলঙ্কিত হয়, দেখিতে পান না। এই ভেদজনিত পাপের প্রভাবেই ত প্রকৃত সত্য প্রকাশ

পাইতেছে না। বিন্দুমাত্র শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান বোধ থাকিতে উদার প্রেমে জগৎকে কেহ আলিঙ্গন করিতে পারিবেন না। শ্বপচাদির অন্ন গ্রহণ করিলেই যে উদার প্রেম স্থাপিত হইল, তাহা নহে। অপ্রভেদ জীবভক্তি, সর্ব্বগত অবিচ্ছিন্ন প্রেম ও অকৃত্রিম দীনতার সাধন না হইলে ব্রহ্ম দর্শন হইবে না।

হে মানব ভাই! তুমি গুরু হইয়া কিরূপে ব্রহ্মকে দর্শন করিবে? অধ্যাত্মযোগে (ইন্দ্রজালের ন্যায়) কল্পিত কৃষ্ণ-চৈতন্যের মূর্ত্তি দেখিয়া এবং আত্মার পরিমিত শক্তি সঞ্চালন করিয়া কি হইবে? উহা যে ব্রহ্মের পরীক্ষা। সাধক বাহ্যিক খণ্ড মূর্ত্তির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলে, অনন্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে ডুবিতে পারে না, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। মানবগুরুর বিজ্ঞানতত্ত্ব ধরিয়া কোথায় যাইব? পরিমিত জলবিম্ব কোটি কোটি বিম্বতে মিশিলেও ক্ষুদ্র, পরস্পর শক্তি একত্র হইলেও অপূর্ণ। তবে বলিতে পারেন, মানব হৃদয় হইতে যে সকল ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ হয়, তাহা কি ঈশ্বরের উপদেশ নয়? এ কথা অবশ্যই স্বীকার করি। ব্রহ্ম অসংখ্য-জগৎ এবং জীবশক্তিকে ভেদ করিয়া নিত্য ভাবেই রহিয়াছেন। পশু পক্ষী মানব সকলেই উপদেশ দিতেছে। একটি পত্রের নিকটেও শিক্ষা পাইতেছি। চৈতন্য, ব্যাধকেও গুরু বলিয়াছেন।

ধীর গম্ভীরভাবে দেখিলে সকলেই ত গুরু। যখন অখণ্ড চৈতন্যময় ব্রহ্ম সমস্ত জীবে বর্ত্তমান আছেন, তখন ঐ বিদ্যারত্ন মহাশয় গুরু, বোসজা বা সাজী মহাশয় গুরু হইতে পারেন না, নিতান্ত ভ্রমের কথা। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, মানুষ নিজেই আপনার শক্তিকে দুর্ব্বল করে। তাই বলিয়া কি মানব খণ্ডভাবে গুরু হইতে পারে? মানবাধারে ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ দেখিয়া কি মধুর ভ্রাতৃত্বতত্ত্ব হারাইব? ভ্রাতৃভাবে উপদেশ গ্রহণ করিলে ক্ষতি কি? পৃথিবী বুঝিতেছে না যে, অবতারবাদ, প্রেরিতবাদ, গুরুবাদ, এই সকল প্রভেদ ভাবের সংস্পর্শে নিষ্কলঙ্ক উদার প্রেম কলঙ্কিত হইতেছে। জীবসকল ভেদ-ব্যাদের করাল গ্রাসে ভীষণ যন্ত্রণায় অভিভূত। জ্ঞানে ভেদ, প্রেমে ভেদ, ভক্তিতে ভেদ, যোগসাধনে ভেদ, আহার, বিহার সমস্ত কার্য্যে ভেদ, নির্ভিকান্তঃকরণে বলিতে পারি, উদার ব্রাহ্মসমাজের ভিতরেও এই রোগ দেখা দিয়াছে। কেহ বা সাধুভক্তির তরঙ্গে ভাসিতেছেন, কেহ বা গুরুভক্তির আবর্ত্তে ঘুরিতেছেন। ভাবেন না যে, অপ্রভেদ জীবভক্তির অভাবে ব্যক্তিগত সাধু ও গুরুভক্তি, উভয়ই ভুজঙ্গ স্বরূপ; সময় পাইলে দংশন করিবে।

এখন দেখা যাক্, এই ঘোরতর যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণের উপায় কি। দেখিতেছি, এক মাত্র ভ্রাতৃভাব ব্যতীত কোন প্রকার পার্থক্য ভাবে প্রেমের মিলন হইবে না। গুরুশিষ্য, সাধু অসাধু, রাজা প্রজা, এক প্রেমের শৃঙ্খলে বদ্ধ না হইলে উপায় নাই। একথা শুনিবামাত্র অনেকেই চটিয়া বলিবেন, কি, ব্যক্তিবিশেষে গুরু বা সাধুভক্তি উড়িয়া যাইবে? কলিকাতার ব্যারিষ্টার আর মফঃসলের ফড়ে মোক্তার সমান হইল? ভাই! চটিবেন না, ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখুন, পিতার পিতৃত্বসম্বন্ধে সকলেরই পুত্র ভাবে সমান অধিকার আছে। সাধুকে সাধু-ভ্রাতা বলিতে দোষ কি? অসাধুকে ভাই বলিয়া কি ভক্তি করিতে হইবে না? তাহা হইলেত ব্রাহ্মধর্ম্ম টিকে না। আমার

মত পাপীকে ভ্রাতৃ সম্বোধনে মুখ চুম্বন করিলে প্রেম কি থাকিবে না? আহা! ব্রহ্মস্বরূপে সংসারের পিতা মাতা ভ্রাতা প্রভৃতি সকলই ত পুত্র ভাবে রহিয়াছেন। সুতরাং নিত্য সম্বন্ধে ভ্রাতৃত্ব মধুর তত্ত্বের মিলন ভিন্ন আর কি আছে? নিরাকারে পিতা পুত্রের লীলা নিত্যকাল একই ভাবে হইতেছে। * এই জন্যই, পরস্পর ভ্রাতৃভাবের মিলনে আপত্তি করিতে পারেন না। দুঃখের কথা বলিতে হইলে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হয়। আবার সাধক শ্রেণীর মধ্যেও ভ্রাতৃভাবের বিচ্ছিন্নতা দেখিতেছি। উপাসনার সময় ভাবের উচ্ছ্বাসে এবং প্রেম ভক্তির তরঙ্গে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া গেল; পরক্ষণে সংসারের বাতাসে শিশির কর্পূর কোথায় উড়িয়া যায়, গন্ধও থাকে না। একটি ভ্রাতার একটুক অসুস্থ অবস্থা দেখিয়াই সরিয়া পড়েন। ভাইটির এক দিনের জন্য থাকিবার স্থান ও এক মুষ্টি অন্ন দুর্লভ। এইরূপ অনেক উপাসকের প্রাণের অবস্থা দেখিলে, মিলনের আশা অতি অসম্ভব। বাস্তবিক, প্রকৃত দীনতার অভাবে, মতের অনৈক্যতা প্রযুক্ত, তর্ক বিতর্ক ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। গুরুবাদ পৃথিবীকে আক্রমণ করিবে, সন্দেহ কি?

অনেকে বাহিরের ভাবে বদ্ধ থাকিয়া প্রকৃত সত্যকে ঢাকিতেছেন। হায়! জীবনের মধ্যে মহাগুরু, যিনি প্রতি মুহূর্ত্তকাল উপদেশ দিতেছেন—তাঁহার অব্যর্থ আদেশ উপেক্ষা করিয়া মানুষ অপূর্ণ মানবের উপদেশেই পরিতৃপ্ত। বিবেকের মঙ্গল সম্বাদ বুঝিতে না পারিয়া, অসার ক্রিয়া পদ্ধতির অনুষ্ঠানে সতত ব্যাপৃত। প্রাণায়াম দ্বারা আত্মাকে সীমাবদ্ধ বায়ুকোষে রাখিলে কি ব্রহ্ম কৃপার প্রতি অবিশ্বাস করা হয় না? যদি প্রক্রিয়ার বশীভূত হইয়া "ব্রহ্ম কৃপাহিকেবলম্," এই মহাতত্ত্বকে বিশ্বাস না করি, নিশ্চয়ই আমি প্রভুর নিকট অবিশ্বাসী। স্বাভাবিক ব্রহ্ম কৃপার প্রতি নির্ভর করিলে যে সহজেই জীবমুক্তি হয়, ইহার অন্যথা কে করিবে? আত্মা যতই ব্রহ্মে মজিবে, ততই শ্বাস প্রশ্বাস কমিয়া যাইবে। পরিমিত বায়ুকোষ বদ্ধ জীবের যন্ত্রণা হইতে কি ইহা সহজ নহে? আত্মা মহাকাশ অতিক্রম করিয়া চিন্ময় ব্রহ্মসাগরে বিরাজ করে, একথা কি মিথ্যা? তবে বলুন, গুরু কে? একমাত্র অখণ্ড পুরুষ ভিন্ন গুরু আর কাহাকে স্বীকার করিবেন? মানব শক্তি কিছুতেই ব্রহ্ম শক্তিকে আয়ত্ত করিতে পারে না। যেমন নদী সকল পর্ব্বত হইতে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে মিলিত হয়, কিন্তু সমুদ্রকে কখনই পর্ব্বতে আনিতে পারে না, সেইরূপ, মানবাত্মা ব্রহ্মে ডুবিয়াও অন্যকে ব্রহ্মদর্শন করাইতে সক্ষম হয় না।

ব্রহ্ম কৃপাই পরিত্রাণের একমাত্র সহায়। জগতের সমস্ত মানব একত্র হইয়া শিক্ষা বা উপদেশ দিলেও তাহা বন্ধ্যার স্তনের ন্যায় বিফল। এস্থলে অবশ্যই কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, তাহা হইলে সাধু বা সৎসঙ্গের প্রয়োজন কি? মনে করুন, একটী চতুষ্কোণ কাচপাত্রের অভ্যন্তরে একটী দীপ জ্বলিতেছে। কিন্তু দর্শকগণ উহার চারিদিকে চারিটি ঐরূপ আলো দেখিতেছেন সত্য কথা। ফলতঃ ঐ পাত্রের গায় হাত দিলে ধরা যায় না কেন? আবার ক্ষীপ্র হস্তেই বা হউক, প্রকৃত দীপকলিকাকে স্পর্শ করিলে চারিটিকেই স্পর্শ করা যায়। তবে প্রকৃত গুরুকে ছাড়িয়া

* খ্রীষ্ট এই স্বর্গীয় গূঢ়তত্ত্ব বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই ভ্রাতৃভক্তিতে সঙ্গীগণের চরণ ধৌত করিতেন।

অপ্রকৃত মানবকে অভ্রান্ত গুরু বলিবার প্রয়োজন কি? উচ্চ নীচ সকলের নিকট ভ্রাতৃভাবে সৎসঙ্গ করিতে কোন বাধা নাই। ভ্রাতৃ সহবাসে ঈশ্বরের তত্ত্ব গ্রহণ করিলেই যে গুরুভক্তি প্রকাশ পাইল, তাহা নহে। জীবশক্তি যতই উজ্জ্বল হউক না কেন, মহাশক্তি অনন্ত জ্যোতির নিকট পরাভূত। এই জন্য বলিতেছি, মনুষ্য গুরু শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। ব্রহ্মই অভ্রান্ত গুরু। জীব মাত্রই তাঁহার শিষ্য। শ্রীকমলাকান্ত ব্রহ্মদাস।

হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান।

হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান ভাবিবার বিষয় হইয়াছে। তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট ইহা ভাবিয়াছেন এবং বলিয়াছেন "এই হিন্দুয়ানীর পুনরুত্থান ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অনেক কর্ত্তব্য কার্য্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে।" গবর্ণমেণ্টের ভাবনা গবর্ণমেণ্ট ভাবুন, হিন্দু সাধারণেরও এক ভাবনা আছে। এই প্রবন্ধে আমরা তাহারই উল্লেখ করিব।

পুনরুত্থিত হইতেছে কি হিন্দুধর্ম্ম, না ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম? ইহার উত্তরের পূর্ব্বে, বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রভেদ বুঝিতে হয়। যে সকল হিন্দু বেদধ্বনিতে পঞ্চনদতীর নিনাদিত করিয়া ভারত বিজয় করিয়াছিলেন, তাঁহারা কি ব্রাহ্মণ? সেই সময়ের সাহিত্য অর্থাৎ বেদমন্ত্র সাক্ষ্য দেয়, তাঁহারা বর্ণভেদহীন এক মহা তেজস্বী আর্য্যজাতি। তাঁহারা দেবদেবীর অর্চ্চনায় যজ্ঞ করিতেন, পিতৃমাতৃ কার্য্য করিতেন; কিন্তু যাঁর কার্য্য তিনি করিতেন। ইহাঁরা যদি হিন্দু, তবে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য হিন্দুধর্ম্ম নহে—হিন্দুধর্ম্মের বিকার। বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্ম পুনর্ব্বার উপনিষৎ, দর্শন ও বৌদ্ধ সাহিত্যের দ্বারা নবীভূত হয়, এবং সেই সময় আর্য্যানার্য্য-মিশ্রিত জাতি সাধারণের প্রীতির উপর দেশের জাতীয় ধর্ম্ম সংস্থাপন করে। এই জাতীয়ধর্ম্ম, যাহাকে আমরা হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া বুঝি, ইহাও ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যকে প্রশ্রয় দেয় না।

ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য ব্রাহ্মণসাহিত্যের প্রাদুর্ভাবে অঙ্কুরিত। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ রূপ আত্মকলহ ইহার প্রথম ফল। বৌদ্ধধর্ম্মের তিরোধানের সহিত ইহার পুনরুত্থান এবং এই পুনরুত্থানের চরম ও স্থায়ী ফল, হিন্দুর জাতীয় জীবনের পর্য্যবসান। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম অর্থাৎ জাতিভেদ-মূলক-ধর্ম্ম অনৈক্যের উপর সংস্থাপিত, সুতরাং ফল, হয় ভয়ানক আত্মকলহ যথা কুরুপাঞ্চাল সমর, নয় রাজনৈতিক মৃত্যু, যথা ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা।

পুনরুত্থিত হইতেছে কি এই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম? যদি তাহা হয়, তবে গবর্ণমেণ্টের যেমন ভাবিবার কথা, সকল হিন্দুরই সেইরূপ ভাবিবার কথা।

আমাদের আশঙ্কা হইতেছে, এই ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যই পুনরুত্থিত হইতেছে। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম ও ভূদেবের জীবনের মর্ম্মভেদ করিলে এই ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের ক্রমবিকাশের লক্ষণ পাওয়া যায়। বিধবা বিবাহের আন্দোলন ও বহুবিবাহ-নিবারণ-যত্ন কেবল ব্রাহ্মণ বংশ বৃদ্ধির জন্যই সূচিত হইয়াছিল। সর্ব্ব

সাধারণ হিন্দু জাতির ধর্ম্মকর্ম্ম সম্বন্ধীয় উন্নতির জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক গণ্ডূষ চিন্তারও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, বঙ্কিম বাবুর ধর্ম্মতত্ত্ব ও কৃষ্ণচরিত্র কেবল ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য স্থাপনের যত্ন মাত্র। ভূদেবের সামাজিক প্রবন্ধ ও টোলের নিমিত্ত দান ব্রাহ্মণের জন্য অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট যত্ন। এতদ্ভিন্ন বঙ্গদেশের সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র সকলের সম্পাদকতার অন্তস্তলে দৃষ্টি করিলে ব্রাহ্মণের হাতই প্রবল দেখা যাইতেছে। যোগেন্দ্র নাথ বসুর অর্থবল ও চন্দ্রনাথ বসুর জ্ঞানবল ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের জন্য ব্যয়িত দেখিয়া কে এই যাদুকর ধর্ম্মের অভ্যুত্থান সম্বন্ধে সন্দিহান থাকিতে পারে?

আমরা সর্ব্ব সাধারণ হিন্দুকে জিজ্ঞাসা করি, ইহা কি আমাদের মঙ্গলের জন্য হইতেছে? যে জাতি আপনা হইতে ধর্ম্ম স্বাধীনতা পরপদে অর্পণ করে, তাহার কি কর্ম্ম স্বাধীনতা কখন ঘটে? মনে বল সঞ্চিত না হইলে, কি হাতে বল আসে?

শঙ্করাচার্য্যের উত্থানের পর যে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল—মহাভারত পুরাণ কৃত্রিমতা প্রাপ্ত হইয়া যে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য ঘোষণা করিয়াছিল, তাহাতে হিন্দুর জাতীয় জীবন কয়দিন স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছিল? হিন্দু জাতি আবার কেন সেই ভুলের পথে অগ্রসর হয়? ইহাই আমাদের প্রশ্ন। প্রশ্ন—যাহারা হিন্দু জাতির মঙ্গল কামনা করে, তাহাদের প্রতি; যাহারা কেবল ছলে বলে কলে কৌশলে বা অর্থলোভে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য প্রচার করে, তাহাদের প্রতি নহে।

বর্ণ-ভেদ-প্রধান-ধর্ম্ম অভিমানমূলক এবং অভিমান নিশ্চয়ই পতনের কারণ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যাঁহারা ষড়্‌-রিপু দমনই হিন্দুধর্ম্মের মূল প্রকৃতি মনে করেন, তাঁহারাই, রিপুর মধ্যে প্রধান রিপু অহঙ্কার-ভিত্তিতে—হিন্দুধর্ম্ম স্থাপন করিতে চাহেন! আমি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; আমি কায়স্থ, বৈদ্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; বা আমি বৈদ্য, কায়স্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; আমি শৌণ্ডিক, নবশূদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; আমি নবশূদ্র, চর্ম্মকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; ইত্যাদি প্রকারের অভিমানের বণ্টনে জাতিভেদের উৎপত্তি। ইহার সহিত অনৈক্য নিত্য বর্ত্তমান। এই বর্ণ ভেদ লইয়া হিন্দুধর্ম্ম যদি পুনরুত্থিত হয়, তবে হিন্দুর দুর্ভাগ্যের আর শেষ থাকিবে না।

এ ত গেল হিন্দুর ঘরের কথা। বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের গ্রীবাভঙ্গি আরও চিন্তার বিষয়। কেননা, উহা অশান্তির কথা। এই অশান্তির লক্ষণ এক্ষণ আর অস্পষ্ট নাই। গোবিলাট ব্যাপারে মুসলমান ও গবর্ণমেণ্ট ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের গ্রীবাভঙ্গি দমনার্থে যে মুষলাঘাত করিতেছেন, তাহা, বোধ হয়, কাহার অবিদিত নাই; কিন্তু ইহাতে যে সকল হিন্দুর রক্তপাত হইতেছে, বা কারাবাস হইতেছে, তাহারা কি ব্রাহ্মণ, না নিম্ন ও মধ্য শ্রেণীর হিন্দু? বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন, তাহারা ব্রাহ্মণ নয়। ব্রাহ্মণধর্ম্ম, সর্ব্বসাধারণ হিন্দুকে, মুসলমান ও দেশীয় খ্রীষ্টানের বিরুদ্ধে সুতরাং ইংরেজ রাজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া মহানিষ্টের সূত্র তুলিয়াছেন। মধ্য ও নিম্ন-শ্রেণী হিন্দুর ইহা ভাবিবার কথা, সন্দেহ নাই।

তাহাদের বিশেষ ভাবনার বিষয় এই হওয়া উচিত যে, ব্রাহ্মণ যদি ব্রাহ্মণ্যের জন্য চেষ্টা করে, হিন্দু কেন হিন্দুত্বের জন্য চেষ্টা করিবে না। বিশুদ্ধ হিন্দুত্ব সত্যধর্ম্ম। সকল ধর্ম্মের

সহিত অবিরোধই বিশুদ্ধ হিন্দুত্ব। কোরাণ পাঠ, পুরাণ পাঠ বিশুদ্ধ হিন্দুর নিকট তুল্য, কেননা সকল ধর্ম্মের উদ্দেশ্য এক—ঈশ্বরে ভক্তি ও মানবে প্রীতি। তাহা কোরাণে ও পুরাণে উভয়েই আছে। সকল মনুষ্য সমান, ইহাও বিশুদ্ধ হিন্দুত্ব। ধর্ম্মকর্ম্মে সকলেরই সমাধিকার, ইহাও বিশুদ্ধ হিন্দুত্ব। ব্রাহ্মণ, যেমন বর্ণপ্রাধান্য রক্ষার জন্য জাগরুক হইয়াছে, হিন্দুর সেইরূপ হিন্দুত্ব রক্ষার জন্য জাগরুক হওয়া উচিত।

হিন্দুধর্ম্মকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে হইলে নিম্ন লিখিত পন্থা অবলম্বনীয়।

(১) বেদের মন্ত্রভাগের সমাদর।

(২) পুরাণের প্রতি সাধারণতঃ অশ্রদ্ধা।

(৩) কোরাণের যে যে অংশ উপনিষদের মর্ম্মের সহিত সমপ্রকৃতিক, দেব ও পৈতৃক কার্য্যে তাহার পাঠ বা তাহার অনুবাদ।

(৪) সর্ব্ব জাতি ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে সজল ব্যবহার।

(৫) দেব ও পিতামাতার কার্য্যে সংস্কৃত ভাষার পরিবর্ত্তে স্থানীয় ভাষার ব্যবহার। বঙ্গদেশে চণ্ডীপাঠ, গীতাপাঠ বা বৃষোৎসর্গের মন্ত্র বাঙ্গলায় পাঠ হউক, ইত্যাদি।

(৬) বর্ণ নির্ব্বিশেষে পুরোহিত নিয়োগ।

(৭) ক্রমশঃ বর্ণভেদ প্রথা উঠাইয়া দেওয়া।

এ প্রস্তাব ব্রাহ্মধর্ম্মের নহে। ইহা খ্রীষ্ট বা মহম্মদীয় ধর্ম্মের প্রস্তাব নহে। ইহা হিন্দুত্বের ভিত্তিতে, ভারতাগত সর্ব্ব ধর্ম্মের সঙ্গে, সখ্য স্থাপনের প্রস্তাব। আচণ্ডাল সর্ব্ববর্ণের উন্নতির পথে ইহাতে কণ্টক প্রদান করিবে না। কোরাণিক ধর্ম্মের সহিত সখ্য স্থাপিত হইবে। ইংরেজরাজের শাসন, সুগম ও সুশৃঙ্খল হইবে। যদি ইহা না হইয়া, বর্ণভেদমূলক, বিষবীজ স্বরূপ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রবল হয়, তাহা হইলে, জাতিভ্রষ্ট ও জাতিযুক্ত, অর্থাৎ কোরাণিক ও পৌরাণিক সকল হিন্দুরই অমঙ্গল।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

কৃষিকার্য্যের উন্নতি। (১০)

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জীবিতাণুর সংহার প্রকরণ।

কি পাতা, কি ফল, কি ফুল, কি জন্তুগণের মৃত শরীর, যাহা কিছু পচিয়া যায়, তাহাতেই এক বা ততোধিক প্রকার জীবিতাণু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিতে পাওয়া যায়। জল, বায়ু, কাঁচা ফল, পাতা ও ঘাস, ইত্যাদি পদার্থের সহযোগে নানা প্রকার জীবিতাণু সর্ব্বদাই জন্তুগণের শরীরে প্রবিষ্ট হইতেছে। কখন কখন জীবিতাণু সকল গাছের পাতার নিম্নভাগে যে সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে, ঐ ছিদ্র মধ্যে স্থান লইয়া থাকে। জীবিতাণু সকল সর্ব্বদা বায়ু, জল প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য পদার্থে সর্ব্বদাই বিচরণ করিতেছে বলিয়াই যে সর্ব্বদাই উদ্ভিদ্ ও জন্তুর সংক্রামক রোগ হওয়া সম্ভব, এরূপ মনে করা উচিত নহে। (১) সকল প্রকার অণু হইতেই যে ব্যাধি উৎপত্তি হয়, এরূপ নহে। (২) অণু সকল উদ্ভিদ্ ও জন্তুর শরীরের মধ্যে

প্রবেশ করিবার বড় সুবিধা পায় না। নাসিকারন্ধ্রের মধ্যে কেশ ও সর্দ্দিতে অণু সকল আট্‌কাইয়া গিয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হইবার অবসর পায় না। পত্রের নিম্ন ভাগে ছিদ্র সকল থাকিবার কারণ এবং ছিদ্র গুলি নিতান্ত ক্ষুদ্র হইবার কারণ, কোন অণুই সহসা উদ্ভিদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। (৩) অণু সকল জন্তুদিগের শরীর মধ্যে প্রবেশ করিবার অধিক সুবিধা পাইলেও, এই গুলির নাশের জন্য জন্তুদিগের শরীরের মধ্যে কতকগুলি উপায় আছে। পাকস্থলির অম্লরস, যকৃত নিঃসৃত পিত্তরস, এবং রক্তের শ্বেত কণিকা স্বভাবতঃই অণু-নাশক। বাস্তবিক সুস্থ শরীরি জন্তুর রক্ত যেরূপ অণু-বিবর্জ্জিত, অন্য কোন স্বাভাবিক রস, এরূপ অণু-বিবর্জ্জিত আছে কি না, সন্দেহ। জগৎপাতা যে আশ্চর্য্য কৌশলে জন্তুদিগের শরীর গঠিত করিয়াছেন ও এই শরীর পোষণের জন্য যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে স্বভাবতঃ ও সাধারণতঃ শোণিতের মধ্যে ব্যাধিজনক জীবিতাণু জন্মিবার অতি অল্পই সম্ভাবনা। (৪) জীবিতাণু-গুলি প্রায়ই নিজ নিজ নাশের উপাদান প্রস্তুত করিয়া থাকে। অণুতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই সকল উপাদান সংগ্রহ করিয়া যে এক কালে সমস্ত সংক্রামক রোগের নিরাকরণোপায় স্থির করিতে সমর্থ হইবেন, ইহা নিতান্ত দুরাশা বোধ হয় না। এক প্রকার অণু দ্বারা শর্করা বিশ্লিষ্ট হইয়া মদিরা উৎপাদিত হয়। এই অণু মদিরা সংযোগে বৃদ্ধি হইতে পারে না, মদিরার সারভাগ ইস্পিরিট্ দ্বারা বিনষ্ট হয়। আবার আর এক প্রকার অণু সংযোগে মদিরা হইতে শির্কা প্রস্তুত হয়; শির্কার সারভাগ এসিটিক এসিড্ দ্বারা এই অণুর নাশ হয়। আর এক জাতীয় অণু দ্বারা ওলাউঠা জন্মে। এই অণুর নাইট্রিক্ এসিড্ উৎপাদন করা আর একটী কার্য্য। নাইট্রিক্ এসিড্ দ্বারা এই অণুর নাশ হয়। যে জাতীয় অণু যে অণু-নাশক পদার্থ উৎপাদন করে, সেই পদার্থ যে কেবল সেই জাতীয় অণুকেই নাশ করিতে সমর্থ, অন্য অণু নাশ করিতে সমর্থ নহে, এরূপ নহে। ইস্পিরিট, এসিটিক্ এসিড্ ও নাইট্রিক্ এসিড্ সকল প্রকার অণুই নাশ করিতে সমর্থ। তবে যে অণু যে অণুনাশক পদার্থ উৎপাদন করে, সেই পদার্থ সেই অণুকে যত অল্প পরিমাণ ব্যবহার দ্বারা নিবারণ বা নাশ করিবে, অন্য অণুকে তত অল্প পরিমাণ ব্যবহার দ্বারা নিবারণ বা নাশ না করিতে পারে। জীবিতাণু গুলি (Schizomycetes) অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্। কেবল যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্ই আত্মনাশের উপাদান উৎপন্ন করে, এরূপ নহে। বৃহৎ জাতীয় উদ্ভিদ্গণও অল্প বিস্তর আপন আপন জীবনের অস্বাস্থ্যকর পদার্থ উৎপাদন করে। বৃক্ষ, গুল্ম, ওষধি প্রভৃতি বৃহজ্জাতীয় উদ্ভিদ্ সকলের শিকড় হইতে এক এক প্রকার রস নিঃসৃত হয়। যে উদ্ভিদ্ হইতে ঐ রস নিঃসৃত হয়, ঐ উদ্ভিদের পক্ষে প্রায়ই ঐ রস হানিজনক। তবে ঐ রস অম্ল বলিয়া মৃত্তিকার উপাদান সকল গলিত করিয়া শিকড় মধ্যে প্রবেশ করিবার সুবিধা জন্মাইয়া দেয়। ক্লোভার নামক এক জাতীয় উদ্ভিদ্ যে জমিতে এক বৎসর জন্মান যায়, প্রায় পর বৎসর ঐ জমিতে পুনরায় ক্লোভার জন্মান অসম্ভব হইয়া পড়ে। ক্রমাগত একই জমিতে একই প্রকার উদ্ভিদ্ জন্মাইয়া ঐ জমি ক্রমশঃ ঐ উদ্ভিদ্ জন্মিবার পক্ষে অল্প বিস্তর অনুপ

যুক্ত হইয়া পড়ে। জমির ক্লোভার-বিতৃষ্ণ ভাব (Clover sickness) অন্য উদ্ভিদের পক্ষে তাদৃশ সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত না হইলেও, এই ভাবটী কৃষি বিজ্ঞানের একটী মূল-সূত্র বিজ্ঞাপক বলিয়া মানিতে হইবে। কোন্ জাতীয় উদ্ভিদ কতকাল একই স্থানে জন্মিলে, ঐ উদ্ভিদ ঐ স্থানটীতে জন্মিবার অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে, তাহা বলা যায় না। ম্যালেরিয়া অণু যে ভূভাগে জন্মিয়া থাকে, ক্রমশঃ ঐ ভূভাগটী ঐ অণু জন্মিবার পক্ষে নিশ্চয়ই অনুপযুক্ত হইয়া পড়িবে। মুরশিদাবাদ, বর্দ্ধমান, প্রভৃতি যে সকল ভূভাগ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঘোর ম্যালেরিয়ার আবাস স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইত, এক্ষণে যে ঐ সকল ভূভাগে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হ্রাস হইয়া আসিতেছে, এবং ভবিষ্যতে যে ঐ সকল ভূভাগে ম্যালেরিয়া দেবীর একবারে অরুচিকর হইয়া পড়িবে, তাহা এক প্রকার স্থির। 'এক প্রকার' শব্দ ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্য এই, স্বভাবের গতি অতি জটিল ও বিচিত্র। বিল, ডোবা প্রভৃতি স্থানে ম্যালেরিয়ার অণু ক্রমাগত জন্মিয়া, ঐ বিল, ডোবা প্রভৃতি আধারে ঐ বিশেষ অণুনাশক এক প্রকার পদার্থ জন্মিয়া, ঐ গুলি ঐ অণু জন্মিবার পক্ষে ক্রমশঃই অনুপযুক্ত হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু প্রতি বৎসরে যদি বন্যায় ঐ অণু ও অণুনাশক পদার্থ উভয়ই ধৌত করিয়া লইয়া যায়, তবে অবস্থাগুলির সমগ্র সমষ্টি কি হইয়া দাঁড়ায়, কে বলিতে পারে? (৫) রৌদ্র, বায়ুর অম্লজান ও ওজোন্, সুগন্ধ পুষ্প, এই সমস্তও অণুনাশক বা অণুরোধক।

ব্যাধিজনক অণু জন্মিবার ও ক্রমশঃ বংশ পরম্পরায় বৃদ্ধি হইয়া যাইবার পক্ষে নানাপ্রকার নৈসর্গিক অন্তরায় থাকাতেও, মনুষ্য ও ইতর জন্তু এবং উদ্ভিদের মধ্যে প্রায়ই সংক্রামক রোগ জন্মিবার কথা শুনা যায়। এ কারণ সংক্রামক রোগ জন্তু বা উদ্ভিদের মধ্যে দেখা দিলেই কতকগুলি সাধারণ প্রতিকার পন্থা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। (ক) সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইলে জঙ্গল কাটা, পুষ্করিণী ঝালা, নর্দ্দমা পরিষ্কার আরম্ভ করা, অথবা অন্য কোন পূতিগন্ধ বিশিষ্ট পচা দ্রব্য আলোড়িত করা, উচিত নহে। এ সকল বিষয়ে পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইতে হয়। কিন্তু রোগ উপস্থিত হইলে এইরূপ আলোড়ন দ্বারা রোগের বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস হওয়ার সম্ভব নাই। ফল, পাতা, জল, ময়লাদ্রব্য, ইত্যাদি যাহাতে পচিবার না অবসর পায়, এ বিষয়ে সর্ব্বদাই সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইলে এইটী বুঝিতে হইবে, পচন প্রক্রিয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে জল ও বায়ুর সহিত পচনাণু মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে এবং অপরিষ্কার দ্রব্য সমুদায়ের আলোড়ন দ্বারা ঐ বিশেষ অণু আরও অধিক পরিমাণে জল ও বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া পীড়ার বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারে।

(খ) গোষ্ঠের যদি একটী গাভির গুটি, গলাফুলা বা অন্য কোনরূপ সংক্রামক রোগ উপস্থিত হয়, তবে যেন ঐ গাভিটী অন্যত্রে লইয়া যাওয়া না হয়। ঐটীকে ঐ স্থানেই রাখিয়া সুস্থ গাভিগুলিকে স্থানান্তরিত করিতে হয়। গো-মড়ক উপস্থিত হইলে এইরূপ স্থানান্তর করণের হুকুম কখন কখন গবর্ণমেণ্ট হইতে বাহির হয়। প্রায়ই দেখা যায়, কৃষক ও গোয়ালাগণ অজ্ঞানতাবশতঃ পীড়িত গোরুগুলিকেই স্থানান্তরে লইয়া যায়। ইহা দ্বারা এই ফল হয়, যে পীড়িত গোরুটী যে

গোঠে ছিল, ঐ গোঠে সুস্থ গোরুগুলি থাকিয়া ক্রমশঃ তাহাদিগেরও পীড়া হয়, এবং পীড়িত গোরুটী স্থানান্তরিত করিবার কারণ অন্যান্য স্থানে পীড়াদায়ক অণুগুলি ছড়াইয়া পড়িয়া অন্যত্রেও মড়ক উপস্থিত হয়।

(গ) স্থানান্তরিত করিবার সময় সুস্থ জন্তু গুলির সমুদায় গাত্র তুঁতিয়ার জল দ্বারা ধৌত করিয়া ও তাহাদিগকে হিরাকষ খাওয়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

(ঘ) আলু, গোধুম বা অন্য কোন ওষধির সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইবার পরে, যে ফসল হইবে, তাহা অন্যত্র স্থানান্তরিত না করিয়া, যে ক্ষেত্রে ঐ সকল জন্মিয়াছে ঐ ক্ষেত্রেই রাখিবার বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য। যদি ব্যাধিগ্রস্ত শস্য অন্যত্রে স্থানান্তরিত করিবার নিতান্ত আবশ্যক হয়, ঐ শস্য তুঁতিয়ার জলে ডুবাইয়া ও তৎক্ষণাৎ উঠাইয়া স্থানান্তরে গিয়া শুকাইয়া লইয়া পরে ঐ শস্য রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

(ঙ) যে কোন বীজ হউক না কেন, উহা অণুনাশক কোন পদার্থে ডুবাইয়া লইয়া, পরে উহাকে বপন করা উচিত। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ কর্পূরের জলে ভিজাইয়া বপন করিলেও চলিতে পারে। সাধারণ কৃষিকার্য্যের উপযোগী বীজ সকল (ধান্য, গম, গহমা, আলু ইত্যাদি) তুঁতিয়ার জলে ডুবাইয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ উহাদিগকে চুণ ও ভস্ম দ্বারা শুকাইয়া লইয়া বপন করিলে, ধসা লাগিয়া গাছ নষ্ট হইবার সম্ভব থাকে না।

(চ) উদ্ভিদ্ ও জন্তু উভয় প্রকার জীবই সবল হইয়া জন্মিতে থাকিলে, ব্যাধিজনক অণুদ্বারা উহারা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। উদ্ভিদের পক্ষে জল ও সার এবং জন্তুর পক্ষে খৈল, কলাই, ছোলা, গমের ভূসি, লবণ, মেথি, ইত্যাদি তেজস্কর ও মুখরোচক খাদ্য, জীবিতাণু সকল শরীর মধ্যে জন্মিবার পক্ষে প্রতিবন্ধক।

(ছ) জন্তুদিগের মধ্যে কোন প্রকার সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইলে, সুস্থ জন্তু গুলিকে স্থানান্তরিত করিয়া শুদ্ধ উহাদের তেজস্কর খাদ্য খাইতে দিয়া নিরস্ত থাকা উচিত নহে। উহাদের অণুনাশক কোন না কোন পদার্থ কয়েক দিবস ধরিয়া প্রত্যহ খাইতে দেওয়া উচিত। যত দিবস কোন মারিভয় প্রবল থাকিবে, তত দিবস পর্য্যন্ত সুস্থ ও অসুস্থ সকল জন্তুকেই এইরূপ কোন পদার্থ প্রত্যহ খাওয়ান উচিত। কুইনাইন্, তুঁতিয়া, হিরাকষ, চুণ, রসকর্পূর, কর্পূর, খাঁটি রাইয়ের তৈল, সোহাগা, শেঁকোবিষ, পুদিনা, লেবুর রস, ঘোল, গোলমরিচ ও শির্কা, এই কয়েকটী অণুনাশক পদার্থ প্রায় সর্ব্বত্রেই পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে যেটী বা যে গুলি ব্যবহার করা সুবিধা মনে হইবে, সেইটী বা সেই গুলিই ব্যবহার করা উচিত। ইহাদের মধ্যে রসকর্পূর, শেঁকোবিষ, ও কুইনাইন কিছু অধিক বিষাক্ত বলিয়া অতি অল্প মাত্রায় ব্যবহার করা অথবা একেবারে ব্যবহার না করা বিধেয়। খাঁটি রাইয়ের তৈল যেরূপ উৎকৃষ্ট অণুনাশক পদার্থ, সাধারণ ব্যবহারোপযোগী এরূপ উৎকৃষ্ট অণুনাশক পদার্থ আর নাই। ২০০০ ভাগ অন্য পদার্থে এক ভাগ মাত্র রাইয়ের তৈল (Mustard oil) মিশ্রিত থাকিলে উহাতে প্রায় কোন প্রকার অণুই জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না। খাঁটি রাই-সর্ষের তৈল গাত্রে মর্দ্দন করা ও উহা দ্বারা ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া খাওয়া ও ভাতের সহিত প্রত্যহ লেবু ও দধি বা ঘোল খাওয়া যে কত উৎকৃষ্ট প্রথা,

তাহা বলা যায় না। গোয়ালারাও খাঁটি রাইয়ের তৈল, ঘোল ও মরিচ, গোরুর অনেক গুলি গূঢ় ব্যাধিতে ব্যবহার করিয়া উপকার পায় বলিয়া প্রকাশ করে।

(জ) কোন জন্তু বা উদ্ভিদ্ সংক্রামক রোগে মরিয়া গেলে, উহার দেহ ও উহার সংশ্রবে যাহা কিছু ছিল, সমস্তই অগ্নি দ্বারা নষ্ট করিয়া ফেলা উচিত। অগ্নি দ্বারা যদি কোন বস্তু নষ্ট করিলে অধিক ক্ষতি হয়, তবে ঐ বস্তু তুঁতিয়ার জলে ডুবাইয়া লওয়া উচিত। পাস্তুর সাহেবের পরীক্ষাগারে যে সমস্ত জন্তু মরিয়া যায়, উহাদের একটী তুঁতিয়ার জলের চৌবাচ্চায় ফেলিয়া রাখা হয়। এক দিবস কাল তুঁতিয়ার জলে থাকিবার পরে কৃষকগণ এই সকল মৃত দেহ সাররূপে নিজেদের জমিতে ব্যবহার করে। ইহাতে পাস্তুর সাহেবের কারখানায় যে সমস্ত উৎকট রোগের বীজ লইয়া পরীক্ষা করা হয়, এই সকল উৎকট রোগের অণু অন্যত্রে গিয়া ক্ষতি করিতে পারে না। গোরুর গুটীর (Anthrax) বা অন্য কোন উৎকট রোগের টিকা-রস যদি কখন অসাবধানতা বশতঃ এই কারখানার কোথাও ছিট্‌কাইয়া পড়ে, তবে তৎক্ষণাৎ তুঁতিয়ার জল ছিটাইয়া দেওয়াতে, উহা দ্বারা কোন অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা থাকে না।

কোন্ পদার্থ কি অনুপাতে ব্যবহার করিলে অণু সকল মৃত অথবা নিবারিত (Inhibited) হয়, তাহার একটী সাধারণ তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল। সকল প্রকার অণুতেই যে এই অনুপাত খাটিবে, এরূপ নহে। ইহার মধ্যে কতকগুলি পদার্থ কেবল ওলাউঠার অণুতেই পরীক্ষিত হইয়াছে। আবার কতকগুলি ব্যাধিজনক অণুতে পরীক্ষিত না হইয়া, কেবল চিনির জলের গাঁজলা (Saccharomyces cerevisæ) অথবা মদিরার গাঁজলা (Bacillus Aceti) এইরূপ দুই একটী নির্দ্দোষ অণু সম্বন্ধেই পরীক্ষিত হইয়াছে। কি পরিমাণে কোন্ পদার্থ ব্যবহার করিয়া উপকার পাওয়া যাইবে, নিম্নলিখিত তালিকা দ্বারা এ বিষয়ে একটী সাধারণ জ্ঞান মাত্র জন্মিবে। অণু বিশেষে ইহাদিগের মধ্যে কোন কোন পদার্থ অধিক পরিমাণে ব্যবহার না করিলে উপকার দর্শিতে না পারে।

আইয়োডাইড অব্-মার্কারি (দুই লক্ষ ভাগের এক ভাগ)	১ : ২,০০,০০০
বাইক্লোরাইড-অব্-মার্কারি (=রসকর্পূর) ...	১ : ১,০০,০০০
নাইট্রেট্-অব্-সিল্‌ভার (=কাষ্টিক) ...	১ : ৫০,০০০
হাইড্রোজেন পেরক্সাইড্ ...	১ : ৮,০০০
আইয়োডিন্	১ : ৬,০০০*
কুইনাইন্	১ : ৫,০০০
আইয়োডোফরম্	১ : ৫,০০০
ন্যাপ্‌থালিন্	১ : ৪,০০০
তুঁতিয়া	১ : ২,৫০০
খাঁটি রাই-সর্ষপের তৈল	১ : ২,০০০
স্যালিসিলিক্ এসিড্	১ : ২,০০০
পুদিনার তৈল ...	১ : ২,০০০
বেন্‌জোইক্ এসিড্	১ : ১,৫০০
পারমাঙ্গানেট্-অব্-পটাশ্	১ : ১,০০০
ইউকালিপ্টস্ তৈল	১ : ৬০০
কারবলিক্ এসিড্	১ : ৫০০
হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড্ ...	১ : ৫০০

* জর্ম্মণ পণ্ডিত কোখ্ ওলাউঠা অণুর জন্য ১ : ১০ অনুপাতে আইওডিন্ আবশ্যক ইহা স্থির করেন।

সোহাগা	... ... ১:৩৫০	ল্যাকটিক্ এসিড্ (ঘোল-অম্লসার)	১:১২৫
কর্পূর	... ... ১:৩০০	কার্বনেট্-অব্-সোডিয়াম্ ...	১:১০০
শেঁকো বিষ (আরসেনিক্)	১:২৫০	আল্কোহল্ (খাঁটি মদ)	১:১০
ক্লোরাইড্-অব্-জিঙ্ক	১:২৫০		

শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।

স্ত্রীশিক্ষা-বিবরণ। (৩)

স্ত্রীশিক্ষার প্রতিষ্ঠা।

স্ত্রীশিক্ষার এতদূর চর্চ্চা ও বিস্তার হইলেও, তাহা এতদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত হইবে কিনা,--তাহা চিরদিন চলিবে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল। ক্রমে ক্রমে সে সন্দেহের নিরসন হইতে লাগিল।

১৮৪৯ হইতে ১৮৫৯ অব্দ পর্য্যন্ত দশ বৎসর কাল স্ত্রীশিক্ষা যে প্রণালীতে চলিয়া আইল, তাঁহাতে তাহার এই লক্ষণ প্রকাশ পায় যে,--

"পরাশ্রে বাঁচিল প্রাণ পরের পালনে।"

বিদেশীয় সাহেবেরা উপদেশ দিলেন, উৎসাহ দিলেন, পুস্তক রচনার নিমিত্ত ইংল ণ্ডীয় উপাদান দিলেন, টাকা দিলেন, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন, এবং আপনারা বহু আয়াস স্বীকার করিয়া সেই সকল বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। তবে এ দেশের স্ত্রীদিগের বিদ্যাধ্যয়ন ধীরে ধীরে প্রচলিত হইতে লাগিল।

পরন্তু হিন্দুসমাজের পত্তনগড় যে সংস্কার বা নির্ম্মাণ-কার্য্য, তাহা বিদেশীয় ব্যাপার হইয়া কতদিন চলিবে? অন্তরালযুক্ত অন্তঃপুরের যে শিক্ষা-বিধান, তাহার অস্তিত্ব ও জীবন বিদেশীয় সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া কতদিন থাকিতে পারে? অর্থ ও তত্ত্বাবধানের গোলযোগে এক সময় হিন্দু-[illegible] সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। বেথুন সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয়ও টলমল হইয়াছিল। গবর্নমেন্টের আনুকূল্যে এই দুই বিদ্যালয় রক্ষা পাইল। কিন্তু এই সময়ে বালকদিগের শিক্ষার জন্য হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা আপনাদের যত্নে যে সকল বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, সে সকল বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব পক্ষে তেমন কোন সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই।

স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হইবার পক্ষে সন্দেহের কারণ এই যে, (১) উহার বিপক্ষ লোক বিস্তর, (২) বাল্যবিবাহ নিবন্ধন স্ত্রীদিগের শিক্ষার সময় অল্পই থাকে, (৩) স্ত্রীশিক্ষা কি কার্য্যে আসিবে, তাহার কোন পরিচয় নাই, (৪) বিদেশীয় লোকের বা গবর্নমেন্টের অর্থ সাহায্যের উপর কোন ভরসা করা যায় না। এই সকল বিঘ্ন অতীব গুরুতর; সহজে অনতিক্রমণীয় বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তাহা ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইতে লাগিল। ঘরে ঘরে স্ত্রীশিক্ষা আত্মগুণেই প্রচলিত হইল। স্ত্রীশিক্ষা এদেশে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, আর লুপ্ত হইবে না; উহা রুদ্ধ করিতে লোকের আর প্রবৃত্তি জন্মিবে না; এমন সম্ভাবনা হইল।

কিরূপে এই মহৎফল সাধিত হইল, তাহা বুঝিতে হইলে এ দেশীয় কৃতবিদ্য যুবকদিগের নানা চেষ্টা, উদ্যোগ ও আয়োজনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হয়।

THE SOCIETY FOR THE ACQUISITION OF GENERAL KNOWLEDGE.

"সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা।"*

আমাদের চিরকৃতজ্ঞতা-ভাজন মহামনা ইংরাজগণ এদেশীয় বালক ও বালিকাদের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত যে প্রভূত যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহারা অনুর্ব্বর ভূমিতে বীজ বপন করেন নাই। হিন্দুদিগের বিপুল ফলশালী চিত্তক্ষেত্র কিছুদিন কর্ষণ-বিরহিত হইয়া পতিত ভূমির লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই ক্ষেত্রেরই পূর্ব্বোপজাত বীজ পুনর্বপন করিলে যেমন ফল উৎপন্ন হওয়া সম্ভব, তাহাই অবশ্য হইবে।

আমরা ১৮১৮ অব্দের স্থাপিত স্কুল সোসাইটীর কথা উল্লেখ করিয়াছি। সেই সোসাইটীর সাহায্যে যিনি প্রথমে বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন, তিনি এখন ইংরাজী ভাষায় সুবক্তা ও বহু ভাষায় সুপণ্ডিত, রেভেরণ্ড পদে প্রতিষ্ঠিত প্রসিদ্ধ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহাকে লইয়া হিন্দুকলেজের অন্যান্য উত্তীর্ণ ছাত্রেরা † উপরোক্ত নামে এক সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। ছাত্রাবস্থায় স্বল্প সঞ্চিত জ্ঞানের বৃদ্ধি করা আবশ্যক এবং দুর্দ্দশাগ্রস্ত জন্মভূমির উন্নতির উদ্দেশে পরস্পরের সম্মিলন ও সদ্ভাব সঞ্জাত করা আবশ্যক। এই নিমিত্ত এই সভার অনুষ্ঠান হয়। প্রায় দুই শত যুবক ইহার সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ সংস্কৃত কলেজ গৃহে সভার অধিবেশন হইত। ১৮৩৮ অব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী ইহার অনুষ্ঠানপত্র প্রচারিত, ১২ মার্চ্চ ইহা স্থাপিত এবং ১৬ই মে ইহার কার্য্যারম্ভ হয়।

ইহাতে ধর্ম্ম প্রসঙ্গ ব্যতীত অন্য সকল হিতকর বিষয়ের আলোচনা হইত। ইহার সভ্যেরা যে দুই ইংরাজ মহাপুরুষের অক্লান্ত চেষ্টায় কৃতবিদ্য হইয়াছেন, দুই মহতী সভায় তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া এক্ষণে তাঁহাদেরই আশানুরূপ আত্মোন্নতি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশোন্নতির জন্য এই সভা স্থাপন করিয়াছেন।

এই সভার ১৮৩৯ অব্দের ৯ জানুয়ারী দিবসীয় অধিবেশনে বাবু মহেশচন্দ্র দেব কর্ত্তৃক হিন্দু স্ত্রীদিগের অবস্থা বিষয়ে ইংরাজীতে এক বক্তৃতা হয়। তাহাতে বক্তা স্ত্রীদিগের বর্ত্তমান নানাপ্রকার হীনাবস্থার বিষয় বর্ণন করিয়া শেষে বলিলেন, দ্বিতীয় বারে আমি স্ত্রীদিগের শিক্ষার বিষয় বলিব,

"For that alone furnishes a remedy to all those heavy evils which I have endeavoured to delineate above."

কারণ, স্ত্রীদিগের সম্বন্ধে যে অনিষ্ট রাশির কথা উপরে ব্যক্ত করিলাম, কেবল শিক্ষা-দান দ্বারাই তাহার প্রতিকার হইতে পারে।

১৮৪০ অব্দের ৮ই মে দিবসে উক্ত সভার এক অধিবেশনে, রেভেরেণ্ড কৃষ্ণ-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজ সংস্কার বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। তাহাতে বাল্য-বিবাহের দোষ এবং স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা, এই দুই বিষয় বিশেষরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছিল।

হিন্দু স্ত্রীদিগের শিক্ষা প্রদান

* অন্যান্য বিষয়ের ন্যায়, বঙ্গভাষার উন্নতি এই সভার বিশেষ লক্ষীভূত ছিল। ১৮৩৮ অব্দের ১৩ই জুন উক্ত সভায় বাবু উদয়চন্দ্র আঢ্য কর্ত্তৃক "এতদ্দেশীয় লোকদিগের বাঙ্গলা ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করণের আবশ্যকতা বিষয়ক প্রস্তাব" পঠিত হয়। সেই প্রবন্ধের শিরোদেশে এই বাঙ্গালা নাম লিখিত হইয়াছিল।

† বাবু রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ি, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, রাজকৃষ্ণ দত্ত প্রভৃতি।

১৮১৯ অব্দে পিয়ার্স সাহেব যুবেনাইল সোসাইটী স্থাপন উপলক্ষে ইংরাজ মহিলা-দিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, পাঠকগণ তাহা জানিয়াছেন। তাহার ২০ বৎসর পরে হিন্দু যুবকেরা * কি বলিয়া পরস্পরকে জাগাইয়া তুলিতেছেন, তাহা একবার দেখুন:—

"It is impossible that a nation can take rapid strides to civilization while half the members that compose it are sunk in ignorance and degradation. The very persons who are to instil the first elements of knowledge into the tender mind and after whom the little infant learns to lisp broken sentences are suffered to continue uneducated and uninstructed. Can the nation then make any high progress toward refinement? Can the people reap the advantages and enjoy the blessings of education to a considerable extent, while their partners in life grovel on the dust of superstition and darkness? Can the tide of improvement run on with progressive strength from generation to generation, if the infant mind can never be educated and if we can never impart instruction to those that are weaned from the milk and drawn from the breasts? The fact can never be so and therefore we must educate our daughters with the same care as our sons, if we are to expect the advancement of our country in the scale of happiness."

তত্ত্ববোধিনী সভা এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানোন্নতি সভার যে উদ্দেশ্য, তত্ত্ববোধিনী সভারও প্রায় সেই উদ্দেশ্য। বিশেষ এই যে, জ্ঞানোন্নতি সভাতে ধর্ম্ম প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইত না, তত্ত্ববোধিনী সভাতে প্রচুররূপে ধর্ম্ম চর্চ্চা ও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি উদ্দীপনার ব্যবস্থা হইয়াছিল। জ্ঞানোন্নতি সভার কার্য্যারম্ভের ১৭ মাস পরে, ১৮৩৯ অব্দের অক্টোবর মাসে, তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপিত হয়। * উক্ত সভা দেশের হিত ও ধর্ম্মোন্নতি সাধন বিষয়ের আলোচনায় পরিপক্কতা লাভ করিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। ১৭৬৫ শকের ভাদ্র মাসে এই পত্রিকার জন্ম হয়। এই সভার সহিত তদানীন্তন প্রায় সকল সুশিক্ষিত, দেশহিতৈষী, ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিরই যোগ ছিল। হিন্দু কালেজ ও সংস্কৃত কালেজ, এই দুই মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষিত সর্ব্বোত্তম গুণসম্পন্ন যুবাপুরুষেরা, ইংরাজী ও সংস্কৃত উভয় প্রকার ভাষার গ্রন্থ হইতে জ্ঞানরত্ন সংগ্রহ করিয়া, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে আলোকিত ও অলঙ্কৃত করিতেন। এই পত্রিকা প্রকাশের তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরে তাহাতে স্ত্রীদিগের দুরবস্থা ও তাহাদের বেদাদি শাস্ত্রে অধিকার বিষয়ে ২।৩টী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানোন্নতি সভায় এবং তাহার পরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে এইরূপে উদ্বোধন মাত্র হইয়াছিল। ইহার পর প্রায় দশ বৎসর এই যুবকেরা স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে আর কোন চেষ্টা করিতে পারেন নাই। এই দশ বৎসরের শেষভাগে বেথুন সাহেব বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

এতদ্দেশীয়েরা কেবল যে স্ত্রীশিক্ষারই বিরোধী ছিলেন, তাহা নহে। ১৮১৭ অব্দে যখন হিন্দু কলেজ স্থাপন হয়, ১৮৩৫ অব্দে যখন মেডিকেল কলেজ স্থাপন হয়, এবং শেষে ১৮৪৯ অব্দে যখন বেথুন সাহেব বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, এই তিন ঘটনাতেই তাঁহারা নির্ব্বিকার চিত্তে এই

* এই সভা হিন্দু নামে আপনাদের পরিচয় দিয়া আসিতেছেন এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সেই দল ভুক্ত হইয়া প্রথম দিবসাবধি সভার উজ্জ্বলতা সাধন নিমিত্ত বক্তৃতা করিয়াছেন।

* ১৭৬১ শকের ২১এ আশ্বিন রবিবার কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী।

তিন মহৎ অনুষ্ঠানের বৃহৎ দোষ ঘোষণা করিয়াছিলেন। দ্বাত্রিংশদ্বর্ষব্যাপী এই নিন্দা বর্ষণের মধ্য দিয়া উক্ত তিন হিতকর বিদ্যালয়ের গুণগরিমা যে বিদ্যোতিত হইতে লাগিল, তাহার প্রধান কারণ এই যে ঐ তিন বিদ্যালয়ের দ্বারাই বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। সর্ব্বসাধারণে স্বীকার করুন্ বা না করুন্, ফলতঃ ইহা তাঁহারা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছিলেন যে, তাঁহাদের ঘরে ঘরে কি অনিন্দনীয় জ্ঞানরত্ন সুগম ভাষার মনোরম পত্রে বিতরিত হইতেছে। এই বঙ্গভাষা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন, সুমার্জ্জিত ও অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অঙ্গকে সুশোভিত করিত। তাহাতে তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যগণের কার্য্যক্ষেত্র নানাদিকে বিস্তারিত হইল এবং তাহাদের সকল কথা ও সকল কার্য্যই যশোমণ্ডিত ও প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইল। পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানোন্নতি সভার প্রাণ মানবীয় উৎসাহমাত্রকে অবলম্বন করিয়াছিল, অতএব তাহা অধিক দিন স্থায়ী হইল না। তত্ত্ববোধিনী সভা, অনন্ত অক্ষয় পুরুষের অবলম্বনে, অক্ষয় লেখনী দ্বারা, অক্ষয় ফল উৎপাদন করিতে লাগিল।

ভক্তিযোগ।

যে সকল সদাশয় ইংরাজ নানা প্রকারে আমাদিগের মহোপকার সাধন করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা আমাদিগকে দীন দেখিয়া দয়া করেন, কেহ বা এক রাজার প্রজা ভাবিয়া আমাদের প্রতি সহানুভূতি করেন, কেহ বা এক ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া আমাদিগের প্রতি ভ্রাতৃভাবাপন্ন ও অনুরক্ত হয়েন; কিন্তু যাঁহারা ভারত মাতার গর্ভজাত সন্তান, তাঁহারা পরস্পরকে আরো কিছু গভীর সম্বন্ধে নিবদ্ধ দেখিবেন। তাঁহারা পরস্পরের প্রতি অনুরাগ বা সহানুভূতি বা দয়া প্রদর্শন করিলেই যথেষ্ট হইবে না। যাহাকে ভক্তি বলা যায়, স্বদেশের সর্ব্ব শুভ বিষয়ের প্রতি তাঁহাদের সেই ভক্তি চাই, বিরুদ্ধ-ভাব-শূন্য ভক্ত পুত্রের ন্যায় প্রতিনিয়ত জন্মভূমির সেবা করা চাই, এবং ভারতমাতার নিজের ক্ষেত্রজাত নব নব দ্রব্যে, অনাঘ্রাত পুষ্প চন্দনে তাঁহার অর্চ্চনা করা চাই। যাঁহারা ভগবৎ পূজা জানেন, তাঁহারাই এইরূপে মাতৃপূজা করিতে পারিবেন।

তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যেরা ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সর্ব্বার্থ সাধনের প্রত্যাশা করিতেন। তাঁহারা তাঁহাদের সভা স্থাপনের প্রথমাবধি এই তথ্য দেখিয়া আইলেন যে, হতভাগ্য ভারতভূমির মঙ্গলের জন্য যিনি যে কোন অনুষ্ঠান করিতে চান, তিনি নব বিঘ্ন দ্বারা পর্য্যাকুলিত হইয়া পড়েন। তাঁহারা দেখিলেন, বেথুন প্রভৃতি মহাত্মাগণ এদেশের মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি ও বালিকা বিদ্যালয়ের যে ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাতে রাজা, প্রজা, কোন পক্ষ হইতে সম্পূর্ণরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হয়েন না। সুশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়স্থ হিন্দু যুবকেরা যাহা আলোচনা করেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন না। রাজপুরুষেরাও বারবার ইংলণ্ডের বায়ুর গতি অনুসারে অদ্য এক ব্যবস্থা, কল্য অপর এক ব্যবস্থা করিতেছেন; সুতরাং তাঁহাদের প্রতি লোকের বিশ্বাস স্থির থাকিতেছে না।

এই সকল লক্ষণ দেখিয়া, তত্ত্ববোধিনী সভা ঊর্দ্ধে ঈশ্বরের দিকে চাহিলেন; দীন দুস্থ হইলেও আপনাদের মর্য্যাদা বুঝিলেন;

এবং একাগ্র চিত্তে ভক্তিযোগে স্বদেশীয় লোকের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। ঈশ্বর তাঁহাদের সহায়। তাহাতে ঈশ্বরের অপরাপর পুত্রেরাও তাঁহাদের দিকে আকৃষ্ট ও তাঁহাদের সহিত ভ্রাতৃত্ব রক্ষা করিতে উন্মুখ হইলেন।

জন্মলাভের অল্প দিন পরেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নানা সম্প্রদায়স্থ লোকদিগের ব্যবহারের দোষ গুণ বিচার করা অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিলেন। পরন্তু অকৃত্রিম সরলতা, অটল ব্রতশীলতা, নিরবচ্ছিন্ন দেশহিতৈষিতা, এবং ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য থাকাতে তত্ত্ববোধিনীর কথা লোকে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক অবহিত হইয়া শুনিতে লাগিল।

হিন্দুধর্ম্ম-দ্রোহী খ্রীষ্টান মিশনরিগণ ও তাঁহাদের সপক্ষ লোকেরা তাহার প্রথম লক্ষীভূত হইলেন। দ্বিতীয়, বাঙ্গালা ভাষার প্রতি এবং নীতি শিক্ষার প্রতি অবহেলাকারী শিক্ষা-সমাজ-সংক্রান্ত কর্ম্মচারীগণ। তৃতীয়, প্রজা পীড়নকারী জমিদারগণ। চতুর্থ, কৃষক-মোষণকারী নীলকরগণ।

১৭৬৫ হইতে ১৭৭২ শকাব্দ (১৮৪৩ হইতে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত ৮ বৎসরের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় "কলিকাতার বর্ত্তমান সময়ের দুরবস্থা", "হিন্দু স্ত্রীদিগের দুরবস্থা", এবং "পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা" পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অতি সহৃদয়তার সহিত বর্ণিত হইয়াছিল। আর "স্বদেশীয় ভাষায় বিদ্যাভ্যাস" ও "হিন্দুকলেজের শিক্ষা প্রণালী" সম্বন্ধে যথার্থ কৃতবিদ্য লোকের ন্যায় সমীচীন সমালোচনা করা হইয়াছিল। তাহাতে ঐ পত্রিকার লেখকগণ যশস্বী হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের কেমন অকৃত্রিম মিত্র, সুবুদ্ধি মন্ত্রী, সুবক্তা উকীল, ধর্ম্মনিষ্ঠ উপদেশক, এবং কেমন বিনীত ভক্ত, তাহা উজ্জ্বল অক্ষরে সর্ব্ব হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়াছিল।

অতঃপর উক্ত পত্রিকায় বাল্যবিবাহাদি সামাজিক কুসংস্কারের নিরাকরণ নিমিত্ত যে সকল আলোচনা হইয়াছিল এবং যে ধর্ম্মনীতির শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল, তৎপ্রতি লোকের বিদ্বেষবুদ্ধি অধিক কাল স্থান পায় নাই। ক্রমে ক্রমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এদেশের সর্ব্ব বিষয়ে জ্ঞানদায়িনীরূপে পরিগৃহীত হইল। তদন্তর্গত প্রবন্ধাবলি হইতে সঙ্কলিত হইয়া ধর্ম্মনীতি, পদার্থবিদ্যা, এবং তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার অধীত * ভূগোলাদি পুস্তক বিদ্যালয় সমূহের পরমোৎকৃষ্ট পাঠ্য পুস্তক শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট হইল।

শাস্ত্রানুশীলন।

তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদিগের হৃদয়ে যে ভক্তি যোগের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহার প্রথম কার্য্য সেই ভক্তিবৰ্দ্ধনকারী শাস্ত্রানুশীলন।

ইংরাজী ভাষায় যাঁহারা সুশিক্ষিত, তাঁহাদের দৃষ্টি স্বদেশীয় ভাষার প্রতি ব্যাবৃত্ত হইলে অচিরকাল মধ্যে জ্ঞানের অনন্ত আকর স্বরূপ সংস্কৃত শাস্ত্রের মহিমা উক্ত কৃতবিদ্যগণের জ্ঞানগোচর হইল। তাঁহারা ইউরোপের আদি, মধ্য ও বর্ত্তমান যুগের সাহিত্য, বিজ্ঞান, ও ইতিহাসে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। অতএব স্বদেশের চারি যুগজাত গ্রন্থাবলী হইতে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের সার সঙ্কলন করিতে তাঁহাদের সম্যক্ পারগতা জন্মিয়াছিল।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা চিরদিন বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রের মহাবাক্য রূপ দিব্য অলঙ্কারে

* ১৭৬২ শকে অধীত এবং ১৭৬৩ শকে মুদ্রিত হয় (১৮৪০।৪১ খ্রীষ্টাব্দে)।

বিভূষিতা হইয়া আসিতেছেন। তাহার জন্মের পর তৃতীয় বর্ষ (১৭৬৭ শক) হইতে মহাভারতীয় শ্লোকমালা তাহার কণ্ঠে বিলম্বিত হইয়াছিল। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমাবধি তত্ত্ববোধিনী সভা দ্বারা অষ্টাদশ পুরাণ ও চতুর্ব্বেদ সংগ্রহ আরম্ভ হইয়াছিল এবং অনুবাদ সমেত ঋগ্বেদ সংহিতা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছিল। ১৭৭০ শকের ফাল্গুন মাসের পত্রিকাতে মহাভারতের বঙ্গানুবাদ আরম্ভ হয়। তদুক্ত স্থান ও পুরুষগণের পরিচয় নানা গ্রন্থ হইতে সমাহৃত হইয়া টীকার আকারে বিন্যস্ত হইয়াছিল।

তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যেরা শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন পূর্ব্বক অমৃতোদ্ধারে কেমন নিপুণ হইয়াছিলেন, ১৮৪৮-৫১ খ্রীষ্টাব্দের (১৭৬৯-৭২ শক) পত্রিকাতে তাহার বিশিষ্ট নিদর্শন প্রদত্ত হইয়াছে। ঋগ্বেদের অনুবাদের কতিপয় পংক্তি বিশিষ্ট ভূমিকায় এবং "পাণ্ডুপুত্র ও ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদিগের অস্ত্র পরীক্ষা," "মহাভারতীয় সভাপর্ব্ব" "প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্র যাত্রা" ও বাণিজ্য বিবরণ, "ভারতবর্ষ মধ্যে হিন্দু সন্তানদিগের বসতি বিস্তার", (মানচিত্র সমেত) এবং উপাসক সম্প্রদায় সংক্রান্ত অন্যান্য বৃহৎ প্রবন্ধে অমৃতভাণ্ড-রূপিণী তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় যে সত্যামৃত সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা উক্ত পত্রিকাকে চিরজীবিনী করিয়া রাখিয়াছে। সেই সকল প্রবন্ধ গুণেই অক্ষয়কুমার বঙ্গভাষার অক্ষয় কুমার হইয়া রহিয়াছেন।

তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যেরা, এইরূপে ঋষিতর্পণ করিয়া, ভারতের যথার্থ ভক্ত সন্তান বলিয়া পরিগণিত হইলেন। যখন মূল শাস্ত্রামৃতের অপূর্ব্ব আস্বাদ বঙ্গীয় সমাজের বহুলোক জানিতে পারিয়াছিলেন, তখন স্ত্রীদিগের বিদ্যাশিক্ষার অধিকার ও ঔচিত্য বিষয়ে পণ্ডিত তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এবং পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার যে প্রবন্ধ সকল প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ, যুক্তি, ও সহৃদয় বর্ণনা এদেশের লোকের গ্রহণীয় হইয়াছিল; তখন বেথুন বিদ্যালয়ের অঙ্কিতঃ—

"কন্যাপেব্যং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ"

এই মহাবাক্যের তাৎপর্য্য লোকের উপলব্ধি হইয়াছিল। তখন অনেকের নিকট প্রতিপন্ন হইল যে, স্ত্রীদিগের বিদ্যাশিক্ষা স্বভাববিরুদ্ধ বা সাহেবী কাণ্ড নহে; উহা হিন্দুধর্ম্ম-সঙ্গত এবং পূর্ব্বাপর ব্যবহার সিদ্ধ।

ফলতঃ স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণ লোকের যে সকল বিরুদ্ধ সংস্কার ছিল, তাহা একে একে অপগত হইল। তাহাতে স্ত্রীশিক্ষার সুদৃঢ় বিঘ্নকারীরা ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন এবং তাহার অনুরাগীদিগের উদ্যম জয়যুক্ত হইতে লাগিল।

স্ত্রীদিগের শিক্ষণীয় বিষয়।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি লোকের বিপক্ষতার হ্রাস হইল বটে, কিন্তু এখনো একটী সমস্যা রহিল।

স্ত্রীদিগের কিরূপ শিক্ষা হওয়া উচিত? তাহাদের পঠনীয় পুস্তক কি প্রকার? কাহাদিগের দ্বারা কুলকন্যাগণের সুশিক্ষার আধান হইতে পারে? এই সকল বিষয়ের বিচার বড় গুরুতর। বিশেষতঃ স্ত্রীদিগের পাঠ্যপুস্তকের প্রকৃতি অতীব বিচারণীয়। স্ত্রীশিক্ষার অনুরাগী ও উদ্যোগী ব্যক্তিবর্গ বিপক্ষদিগের তাড়নায় উপরোক্ত বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে যে দুই মহাত্মার পুস্তক

ও উপদেশ বিবরণ ব্যক্ত করিয়াছি, তাঁহাদের লিখন ও কার্য্য দ্বারাও ঐ তথ্য বিদিত হয়।

তত্ত্ববোধিনী সভা স্থানে স্থানে বালকদিগের শিক্ষার্থ পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু স্ত্রীদিগের শিক্ষার নিমিত্ত কোন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বা তাদৃশ কোন আয়োজন করেন নাই। তাহার কারণ এই হইতে পারে যে, তাঁহারা উল্লিখিত সমস্যার পূরণ করিতে সক্ষম হয়েন নাই।

এই সময়ে সুবিখ্যাত বিদ্যাসাগর-রচিত কথামালা, চরিতাবলী প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তকের প্রচার হইয়াছিল, কিন্তু তাহার কোনখানিই স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ উপযোগী নহে।

সুতরাং স্ত্রীশিক্ষা ব্যাপার কিছুদিন ইংরাজদিগের উপরে নির্ভর করিয়া রহিল। তাঁহারা যে কোনরূপে হউক, স্ত্রীশিক্ষার চর্চ্চা জাগাইয়া রাখিলেন। বিদেশীয় ব্যক্তির সাধ্য পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।

স্কুলবুক সোসাইটী এবং বর্ণেকিউলর লিটরেচর কমিটী বা সোসাইটী দ্বারা গার্হস্থ্য বাঙ্গা .. পুস্তক সংগ্রহ নামধেয় যে পুস্তকাবলী প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

সেই পুস্তক-স্তবকের মধ্যে কতকগুলি বিচিত্র গল্প কথায় রচিত; আর কতকগুলি বীরাঙ্গনাচরিত। বালিকাদিগের মনোরঞ্জন পূর্ব্বক বিদ্যাশিক্ষার প্রতি তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা গল্প-পুস্তকগুলির উদ্দেশ্য। তাহার অধ্যাপনার ফল লাভ হইয়াছে কি না, বলা যায় না। বীরাঙ্গনা চরিত পাঠের ফল কিছু হয় নাই বলিয়া বোধ হয়।

"স্ত্রীরা স্বভাবতঃ অবলা, কোমল স্বভাবান্বিতা ও বীর্য্যহীনা বলিয়া প্রসিদ্ধা। পরন্তু অনেক নারী রণস্থলে স্বয়ং সৈন্য চালনা করতঃ যেরূপ বীর্য্য ও সাহসের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিলে অনেক পুরুষকে বিশেষতঃ বঙ্গদেশীয়দিগকে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়;—" এই বলিয়া বিবিধার্থ সংগ্রহকার জাহানিরা, নুরজাঁহা, বোয়াডেসিয়া ও দুর্গাবতী প্রভৃতি রণরঙ্গিণী ও রাজ্যপালনক্ষমা স্ত্রীদিগের আদর্শ এদেশীয়দিগকে দেখাইয়া "বিস্ময়ান্বিত" করিয়াছিলেন। কিন্তু সে বিস্ময়ের কোন ফল এই সমাজে সম্প্রতি সমুদ্ভূত হইবার নহে। তথাপি ঐ সকল স্ত্রীর উপাখ্যান দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইল যে স্ত্রীরাও "পুরুষজাতির মত কি রাজ্য রক্ষা, কি যুদ্ধবিগ্রহ, কি প্রতিজ্ঞাপালন, সকল কার্য্যই সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিতে পারে, সন্দেহ নাই।" *

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অনুবাদক সমাজের পুস্তক ও পত্রিকাদি দ্বারা স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে এইরূপ চর্চ্চা হইতেছিল।

বালক বালিকার স্বভাব সুন্দরমূর্ত্তি সর্ব্ব অবস্থাতেই নূতন নূতন সৌন্দর্য্য ধারণ করে। কখন দন্তবিরহ, কখন দন্তোদ্গম, কখন অৰ্দ্ধ পরিস্ফুটভাষা, কখন নানা কথা, কখন রাখালবেশ, কখন রাজপরিচ্ছদ, শৈশবের সকল শ্রী মনোহর হয়। মূলে যখন বিশ্বাস হইল যে স্ত্রীশিক্ষা অস্বাভাবিক বা বৈজাত্য ব্যাপার নহে, তখন বালিকাদিগের বিদ্যালয় গমনের নিমিত্ত চঞ্চলতা, বিভিন্ন প্রকার পরিচ্ছদ, পুস্তকাদির ব্যবহার, নানা পাঠের আবৃত্তি এবং অনুবাদক সমাজের পুস্তকাবলীর স্ত্রী আদর্শ,—নূতন বলিয়া এ সকলই ভাল লাগিয়াছিল। শ্রীঈশানচন্দ্র বসু।

* জাহানিরার চরিত—১২৬৬ সাল।

বেঙ্গল স্যানিটারী ড্রেণেজ বিল। (১)

গুরুতর প্রশ্ন। গবর্ণমেন্ট লোক সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার কল্পনা করিয়া, একটী অভিনব কৃষি-কর স্থাপনের ব্যবস্থা করিতেছেন।

এক দিকে অসুস্থ বঙ্গভূমির স্বাস্থ্য রক্ষার কল্পনা; অপর দিকে করভার-পীড়িত দরিদ্র কৃষি-বলের উপর পুনঃ নূতন কর; প্রশ্ন উভয় দিকেই গুরুতর।

আপাততঃ এক বস্তু অপেক্ষা অপর এক বস্তুর অধিকতর আবশ্যকতা যদি এ দেশে থাকে, সে বস্তু,— স্বাস্থ্য। বাঙ্গালীর অসংখ্য অভাবের মধ্যে স্বাস্থ্যের অভাব সর্ব্বোপরি। পশ্চিম, উত্তর, মধ্য বাঙ্গালার অস্থি মজ্জায় ম্যালেরিয়া; জ্বর-জ্বালা, মহামারির মর্ম্মান্তিক দংশনে কত জনাকীর্ণ নগর আজ বন-পূর্ণ, সমৃদ্ধিশালী গণ্ডগ্রাম অধঃপাতিত, কত প্রফুল্ল পল্লী পরিত্যক্ত, প্রায় শ্মশান-দৃশ্যে পরিণত হইয়াছে;—কত বা হইতে বসিয়াছে। ম্যালেরিয়ার মহামারি নিত্য, নৈমিত্তিক; -উহা অবিচলিত আহ্নিক ও বার্ষিক গতিতে রাশি-চক্রবৎ বঙ্গীয় গ্রাম পল্লী পরিক্রমণ করে, প্রহার ও প্রপীড়ন করে;--প্রজ্জলিত হুতাশন-মুখে পতঙ্গবৎ বঙ্গীয় প্রজা ম্যালেরিয়া-বিষে মরিয়াছে, মরিতেছে। কিন্তু এই বিষ-বৃক্ষের ফল কেবল মৃত্যু নহে,- ততোধিক কঠোর,- জীবন্মৃত্যু! বালক বৃদ্ধবৎ বিকলাঙ্গ, বুদ্ধিহীন, স্ফূর্ত্তিহীন, শোণিত-মাত্র-পরিশূন্য-দেহ-যষ্টি! যুবক যৌবনে জরাগ্রস্ত, কঙ্কালসার, অকর্ম্মন্য! নেত্র কোঠোরাভ্যন্তরগত, মলিন দীপ্তি;—উদর আকণ্ঠ অম্ল-ক্লেদ-শ্লেষ্মা পূর্ণ, স্ফীত, প্লীহা যকৃতের প্রমোদোদ্যান! হস্তপদ সর্ব্বাঙ্গ শরীর শিথিল,—সূক্ষ্ম শলাকাবৎ প্রতিভাত;—রক্ত-মাংস-বিহীন কলেবরের অস্তিত্ব কেবল একখানি অতি বিবর্ণ, রুক্ষ চর্ম্মাভ্যন্তরে, বিলুপ্ত স্বাস্থ্যকে বিদ্রুপ করিবার জন্যই যেন বিদ্যমান!—মানুষ মানুষী ম্লান মুখে কুইনান্ খায়, আর মৃত্যু কামনা করে!! 'কোয়াকী', কবিরাজী, আধিভৌতিক এবং অবধৌতিক প্রভৃতি প্রেতভূমি-জাত এবং প্রেতাবিষ্কৃত 'পেটেণ্ট' ঔষধাবর্জ্জনার প্রবঞ্চনা-প্রবাহে বঙ্গীয় পল্লী, এ মুহূর্ত্তে, প্রকৃত প্রস্তাবে, প্লাবিত!

ইহা অতিরঞ্জিত চিত্র নহে;—ম্যালেরিয়া-পীড়িত গ্রাম এবং নগর পল্লীর সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেদীপ্যমান দৃশ্য! যথাসর্ব্বস্ব বিনিময়েও যদি এ অসুস্থ দেশ স্বাস্থ্য পায়, তাহাতেও আমরা অসম্মত নহি। স্বাস্থ্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। এদেশে, উপস্থিত অবস্থায়, সর্ব্বথা সে প্রয়োজনীয়তা অতীব প্রবল।

রাজ-শক্তি লোক সাধারণের স্বাস্থ্য বিষয়ে উদাসীন নহে, তজ্জন্য আগ্রহের সহিত উদ্যোগী, ইহা অপেক্ষা অধিকতর আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? ইহা আনন্দের বিষয়,—এদেশীয় লোকের সবিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়ও বটে। অতএব স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ও তাহার উপস্থিত অধিনেতা স্যর চার্লস ইলিয়ট-কৃত এই স্যানিটারী ড্রেণেজ বিল অর্থাৎ স্বাস্থ্য রক্ষার্থে গ্রাম্য পয়োপ্রণালী সৃষ্টি বা সংস্কার-বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলেখ্য সম্বন্ধে অন্য কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বে, এবং তাহার বিরুদ্ধে শত প্রতিবাদের উপর আমাদের সহস্র প্রকারের প্রতিবাদ থাকিলেও আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করিতেছি যে, এ ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য সৎ এবং অভিপ্রায় মহৎ; পরন্তু, এ সম্বন্ধে সকার্য্য-

পালনানুরাগের জন্য স্যর চার্লস লোক সাধারণের ধন্যবাদার্হ।

কিন্তু এই ম্যালেরিয়া-নিপীড়িত দেশে স্বাস্থ্য বিধানের উপায় কি? কোনও প্রকৃষ্ট উপায় অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে কি? ম্যালেরিয়া বীজ কিসে এবং কোথা হইতে উৎপন্ন, তাহা আদৌ বৈজিক কিনা? ম্যালেরিয়া-জাত জ্বরের কেবল একটী মাত্র কারণ অথবা তাহা কারণ পরম্পরার সমষ্টি-সম্ভূত, আধুনিক এবং উন্নত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান এসম্বন্ধে কি উত্তর দেন? আদৌ কোনও সদুত্তর দিতে সমর্থ হইয়াছেন কি না? অপিচ ম্যালেরিয়ার কারণ অনুসন্ধান কল্পে এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত যত সমীচীন চিকিৎসক ও প্রবীণ পণ্ডিত সরকার বাহাদুর কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাদের অনুসন্ধান ফল ও অভিমত কি? পরন্তু এক্ষণ গবর্ণমেণ্ট উহার যে কারণের কল্পনার উপর অতিমাত্র নির্ভর করিয়া আইন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, ম্যালেরিয়ার প্রতিকার কল্পে, তাহার মূল্য কত, উপকারিতা কি এবং তাহার উপকারিতা অপেক্ষা, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার পথে অপকারিতা অধিক কিনা? স্যর চার্লস ইলিয়টের বেঙ্গল স্যানিটারি ড্রেণেজ বিল সাবধানে ও শীতল চিত্তে যাঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন, ইহার আমূল ইতিবৃত্ত ও মূলতত্ত্ব যাঁহারা অবগত আছেন, প্রথমেই এই সকল প্রশ্ন তাঁহাদের মনে উদয় হয়। এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য সৎ, অভিপ্রায় মহৎ; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কোন্ উদ্দেশ্য সৎ এবং মহৎ নয়? রাজকীয় বিধি ব্যবস্থার ফলাফল ভবিষ্যতে যাহাই ঘটুক, মূলে তাহার উদ্দেশ্য অসৎ নয়। তাহাতে অসৎ অভিসন্ধি আরোপ করা অন্যায়। যে প্রজা-নীতি পদে পদে রাজ-নীতির উপর অভিসন্ধি আরোপ করে, আমরা তাহার পোষকতা করিতে পারি না। তাহা রাজা প্রজা উভয়কেই প্রবঞ্চিত করে। এই স্যানিটারি ড্রেণেজ বিল যেরূপ ভাবে গঠিত ও তৎপরে বঙ্গেশ্বরের নিজ মুখে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা সুবুদ্ধিসম্মত না হইতে পারে, সুবুদ্ধিসম্ভূত নয়, কারণ তদ্দ্বারা কুফল ফলিবে; কিন্তু তাহা অসদভিপ্রায়ে অনুপ্রাণিত নহে, ইহা আমরা পুনঃ পুনঃ বলিতেছি।

ম্যালেরিয়ার যে কল্পিত কারণের উপর নির্ভর করিয়া গবর্ণমেণ্ট এই (তথা কথিত) স্বাস্থ্য-আইনটীর আযোজন করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত এবং পূর্ণ কারণ কিনা এবং তাহা নিবারিত হইলে স্বাস্থ্য-বিধানের সম্ভাবনা কি পরিমাণ আছে, আদৌ আছে কিনা, অন্যান্য বিষয়ের সহিত তাহার অপক্ষপাত পর্য্যালোচনা এই প্রবন্ধের যথাস্থানে করা যাইবে। এস্থলে কেবল এই মাত্র বক্তব্য যে স্বাস্থ্যের এই কল্পনা, কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এই আইনের আয়োজনে আমরা দেখিতে পাইতেছি, এক দিকে একটী কল্পনা, অপর দিকে একটী কর। কল্পনা সুন্দর, সৎ এবং স্বাস্থ্যের কল্পনা,—অতি উপাদেয়; কিন্তু কেবল কল্পনা মাত্র, অনির্দ্দিষ্ট, অনিশ্চিত, ম্যালেরিয়া নিবারণ কল্পে একরূপ "অজগর ভিক্ষা" স্বরূপ। এক দিকে এই; অপর দিকে একটী বৃহৎ কর,—যে কর প্রধানতঃ দেশের দরিদ্র কৃষিবলের উপর প্রযুক্ত। স্বাস্থ্য সর্ব্বাগ্রে প্রার্থনীয় এবং যথা সর্ব্বস্ব বিনিময়েও তাহা বাঞ্ছনীয় হইলেও, আমাদের আলোচ্য এই আইনে আছে কেবল তাহার একটী অতি অনির্দ্দিষ্ট কল্পনা। তদ্দ্বারা

নিরূপিত করটী কিন্তু কল্পনা নহে। তাহা নিশ্চিত, অতি নির্দ্দিষ্ট কঠোর সত্য;—ম্যালেরিয়ায় মুহ্যমান, বহুকরভারে-ক্লিষ্ট-কঙ্কাল-কৃষক সম্প্রদায়ের শেষ এক বিন্দু শোণিতের সহিত সংমিশ্রিত।

এখন জিজ্ঞাস্য, এ ব্যাপারে তুলাদণ্ডের কোন্ দিক গুরুভারে অবনত,—স্বাস্থ্যের কল্পনা কিম্বা কৃষি করের দিক? আলোচ্য, স্বাস্থ্যের একটী কল্পনার জন্য, বঙ্গীয় কৃষকের শেষ শোণিত বিন্দু হইতে কর নিষ্কাসিত করা উচিত কিনা?

এ দেশীয় কৃষকের অবস্থা যিনিই যাহা ভাবুন, স্ব স্ব সুখ-স্বপ্নে যিনি যাহাই কল্পনা করুন,—কৃষক সম্প্রদায় সাধারণতঃ নিরন্ন। তাহারা অন্ন উৎপন্ন করে বটে, কিন্তু ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া অন্ন আহার করিতে পায় না। 'সুজন্মার' বৎসর যদি তাহারা ছয়মাস খাইতে পায়, অবশিষ্ট ছয় মাস, একেবারে অনসনে না হউক, অর্দ্ধাসনে থাকে। সুজন্মার বৎসরে এই,- অজন্মার বৎসরের কথা কেবল অনুমেয়। আমাদের এ উক্তি অসত্য নয়, অতিরঞ্জিতও নয়। গবর্ণমেণ্ট কৃষকের দ্বারে কমিসন বসাইয়া, সাক্ষাৎ দর্শনের সাক্ষ্য গ্রহণ যদি করেন, উপরোক্ত উক্তি অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হইতে পারে। অন্য কমিশনই বা কেন, পূর্ব্ববর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিয়োজিত ম্যালেরিয়া কমিসনেও (Epidemic Commission) ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়াছে। খাদ্য শস্য দুর্ম্মূল্য হওয়াতে কৃষকের অবস্থা সচ্ছল হয় নাই; * প্রত্যুত প্রভূত পরিমাণে অসচ্ছল হইয়াছে। ইহা ইয়ুরোপীয় অর্থশাস্ত্রের যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন হইতে পারে কিনা দেখিতে চাই না;—কারণ ইহা দেদীপ্যমান দৃশ্য, হৃদয়-বিদারক ঘটনা;—ইহা প্রত্যক্ষ সত্য! প্রত্যক্ষ সত্যের অন্যপ্রমাণের প্রয়োজনাভাব। অবাধ রপ্তানির অশুভ ক্ষণ হইতে এদেশে দুর্ভিক্ষ, অন্নকষ্ট বৎসরের প্রায় বারমাসই বিদ্যমান। গবর্ণমেণ্টের জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত উভয় প্রকারের দুর্ভিক্ষ, এদেশে হইয়া থাকে, প্রায় বারমাসই লাগিয়া আছে। জ্ঞাত দুর্ভিক্ষ বরং মন্দের ভাল, কারণ গবর্ণমেণ্ট তাহাতে কিঞ্চিৎ রিলিফের আয়োজন করিয়া থাকেন; কিন্তু অপরিজ্ঞাত দুর্ভিক্ষের দাবানলে প্রতিদিন কত প্রাণী পুড়িয়া মরে, গবর্ণমেণ্ট কি কখনও তাহার অনুসন্ধান করিয়াছেন? পক্ষান্তরে, অন্ন অমিল ও অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য না হইলেও এদেশে দুর্ভিক্ষ হয়। উদাহরণ অধিক দিনের নয়,—এবারকার ফরিদপুর ও ত্রিপুরার দুর্ভিক্ষ। এই দুই স্থলে অন্ন অমিল হয় নাই, অত্যন্ত দুর্ম্মূল্যও হয় নাই; চারিদিক হইতে তথায় চাউল আমদানি হইয়াছে; চাউলের মণ ৩৷৹ হইতে ৪৲, টাকার অধিক হয় নাই; অথচ তথাকার রায়ত সাধারণ অনশনে কাটাইয়াছে, অন্নকষ্টে হাহাকার করিয়াছে! এ সমস্যা নিশ্চয়ই সুকঠিন। এ সুকঠিন সমস্যা অল্লাধিক পরিমাণে দেশের প্রায় সর্ব্বত্র বিস্তৃত। ইহাতেই অধিক পরিমাণে বুঝা যায়, দেশ দিন দিন কিরূপ দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে। অন্ন অমিল হওয়াকেই সাধারণতঃ দুর্ভিক্ষ বলে। গবর্ণমেণ্টের ফেমিন-কোডেও' দুর্ভিক্ষের এইরূপ লক্ষণ নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু উপরোক্ত প্রকৃতির দুর্ভিক্ষকে কি বলিবে? অন্ন আছে; অথচ অন্ন ক্রয় করিবার অর্থ নাই। ইহা কি খুব ভয়ানক দৃশ্য নহে! এমন দিন যায় না,—এমন

* সচ্ছল হইয়াছে বলিয়া লেঃ গঃ সার চার্লস বিবেচনা করেন।

গ্রাম এবং পল্লী নাই, যে দিন এবং যে স্থানে আমরা এরূপ ভয়ানক দৃশ্য না দেখিতে পাই। ইতর ভদ্র উভয় শ্রেণীরই গ্রাম্য লোকের গৃহে, কৃষিজীবী স্বয়ং কৃষকের ঘরে এ দৃশ্য বিদ্যমান। কৃষকের শ্রমে শস্য উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু তাহাতে কি? সে সবই খাযা ও অন্যান্য করের নামে কারবারির গোলায় চলিয়া যায়। কৃষক তাহা ক্রয় করিয়া খাইতে বাধ্য। কিন্তু, অর্থাভাব। একমাত্র উপায় দ্বিগুণ ত্রিগুণ সুধে ঋণ। ঋণ না পাইলে অনাহার।

সাধারণতঃ কৃষক সম্প্রদায়ের অবস্থা এই! এক বৎসরের খাদ্য শস্য বাঁধিয়া রাখিতে পারে, এমন কৃষক এদেশে হাজার-করা একজনও আছে কি না সন্দেহ। সেন্‌সাস্ গ্রহণের সময় গবর্ণমেণ্ট যদি এবিষয়ের তথ্য সংগ্রহ করেন, দেশের অবস্থা অধিকতর সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইতে পারে।

ফলতঃ কৃষকশ্রেণী গ্রাম্য উচ্চতর বর্ণের ভদ্র সম্প্রদায়ের মত অন্নকষ্টে ক্লিষ্ট। প্রকৃত এই অন্নকষ্ট "সংক্রামক ম্যালেরিয়া জ্বরের' একমাত্র কারণ না হউক, অন্যতম প্রধান কারণ। অবরুদ্ধ পয়ো-প্রণালী যদি ম্যালেরিয়া সৃষ্টির একটী কারণ হয়, তবে তদ্দ্বারা সংহারের অতি প্রধান, এমন কি একমাত্র কারণ অন্নকষ্ট। প্রথমোক্ত কারণটী কল্পিত, কিন্তু শেষোক্তটী সাক্ষাৎ দৃষ্ট। অবরুদ্ধ পয়োপ্রণালী অনিষ্টকর, অস্বাস্থ্যকর, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাতেই যে ম্যালেরিয়া জন্মে, ইহা অদ্যাবধি প্রকৃত প্রস্তাবে প্রমাণিত হয় নাই। কখনও প্রমাণিত হইবে কিনা, সে বিষয়েও ঘোর সন্দেহ। পক্ষান্তরে, অন্নকষ্টে—অনাহারে ও অর্দ্ধাহারে, পরন্তু অসার ও অস্বাস্থ্যকর আহারে, ম্যালেরিয়া উত্তেজিত ও আকৃষ্ট হয়,— এবং তদ্দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ঔষধ পথ্যের অভাবে অধিক লোক মরে, ইহা সকলেই স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং দেখিতেছেন। ম্যালেরিয়ার কারণ অনুসন্ধান কল্পে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত উচ্চপদস্থ, প্রবীণ এবং বিচক্ষণ রাজপুরুষগণ স্বয়ং ইহার সাক্ষ্য দিয়াছেন।

ডাক্তার লেথবিজ সাক্ষ্য দিয়াছেন, কর্ণেল হেগস্ দিয়াছেন। ডাক্তার সণ্ডারস্ ওজস্বিনী ভাষায় ইহা বিবৃত করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট-রেজলিউসনে এ কথা ব্যক্ত আছে। বর্ত্তমান বঙ্গাধীপ বেঙ্গল স্যানিটারি ড্রেণেজ বিলের কর্ত্তা স্বয়ং স্যর চার্লস্ ইলিয়ট * অনিচ্ছাসত্ত্বেও এ কথা অস্বীকার করিতে সমর্থ হন নাই।

ডাক্তার লেথবিজ ও সণ্ডারস্ এবং কর্ণেল হেগস্ সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, অন্নকষ্ট অনুপযুক্ত ও অপর্য্যাপ্ত আহার-জনিত ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব ও প্রকোপ। কেবল ইহাই নহে। ইঁহারা অবরুদ্ধ পয়োপ্রণালী (obstructed drianage) জনিত ম্যালেরিয়া জ্বরের কল্পনা একেবারেই অস্বীকার করিয়াছেন। ইঁহাদের দর্শনে ও বিবেচনায় অবরুদ্ধ ড্রেনের দরুণ ম্যালেরিয়া জন্মে নাই, তাহার কারণ অন্যত্র অনুসন্ধানীয়। পরন্তু, ম্যালেরিয়ার এতাধিক প্রাদুর্ভাব এবং তদ্দ্বারা অসংখ্য লোকের মৃত্যু, লোক সাধারণের অন্নকষ্টাধিক্যহেতু ঘটিয়াছে। ইঁহারা স্ব স্ব অনুসন্ধান ও অভিজ্ঞতালব্ধ প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, যে স্থলে অবরুদ্ধ পয়ো প্রণালী, নিম্ন ভূমি এবং তন্নিবন্ধন সর্ব্বদা সলিল-সিক্ত নিম্নস্থ মৃত্তিকা, তত্র ত

* সঙ্কলন হইয়াছে বলিয়া লেঃ গঃ স্যর চার্লস ইলিয়ট বিবেচনা করেন।

সে স্থলে ম্যালেরিয়া প্রাদুর্ভূত হয় নাই; অথচ অপেক্ষাকৃত উচ্চতর ও অনবরুদ্ধ পয়োনালী সংযুক্ত অঞ্চলে ম্যালেরিয়া জ্বর মহা তেজে মানব মারুযী আক্রমণ করিয়াছে। অতএব ইঁহাদের মতে, অবরুদ্ধ পয়োনালী জনিতই যে ম্যালেরিয়া, এ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া আদৌ সুসঙ্গত নহে। পক্ষান্তরে, অন্নকষ্ট, অপর্য্যাপ্ত আহার ও ঔষধ পথ্যের অভাবে ম্যালেরিয়ার মহামারি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, ইহা ইহাঁদের সাক্ষাৎদৃষ্ট ঘটনা।

কিয়ৎকাল পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে ডাক্তার লেথব্রিজের অভিমতের উল্লেখ করিয়া গবর্ণমেন্ট-রেজলিউসনে লিখিত হইয়াছিল :—

"Dr. Lethbridge is unable to accept the view that dampness of subsoil could be the sole and only cause of the fever. * *" Bengal Govt. Resolution, Dated 31-7-77.(১)

পরন্তু, ডাক্তার লেথব্রিজ ১৮৭৭ সালের ম্যালেরিয়া কমিসনের সভাপতি স্বরূপ, তদীয় রিপোর্টে লিখেন :—

"The poor condition of the people, the practice of steeping jute &c., as causes which in a measure influenced fever out-breaks" (২)

কর্ণেল হেগ বলেন,—"* I do not look upon drainage *per se* as a complete cure or even as the principal means of cure, for the fever which has so desolated the Hooghly and Burdwan Districts. * * * * The excessive mortality must be due to the failing stamina of the population generally, to a de-generation and loss of vital energy which render them less capable of resisting the morbific influences to which they have always been exposed. And I conceive that this is due chiefly to the increase of population having out-stripped the means of production, to an impoverished and under-fed condition of the great mass of the people; in fact, that we now witness the last stage of that process (hastened in this instance by unhealthy conditions of climate, and perhaps also by excessive rents) by which our population, in the absense of any special counteracting or remedial measures works its own cure." Note on the drainage of the Hooghly District of the 27th February, 1873. By Col. Haig. as quoted in the Hindoo Patriot. (৩)

ডাক্তার সণ্ডার্স লিখেন;—"It is sudden variations of temperature and variations in the hygromatric condition of the air * * that is so trying to the impoverished,—half clad and underfed inhabitants of these provinces. * * * I have frequently gone into a home-stead and examined the daily meal,—usually one meal a day only—and that consisting of little rice, with what is called vegetable curry but consisting of 3 or 4 chuttacks of *Sag* and half an anna of oil for the whole family and this was the ordinary daily food." Dr. G. Saunder's report as Deputy Inspector General, dated March 1872, as extracted by H. P. (৪)

পরন্তু, স্বয়ং লেফ্‌টেন্যাণ্ট গবর্ণর স্যর চার্লস ইলিয়টও বলিয়াছেন:—

"No doubt it (malaria) might be aggravated by poverty"—Vide His Honor's speech at Dacca. July, 1894. (৫)

অতএব দেখা যাইতেছে যে, অবরুদ্ধ পয়োনালী হইতে ম্যালেরিয়া উৎপন্ন হয় এবং পয়োনালী পরিষ্কৃত ও প্রশস্ত হইলে ম্যালেরিয়া থাকিবে না, ইহা কেবল একটী কল্পনা নহে, এ কল্পনা সম্বন্ধে সর্ব্বথা মত ভেদ

(১) নিম্ন মৃত্তিকা সিক্ত ও সর্দ্দিযুক্ত হওয়াই যে ম্যালেরিয়া জ্বরের একমাত্র কারণ ডাক্তার লেথব্রিজ এ মত গ্রহণ করিতে পারেন না।

(২) লোকের দারিদ্রতা জনিত হীন অবস্থা, পানীয় জলে পাট পচান প্রভৃতি কারণে ম্যালেরিয়া জ্বর প্রাদুর্ভূত হওয়ার কতক কারণ।

(৩) যে জ্বর হুগলি ও বর্দ্ধমান জিলা ধ্বংস করিয়াছে, ড্রেণেজ দ্বারা আদৌ তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে আরোগ্য হওয়ার উপায় বিধান হইবে, আমি এমন বিবেচনা করিনা। (উক্ত অংশের অবশিষ্ট টুকুর মর্ম্মানুবাদ উপরে দেওয়া হইল।)

(৪) বায়ুর আকস্মিক পরিবর্ত্তন ও নিরতিশয় সিক্ততা দারিদ্র্যে দুর্ব্বল, লোকের অনাবৃত অঙ্গে, অল্প ও অপ্রচুর আহার ক্ষীণদেহে সাংঘাতিকভাবে কার্য্য করে; সুতরাং তাহারা অতি সহজেই এই জ্বরাক্রান্ত হয়। (অবশিষ্ট অংশের মর্ম্মানুবাদ প্রবন্ধের স্থানান্তরে দেওয়া হইল।

(৫) ম্যালেরিয়া জ্বর নিশ্চয়ই দরিদ্রতা দ্বারা বর্দ্ধিত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিদ্যমান। ডাক্তার লেথব্রিজ, সণ্ডারস প্রভৃতি বড় বড় বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক পয়োনালী কল্পনা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিতেই সম্মত নহেন। কিন্তু এ কল্পনা, অন্ততঃ আমরা একেবারে অস্বীকার করিতেছি না। কেন, তাহা পরে বলিব। এ স্থলে কেবল এই মাত্র বক্তব্য যে, কল্পনা কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না এবং ম্যালেরিয়া প্রসঙ্গে এই পয়োনালী কল্পনা সম্বন্ধে সমূহ মতভেদ আছে। কিন্তু, অন্নকষ্টে এবং অপ্রচুর আহারে, এক কথায় দারিদ্র্যের তীব্র দংশনে ম্যালেরিয়া বীজ সৃষ্ট না হউক, তাহা যে বিপুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়, ইহা সর্ব্ববাদী-সম্মত; ইহাতে মতভেদ মাত্র নাই। পয়োপ্রণালীর একান্ত পক্ষপাতী মুবচালস নিজেও একথা অস্বীকার করেন না। পয়োপ্রণালী কল্পনার প্রধান প্রবর্ত্তক স্বয়ং রাজা দিগম্বর মিত্রও ইহা অস্বীকার করেন নাই। ম্যালেরিয়া তথ্যানুসন্ধানের কোনও কমিসনের কোনও মেম্বরই কখনও দেশের নিদারুণ দরিদ্রতা এবং তন্নিবন্ধন ম্যালেরিয়ার মহামারি ও মৃত্যুর আধিক্য, একথা অস্বীকার করেন নাই; প্রত্যুত উহা একটী প্রধান কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

"অনাহার এবং অপ্রচুর আহারে লোক সাধারণের শরীর জীর্ণ শীর্ণ, ক্রমে কঙ্কাল সার হইয়া এবং জীবনের জীবনী শক্তি বিকৃত ও হ্রাস হইয়া দূষিত জল বায়ুর অবসাদময়ী শক্তি নিচয় প্রতিরোধ করিতে পারে না, কাজেই তাহাতে করিয়া অনেক লোকের মৃত্যু হয়, অতএব ম্যালেরিয়ার অত্যধিক মৃত্যু সংখ্যার জন্য দেশের দরিদ্রতাই দায়ী।"—ইহা আমাদের নিজের কথা নহে; গবর্ণমেণ্টের নিজের বিশ্বাস্ত কর্ম্মচারী কর্ণেল হেগের কথা। পরন্তু,—

"অত্যধিক করভার-নিপীড়িত প্রজাপুঞ্জ, প্রজাপুঞ্জের সংখ্যাধিক্য, উৎপন্ন দ্রব্যের অপ্রাচুর্য্য, অতএব অপর্য্যাপ্ত আহার; তাহার উপর জলবায়ুর অস্বাস্থ্যকর অবস্থা,—মহামারির মৃত্যু দ্বারা লোক সংখ্যা হ্রাস করিয়া প্রকৃতি সাংঘাতিক অবস্থার এই শেষ স্তরে আত্মঘাতই সাধন করিতেছে।"

ইহাও আমাদের নিজের উক্তি নহে, উপরি উদ্ধৃত উক্ত কর্ণেল সাহেবের উক্তি। অপিচ,—

"দরিদ্র রায়তের দিন রাত্রে সাধারণতঃ এক বারের অধিক আহার জুটিবার সংস্থান নাই। অল্পপরিমাণে অন্ন ও কাঁচামাত্র তৈল নিক্ত তিন চারি ছটাক শাক ছেঁচকি সংগ্রহ হওয়ালেই সমগ্র পরিবারের দৈনিক আহার।"

এ কথাও আমাদের নিজের নহে, সরকারী কর্ম্মচারী ডাক্তার সণ্ডারস স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া ইহা লিখিয়া গিয়াছেন। রাজপুরুষদিগের কথা রাজদ্বারে অধিকতর বিশ্বাস্য, এই জন্যই আমরা তাহা উদ্ধৃত ও অনুবাদিত করিয়াছি, নহিলে তাহার কিছু মাত্র আবশ্যকতা ছিল না। নিজে আমরা এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রাতেই অবগত আছি, অহরহঃই অনুভব করিতেছি।

ফলতঃ অন্নকষ্টে ম্যালেরিয়াকে অধিকতর কঠোর করে, তদ্দ্বারা ম্যালেরিয়া বর্দ্ধিত হয় এবং রায়ত সাধারণ অন্নকষ্টে ক্লিষ্ট, ও অন্নকষ্টে ক্লিষ্ট বলিয়াই ম্যালেরিয়া দ্বারা অধিকতর দষ্ট, ইহা সর্ব্ববাদী স্বীকৃত, ইহাতে মতদ্বৈধ নাই। পরন্তু, উপস্থিত করভারের উপর স্বাস্থ্যের নামে পুনঃ আর একটী ক্লেশকর বসিলে, অন্নকষ্ট এখন যেরূপ আছে তাহা অপেক্ষা অধিকতর বাড়িবে ইহা সহজ কথা। এ কথা বালকেও বুঝে। পুনশ্চ অন্নকষ্ট বৃদ্ধির অনুপাতে ম্যালেরিয়া ও তন্নিবন্ধন মৃত্যু সংখ্যা নিশ্চয়ই বৃদ্ধি হইবে, ইহা আমরা এই মাত্র প্রতিপন্ন করিলাম। অতএব যে ম্যালেরিয়া হইতে দেশ রক্ষা করিবার জন্য

এই স্যানিটারী ড্রেণেজ বিলের ব্যবস্থা, সেই ম্যালেরিয়াই এ ব্যবস্থায় নিবারিত না হইয়া অধিকতর বর্দ্ধিত হইবে, অগত্যাই ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে। সুতরাং এই বিল, এই হিতে-বিপরীত ফল-প্রদ ব্যবস্থা কি রূপে সমর্থনীয় হইতে পারে। ফলতঃ সরকারের সদুদ্দেশ্য ব্যতীত, এই বিলে আদৌ পাশ্ব আর কিছুই সমর্থনীয় নাই। বেঙ্গল স্যানিটারী ড্রেণেজ বিল একটী অভিনব করবিকরের নামান্তর মাত্র। কৃষকের স্বাস্থ্যের নাম করিয়া, সমগ্র দেশের স্বাস্থ্যের দোহাই দিয়া কৃষক সমাজের উপর এই কঠোর করবিকর বসাইবার প্রস্তাব হইয়াছে।

সুতরাং সদুদ্দেশ্যমূলক রাজনৈতিক অনুষ্ঠান প্রজা মাত্রের সমর্থনীয় হইলেও, উপরোক্ত ও ক্রমে নিম্নে প্রদর্শিত কারণ পরম্পরায়, স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের এই স্যানিটারি ড্রেণেজ বিল আদৌ সমর্থন করিতে পারি না। ইহা আইনে পরিণত করিয়া প্রবর্ত্তিত করিবার পথে গবর্ণমেণ্টকে সহায়তা করিবার জন্যও কোনও সংযুক্তি ও সৎপরামর্শ খুঁজিয়া পাইতেছি না। যে রূপ ভাবে এই বিল প্রস্তুত হইয়াছে ও পরে স্যর চালস কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহাতে উহার প্রতিবাদ করা ভিন্ন, কোনও পরামর্শ দেওয়া আদৌ সম্ভবে না। এই বিল একেবারে প্রত্যাহার করা অথবা ইহার আমূল পরিবর্ত্তন করাই সুপরামর্শ। নহিলে ইষ্টের পরিবর্ত্তে রাজ্যের মহা অনিষ্ট হইবে, ইহা নিশ্চয়। তবে ম্যালেরিয়া নিবারণ কল্পে নিশ্চেষ্ট থাকিতেও আমরা বলিতে পারি না; নিবারণ করার চেষ্টা সর্ব্বথা প্রয়োজন। কিন্তু কৃষকের শেষ শোণিতবিন্দু দ্বারা নহে।

এই বিলের এখন কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বিলখানি ক্ষুদ্র বটে; কিন্তু বিষয়টী বিস্তীর্ণ। স্বাস্থ্যতত্ত্ব, বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক প্রশ্ন, বঙ্গদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক গঠন, তথা লোকসাধারণের অবস্থা, জমিজমার উপসত্ত্বের ভাগ বিভাগ, রায়ত জমিদারের সম্বন্ধ, নানা দিক দিয়া এই বিল আলোচ্য। প্রথমতঃ ইহার ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয়তঃ ইহার মূল তত্ত্ব, তৃতীয়তঃ এই বিলের গঠন, চতুর্থতঃ ইহার উপযোগিতা বা অনুপযোগিতা, পঞ্চমতঃ ইহার ন্যায় নিষ্ঠার পরিমাণ, ষষ্ঠতঃ ইহার কর ও তাহার ব্যবহার, সপ্তমতঃ এই বিলের ফলাফল; এতদুপলক্ষে রাজনীতি ও প্রজানীতির গতি অনেক কথাই আলোচ্য। কিন্তু, সব কথার সম্যক আলোচনার স্থান হইবে না। সংক্ষেপে যত দূর হইতে পারে, চেষ্টা করা যাইতেছে। প্রথমতঃ ইহার পূর্ব্ব ইতিবৃত্ত কিরূপ, কিঞ্চিৎ দেখা যাউক। আক্ষেপের বিষয়, এই বিলের আন্দোলনে অদ্যাবধি কোনও লেখক ইহার আদি ইতিবৃত্তঘটিত কথা উদঘাটিত করেন নাই। অন্ততঃ লোক সাধারণের জ্ঞাতার্থেও তাহার আবশ্যকতা আছে।

পৃথিবীর ইতিবৃত্তে মহামারির ভীষণ চিত্রের অভাব নাই। সংস্কৃত গ্রন্থে বর্ণিত পুষ্কর ও বিসূচিকা ব্যাধির বিষম তরঙ্গে পৃথিবীর এক এক স্থল একেবারে প্রাণীশূন্য হইত। প্রাচীন আথেন্স নগরে বিষম জ্বররূপী "প্লেগের" বর্ণনা থাইসিডাইডিস রাখিয়া গিয়াছেন। ডিফো-বর্ণিত লণ্ডনের মহামারি ও বোকাসিও-বর্ণিত ফ্লরেন্সের প্লেগ-বৃত্তান্ত সাহিত্যে বিখ্যাত,—এক কথায় তাহা লোমহর্ষণ। গৌড় নগর, প্রাচীন বঙ্গের বৃহৎ, বহুজনপূর্ণ, সমৃদ্ধিশালী রাজধানী, শৌর্য্য বীর্য্য

আনন্দ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ বঙ্গের লক্ষণাবতী দুই সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত পৃথিবীতে গৌরব গরিমার রাজপতাকা উড়াইয়া, কি এক সাংঘাতিক ব্যাধি-বীজে সপ্তাহকাল মধ্যে সংহারের শূন্যত্বে পরিণত হইয়াছিল!! * এই মহামড়কে পর্ণকুটীরের প্রজার ন্যায় রাজসিংহাসনে রাজা মরিয়াছিলেন। ইতিহাসাভিজ্ঞ জানেন সে নেহাত অধিক কালের কথা নয়, তিনশত বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া কয়েক বৎসর মাত্র হইয়াছে। কিন্তু তদবধি গৌরবান্বিত গৌড় নগর পরিত্যক্ত, পতিত, অরণ্যময়, বন্যপশুর বিলাসভূমি;—গৌড়ের পুনরুত্থানের আর আশা নাই। কিন্তু তবুও, ইহা প্রাচীন কালের কথা। এ মুহূর্ত্তে হঙকঙ্ হইতে মহামারির যে সকল সাংঘাতিক সংবাদ আসিতেছে, তাহা শুনিয়া কে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন? তাহা একদিকে হৃদয়বিদারক, অপর দিকে বিভৎস। বিজ্ঞানের বিপুল উন্নতি সত্বেও প্রকৃতির এই সকল প্রচণ্ড সংহার-লীলার প্রকৃত কারণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

একালের মহামারির বদ্ধমূল ব্যাধি,—কলেরা ও ম্যালেরিয়া। ইহাদের উভয়েরই বিশেষতঃ ম্যালেরিয়ার বাঙ্গালা নাম অভিধানে নাই,—অদ্যাবধি উদ্ভাবিত হয় নাই। বোধ হয় কখনও হইবে না। ইংরেজের আমলের রোগ ইংরেজী নামেই বাঙ্গালীর দেশে বিরাজ করিবে। কলেরা মহাকালের খাড়া ওয়ারেন্ট; বেঙ্গল পুলিসের A Form এর চালান। ম্যালেরিয়া যদি কলেরার জ্যেষ্ঠ না হয়, অব্যবহিত কনিষ্ঠ সহোদর! কিন্তু কলেরা অপেক্ষা কুটিল, কুৎসিৎ। ডাক্তার ইলিয়ট বলেন;—It was as bad as, if not worse than cholera. ইহা যথার্থ কথা। ম্যালেরিয়াল জ্বরের লক্ষণ কি, আমরা বিবৃত করিতে বসিব না। সে লক্ষণ বাঙ্গালার আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই সবিশেষ অবগত আছেন। কিন্তু এই বিষম জ্বর কবে হইতে, কিরূপে, এ দেশে ব্যাপ্ত হইল?

ম্যালেরিয়া আমাদের ইংরাজ রাজের এই উনবিংশ শতাব্দীর অভিসম্পাৎ। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে, ১৮০৪ সালে, বহরমপুরে ইহা প্রথম দেখা দেয় বলিয়া কথিত। ২০ বৎসর পরে (১৮২৪-২৫ সাল) ইহার দ্বিতীয় আক্রমণ যশহরে। মহম্মদপুর, নলডাঙ্গা এবং এলেনখালি ও চিত্রা নদী তীরস্থ স্থান নিচয় নিদারুণ ভাবে আক্রান্ত হয়। ১৮৪০ সালে এই মহাজ্বর গদখালি নামক গণ্ডগ্রাম জনশূন্য করে। গদখালী হইতে উহা তীব্রবেগে ছুটে, বহুস্থানে ব্যাপ্ত হয়, বহু গ্রাম বিপর্য্যস্ত করে। উলায় গিয়া পৌছে, ১৮৫৬ সালের বর্ষাকালে। উলা গ্রাম উজাড় হয়, শান্তিপুরও হয়। পর বৎসর উহা চাকদহে যায়। চাকদহ হইতে কাঁচড়াপাড়া, হালিসহর, নৈহাটী ও তন্নিকটস্থ গ্রাম কি গ্রাম গ্রাস করে। ১৮৬০ সালে ত্রিবেণী হইয়া কালনায় যায়,—বর্দ্ধমান জিলায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তখন ইহার নাম ছিল "নূতন জ্বর"—সাহেবেরা বলিতেন;—Burdawn Fever, কাঁচড়াপাড়া ও হালিসহরের বর্ত্তমান মূর্ত্তি ও যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাও বুঝিতে পারেন, ম্যালেরিয়ায় তথায় কি বিভ্রাট ঘটাইয়া, আজও ঘরে ঘরে ঘুরিতেছে। ভিটা কি ভিটা উজাড়; পাড়া কি পাড়া পয়মাল। বড় বড় অট্টালিকা বন জঙ্গলে

* রাজা দিগম্বর মিত্র বলেন, ম্যালেরিয়া জ্বরে গৌড় ধ্বংস হইয়াছিল, ম্যালেরিয়া এদেশে নেহাত নূতন নয়, তাঁহার মতে।

পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। পাহাড় প্রমাণ ইষ্টক-স্তূপ, ভাঙ্গা আধভাঙ্গা ইষ্টকালয় জঙ্গলের মধ্যে; এক একখণ্ডে, এমন কি ২০।৩০ বিঘা করিয়াও ভূমি এইভাবে পড়িয়া রহিয়াছে;—মনুষ্য নাই। কতক ম্যালেরিয়ার উদরে গিয়াছে, কতক তাহার ভয়ে পৈতৃক স্থান ছাড়িয়া অন্যত্র পলাইয়াছে। কাঁচড়াপাড়ার কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বাড়ী দেখিতে গিয়াছিলাম। দিব্য দোতালা বাড়ী। জনপ্রাণীশূন্য জঙ্গলময়! এই অট্টালিকা ও উহা যে পল্লীতে অবস্থিত, তাহার শ্মাশানিক অপ্রফুল্ল অবস্থা দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই; সে দৃশ্য এমনি পীড়াদায়ক।

১৮৬০ সালের ঘটনা উপরে বিবৃত হইয়াছে। ১৮৬১-৬২ সালের ইতিবৃত্ত অধিকতর ভীষণ। ১৮৬১ সালে উত্তর ও পশ্চিমদিকে দ্বারবাসিনী হইতে বৰ্দ্ধমান, এবং পূর্ব্বদিকে বারাসত ও তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান ব্যাপিয়া ম্যালেরিয়া একাধিপত্য করে। ত্রিবেণী, কাঁচড়াপাড়া, হালিসহর প্রভৃতি গ্রাম সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আক্রান্ত হয়। এক একটী পরিবার একেবারে উৎসন্ন হইয়া যায়; বংশে বাতি দিতে লোক থাকে না। সহস্র সহস্র লোক মরে; দলে দলে লোক দেশ ছাড়িয়া পলায়। শত শত লোক এই বিষম জ্বরে আক্রান্ত হইয়া গৃহে পড়িয়া মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে থাকে। কবিরাজী, ডাক্তারি এবং দৈব চিকিৎসা, মন্ত্র তন্ত্র, পূজা অর্চ্চনা, একে একে নানাবিধ উপায় অবলম্বিত হইয়া সবই বিফল হয়; কিছুতে কিছু হয় না। ম্যালেরিয়া অপরাজেয়, মনুষ্য-বুদ্ধিবিদ্যার উদ্ভাবিত উপায়ে আরোগ্যের অতীত বলিয়া প্রতীত হয়। লোক সাধারণ আতঙ্কে অস্থির, অবসন্ন; নিরাশ, রোগাক্রান্ত-জীবনভার-পীড়িত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়; মাজিষ্টর, কলেক্টর, কমিসনরেরা ব্যস্ত হইয়া পড়েন। চারিদিকে হাহাকার উঠে। বৎসরের শেষে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন, সরকার হইতে ঔষধ বিতরণ ও ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টে আবেদন করেন। সরকার হইতে ঔষধ বিতরণের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু ম্যালেরিয়া তাহাতে একটা বিভৎস হাসি হাসিয়া, পর বৎসর (১৮৬২ সালে) অধিকতর আবেগ সহকারে আত্মরাজত্বের বিস্তার করে। দেশ মধ্যে মহা জ্বরের উত্তাল তরঙ্গ উঠে। উত্তরাঞ্চলে, পশ্চিমে, কাটোয়া ও পূর্ব্বে মেহেরপুর এবং দক্ষিণাংশে,—এক দিকে দ্বারবাসিনী ও অপর দিকে গোবরডাঙ্গা; পরন্তু আরও দক্ষিণে খড়দহ ও বেলঘরিয়া ব্যাপিয়া, ম্যালেরিয়া বিদ্যুৎ বেগে ছুটে। বহু গ্রাম, নগর, পল্লী ধ্বংস হইয়া যায়। কালনা গ্রাম জনশূন্য হয়। দ্বারবাসিনী হয়। কোনও গ্রামেই প্রায় এমন পরিবার ছিল না যাহার কতক লোক ম্যালেরিয়ার আক্রমণে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয় নাই। বহু বংশ লোপ হইয়া বাস্তুভিটা শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। প্রত্যেক গৃহের "পিড়ায়" প্রাঙ্গনে "পাটে-পাট" রোগী শায়িত, কঙ্কালাবশেষ, কাহারও বা কণ্ঠশ্বাস উপস্থিত;—সে করুণ দৃশ্য বর্ণনাতীত! বৰ্দ্ধমান সহরে প্রতি দিন শত শত লোক মরিয়াছিল। শব দেহের সৎকার হয় নাই; দাহ হয় নাই। শকটে পূরিয়া শবদেহ সাফ করিতে হইয়াছিল। অনেক গ্রামেই শবদেহের শ্মশান-সৎকার হয় নাই; গৃহ হইতে বাহির করারই লোক হয় নাই। গৃহ হইতে শৃগাল কুকুরে তাহা টানিয়া খাইয়াছিল। এসব একটীও কল্পিত ও অতি-

রঞ্জিত কথা নয়। সরকারী কাগজপত্র হইতে সঙ্কলিত। উলা শান্তিপুর উৎসন্ন হইয়াছিল, অগ্রেই বলিয়াছি। কাঁচড়াপাড়ায় তিনহাজার অধিবাসীর প্রায় দেড় হাজার মরিয়াছিল। হালিসহর দীর্ঘে প্রস্থে তিন ক্রোশ ব্যাপী বৃহৎ গ্রাম। বহু পরিবার, বহু লোকের বাস, অগণিত লোক মরিয়াছিল, বহু লোক পলাইয়াছিল, সুবৃহৎ সহরটী ভীষণ শ্মশান দৃশ্যে প্রতীত হইতেছিল! এই সকল গ্রামের ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকাইয়া নদীয়ার ডিবিসনাল কমিসনর লিখিয়াছিলেন;

"প্রত্যেক গ্রামেই কত কত গৃহ ভদ্রাসন শূন্য পড়িয়া আছে, মৃত্যু উহা শূন্য করিয়াছে, মহামারির অভিসম্পাৎ এড়াইবার জন্যও কত গৃহস্থ গৃহ ভদ্রাসন শূন্য করিয়া অন্যত্র গিয়াছে। যত লোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহাদের প্রায় প্রত্যেক লোকেরই এক একটা করুণ কাহিনী আছে তাহাদের কাতর কঙ্কালসার মূর্ত্তি সে কাহিনীর সত্যতার সাক্ষ্য দেয়। প্রত্যেকেরই স্ব স্ব পরিবারে এক একটা করুণ কাহিনী আছে আর আছে মৃত্যুর এক একটা তালিকা [illegible] পিতা মাতা, পত্নী, পুত্র কন্যা আত্মীয় স্বজন যে [illegible] কালগ্রাসে পতিত, যমালয়ে নীত। কোন কোনও গ্রামে এক তৃতীয়াংশের অধিক লোক [illegible] মারা পড়িয়াছে, [illegible] হালিসহরের দুইটি মহাল্লা [illegible] সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহাদের [illegible] যে এখন যে সকল পরিণত বয়স্ক লোক জীবিত আছে, তাহারা এতাধিক জীর্ণ ও জীবনীশক্তি বিহীন হইয়া পড়িয়াছে এবং সে জীর্ণতা ও জীবনী শক্তিবিহীনতা এরূপ সর্ব্বব্যাপী যে, স্বাভাবিক নিয়মে জন সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার পথও প্রায় রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।"

এই সময়ে অর্থাৎ ১৮৬২সালে ম্যালেরিয়ার একটা কারণ কল্পিত হয় এই যে, কোনও অজ্ঞাত কারণে ভাগিরথীর জল দূষিত হওয়াতেই তত্তীরবর্ত্তী স্থান সমূহে ম্যালেরিয়া হইতেছে। কিন্তু এই কল্পনা টিঁকে নাই। কারণ, এই জ্বর যে কেবল ভাগিরথী বা হুগলী নদীর তীরস্থিত স্থানে হইতেছিল, তাহা নহে। এই নদীতট হইতে বহু বহু দূরে, হুগলী ও ২৪ পঃ জিলার অতি অভ্যন্তরস্থ ও সীমান্ত পল্লীতেও হইতেছিল। অথচ এই নদীতটস্থ দুইচারি স্থলে হয়ও নাই। পুনঃ আর এক কল্পনা হইয়াছিল এই যে, পল্লীগ্রামের অস্বাস্থ্যকর আবর্জ্জনা, বন জঙ্গল বাঁস ঝাড়, মুগাছা ও কুগাছার আওতা, বন বাদাড়ের পচানী ও পানাপুকুরের পচিত জল হইতে এই রোগ উৎপন্ন হইতেছে। পল্লীগ্রাম মাত্রই সাধারণতঃ অপরিষ্কার, পরিষ্কার করার প্রথা আবহমান কাল হইতে নাই, তজ্জন্যই ম্যালেরিয়া রোগ দেখা দিয়াছে। এ কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া কত কত পল্লীর গাছ গাছড়া বন বাদাড় কাটা হয়, আগাছার সঙ্গে, ভাল ভাল গাছও মারা পড়ে। কিন্তু এ কল্পনাও সবিশেষ বিশ্বাস্য হয় নাই। কেন না, গাছ পালা বাঁস বাগান পানা পুকুর বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে চিরকালই আছে, অথচ এরূপ জ্বর আর কখনও ছিল না, পরন্তু, যে সব গ্রাম অনতিকাল পূর্ব্বে খুব স্বাস্থ্যকর বলিয়া পরিচিত ছিল তথায়ও এই জ্বর বিদ্যমান; তা ছাড়া বন বাগান বিহীন নদীর চরের উপর অবস্থিত কত গ্রামেও ম্যালেরিয়া হইয়াছিল।

১৮৬৩ সালে বৃষ্টিপাত কম হয়, জঙ্গলও কাটা হইয়াছিল। এবৎসর পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা ম্যালেরিয়ার প্রকোপ যেন কিছু কম হইয়াছিল বলিয়া অনুমান। কিন্তু, সাধারণের ভীতি কমে নাই। মৃত্যুও লোকের কম হয় নাই। পাণ্ডুয়ার এলাকায় ছয়মাসে শতকরা ২৫ জন করিয়া লোক মরিয়াছিল। একজন

রাজপুরুষ রিপোর্ট করিয়াছিলেন "এই রোগ নিবারণের কোনও উপায় অদ্যাপি অবলম্বিত হয় নাই এবং মনুষ্য অবলম্বিত কোনও উপায়ে আদৌ ইহা নিবারিত হইতে পারে কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ"। অপর এক রাজপুরুষ কমিসন বসাইয়া ইহার আমূল অনুসন্ধানের জন্য অনুরোধ করেন। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনও আবেদন দ্বারা কমিসন তদন্তের জন্য বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করেন।

১৮৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে "এপিডেমিক ফিবার কমিসন" নিযুক্ত হয়। তিন জন সাহেব ডাক্তার, একজন সাহেব সিবিলিয়ান এবং বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভার নির্ব্বাচিত রাজা (তখন বাবু) দিগম্বর মিত্র এই কমিসনের সদস্য নিযুক্ত হয়েন। কমিসন হুগলি, বর্দ্ধমান, নদীয়া, ও ২৪পরগণা জিলার ম্যালেরিয়া পীড়িত অনেক স্থানে যাইয়া তদন্ত করেন। কমিসনের কার্য্য দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম জ্বরের নিদান স্থির ও ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া জ্বরাক্রান্ত জনসাধারণের ক্লেশ নিবারণ করা; দ্বিতীয়, জ্বরের মূল কারণ নিদ্ধারণ করিয়া গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট দেওয়া। প্রথমোক্ত কার্য্য সম্বন্ধে কমিসন তখন যাহা কিছু করণীয় হইতে পারিয়াছিল তাহা সবই অবশ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তদ্দারা যে ক্লেশ নিবারণের আশা খুব কমই ছিল, তাহাও স্বীকার না করিয়া পারেন নাই। এই জ্বরের হটকারিতা ও চিকিৎসাতীত উগ্রতা সম্বন্ধে কমিসন লিখিয়াছিলেন,—

"It must be borne in mind that, do what we may, the disease must run a certain course, which is neither to be accelerated, nor retarded by any means within our reach."

শেষোক্ত কার্য্য ব্যপদেশে কমিশন এই জ্বরের নিম্নলিখিত কারণ নির্ণয় করিয়া রিপোর্ট করেন;—

(১) Miasm অর্থাৎ ম্যালেরিয়ার বিষবাষ্প; (২) Polluted drinking water অর্থাৎ দূষিত পানীয় জল; (৩) Vitiated air and deficient ventilation অর্থাৎ দূষিত বায়ু ও বায়ু চলাচলের ব্যাঘাৎ; (৪) excessive use of farinacious food অর্থাৎ মণ্ড আহার্য্যের অতিরিক্ত ব্যবহার; (৫) contagion to a slight extent অর্থাৎ অত্যল্প মাত্রায় সংক্রামতা। *

কমিসনের অনুসন্ধানে ম্যালেরিয়া জ্বরের ঐ কারণ পঞ্চ পরিকল্পিত হয়। ১ম কারণ অর্থাৎ ম্যালেরিয়া বা তজ্জনিত বিষবাষ্প দুরিকরণ কল্পে কমিসন দেশের স্বাভাবিক পয়োপ্রণালী (যাহা রেলরোডে অবরুদ্ধ ও কালক্রমে দূষিত হইয়া গিয়াছে) সংস্কারের প্রস্তাব করেন। কমিসন লিখেন;—

"জ্বরোৎপাদক ম্যালেরিয়া বা বিষবাষ্প যথাসম্ভব দূরীকরণ বা হ্রস্বীকরণ প্রথম প্রয়োজন। বর্ষার পর জলসিক্ত ভূমি, মৃত্তিকা শুষ্ক হইবার সময় এবং সেই প্রক্রিয়ায় সিক্ত মৃত্তিকা হইতে বিষবাষ্প ম্যালেরিয়া উৎকীর্ণ হয় এবং তাহাতেই জ্বর জন্মে। অতএব মৃত্তিকা যাহাতে শীঘ্র ও সহজে শুষ্ক হইয়া যায়, তাহা করা প্রয়োজন। তাহা করিতে হইলে, দেশের পয়োপ্রণালীর সংস্কার ও উন্নতি সাধন করা আবশ্যক। পলি ও বালি পড়িয়া খাল ও নদী প্রবাহ খর্ব্বীকৃত হওয়াতে এবং ঢালুভূমি ক্রমে সমতল হইয়া যাওয়াতে, পয়োপ্রণালী অর্থাৎ গ্রাম্য জল নিকাশের পথ অবরুদ্ধ হইয়া

* এই কমিসন ম্যালেরিয়া জ্বরের সংক্রামকতা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করেন নাই। বরং অনেকাংশে অস্বীকারই করিয়াছিলেন; কমিসন লিখেন;—"Our enquiries have not established the contagious nature of this fever. * * * Viewing contagion in the widest meaning, usually attached to the term we have no sufficient grounds for stating that it is characteristic of the present fever. Still it is highly probable that the disease may be directly communicated by the effluvia of numerous sick persons congregated together in small ill ventilated houses."

গিয়াছে। পরন্তু, রেলরোড হইয়া নদীতীরস্থ গ্রাম নিচয়ের জল নিকাশের পথ নদীর উত্তর তীরেই রোধ করিয়াছে; ইহাও অবধারণ করিতে আমরা কাঠিন্য অনুভব করি নাই; কেন না নদী তীরস্থ গ্রামের জল বহির্গত হইবার স্বাভাবিক পথ ভূমধ্য প্রসারী গ্রামস্থ অর্থাৎ গ্রামের ভূমির উপরি পতিত বর্ষার জল নিকটস্থ নদী খাল বা বিলে অথবা নদ্যাদির অভাবে গ্রামের বহিস্থ পুষ্করিণী নালা বা বিলে সটান সহজে বাহির হইয়া যাইতে পারে, তদর্থে খোলা পয়োনালী প্রস্তুতের জন্য আমরা সবিশেষ অনুরোধ করি।"

ইহা ভিন্ন এই কমিসন ম্যালেরিয়া প্রশমন কল্পে আরও কতকগুলি পরামর্শ দেন। তাহা, (১) জঙ্গল পরিষ্কার, (২) পুষ্করিণী সংস্কার, (৩) নিম্নস্থ মৃত্তিকার জল নিকাশের নালী গঠন, (৪) গ্রাম্য গৃহ-সংস্কার, (৫) গ্রামের বাহিরে গোরস্থান নির্ব্বাচন এবং (৬) স্বাস্থ্যকর দ্রব্যের আহার।

এই ছয়টী এবং উপরে পাঁচটী সর্ব্বশুদ্ধ ১১টী কারণ স্থির করিয়া উহা নিরাকরণার্থে ম্যালেরিয়া কমিশন সর্ব্ববাদীসম্মত হইয়া পরামর্শ দেন।

কমিসনের পয়োনালী বা ড্রেণেজ থিয়োরীর উপর উহার অন্যতম সদস্য দিগম্বর মিত্র অধিকতর গুরুত্ব স্থাপন করেন। এবং তৎ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র দুইটী মিনিট বা মন্তব্য লিখিয়া গবর্ণমেণ্টে দাখিল করেন। কিন্তু, দিগম্বরের ড্রেণেজ মত কমিসনের মত হইতে কিয়ৎ-পরিমাণে স্বতন্ত্র; এবং সে মত প্রতিপন্ন করিবার জন্য তিনি জীবনব্যাপী পরিশ্রম ও বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। কতকাংশে তাহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। ফলতঃ দিগম্বর মিত্রের ড্রেণেজ থিয়োরি অনুসারে যদি এত দিন কার্য্য হইত, তাহা হইলে এখন কাহাকেও এই ড্রেণেজ বিল লইয়া এত বিব্রত হইতে হইত না। দিগম্বর মিত্রের মত একটু পরে আলোচনা করিব; এখন ইতিহাসের অনু- সরণ করা যাউক।

এপিডেমিক কমিসনের রিপোর্ট দাখিল হওয়ার পর, বহু বৎসর তদন্ত তাদারক ও লেখা লিখিতে কাটিয়া যায়। ১৮৭০-৭১সালে বেঙ্গল কৌন্সিলে এ সম্বন্ধে একখানা বিল পেস হয়। সে বিল খানার নাম Drainage and Irrigation Bill। তাহা আমাদের এই আলোচ্য বিলের মতই এক উদ্ভট সৃষ্টি। তাহাতে, বিল, জলা ধান্যক্ষেত্রের ড্রেণেজ করার কল্পনা করা হইয়াছিল। কিন্তু, তখন দিগম্বর মিত্র জীবিত এবং বেঙ্গল কৌন্সিলের মেম্বর; তিনি চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া অক্ষরে অক্ষরে বুঝাইয়া দেন যে, উক্ত কল্পনা মহা অনর্থকর; কেবল অসম্ভব ও বিপুল ব্যয়সাধ্য নহে, বিষম অনিষ্টকর। তদ্দ্বারা গ্রাম্য জল নিকাসের সম্ভাবনা নাই; ম্যালেরিয়ার যে কারণ কল্পিত, তাহা বিদূরিত হইবে না, অথচ ধান্য ক্ষেত্র শুষ্ক হইয়া গিয়া দেশ শুদ্ধ লোক অনাহারে মরিবে। পরন্তু, আরও বুঝান যে নদ্যাদির প্রবাহ অল্পাধিক পরিমাণে অবরুদ্ধ বা মৃত হইয়া গ্রাম্য জল নিকাশের স্বাভাবিক পয়োনালীর ব্যাঘাত করেন নাই; ধান্যক্ষেত্রস্থ জলেও ম্যালেরিয়া জন্মিয়া মানুষ মারে না; প্রত্যুত দেশের মধ্য তথা আবাধ নির্ম্মিত কাঁচা পাকা রাস্তা, বড় বড় বাঁধ ও রেলওয়ে হইয়া স্বাভাবিক ও সাবেক গ্রাম্য পয়োপ্রণালী রোধ করিয়াছে, যে উপায়ে তাহার নিরাকরণ হইতে পারে, তাহাই উদ্ভাবন করিয়া আইন করা আবশ্যক। না বুঝিয়া, উদ্ভট আইন করিলে কালে দেশের অনিষ্ট হইবে। দিগম্বর মিত্রের এ মতের অনেক শত্রু ব্যবস্থাপক সভায় ছিলেন। কিন্তু, মিত্রজের যুক্তি তর্ক

অকাট্য, তদীয় সাক্ষাৎ সংগৃহীত তথ্যরাশি দুর্দমনীয়। সুতরাং শত শত্রু সত্বেও তাঁহারই জয় হয়। তদানীন্তন ছোটলাট স্যর উইলিয়ম গ্রে ড্রেণেজ বিল প্রত্যাহার করেন। কেবল খানকুলির নিম্ন ড্রেণের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু, তাহাতে যে অনর্থ ঘটিয়াছিল; উক্ত বিলের সত্বাধিকারী রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় অবগত থাকিতে পারেন এবং তজ্জন্যই বোধ হয়, বেলভিডিয়ারে এই স্যানিটারি বিলের অঙ্কুরেই আপত্তি করিয়াছিলেন।

যাঁহার যুক্তিতে স্যর উইলিয়ম গ্রের মত ফিরিয়াছিল, আক্ষেপ, তিনি এখন জীবিত নাই। তাঁহার যুক্তিগুলি সাক্ষাৎলব্ধ জ্ঞানে সজীব করিয়া স্যর চার্লসের সম্মুখে ধরে, এমন একটা লোকও এখন দেশে নাই। দিগম্বর মিত্র ও কৃষ্ণদাস পালের মত ব্যক্তি এমনতর সব সময়ে না থাকা দেশের বিষম দুর্ভাগ্য। এখনকার বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভা এবং হিন্দু-পেট্রিয়ট যেরূপভাবে উপস্থিত বিলের প্রতিবাদ করিতেছেন, তাহা হৃদয়-গ্রাহী নহে। যে জমিদার সভায় ও জমিদারী পত্রে ড্রেণেজ তত্ত্ব তন্ন তন্ন করিয়া প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হইয়াছিল, তাঁহাদের পক্ষে, দিগম্বর ও কৃষ্ণদাসের অবর্ত্তমানে ড্রেণেজ-থিওরি একেবারে উড়াইয়া দেওয়া অতীব আশ্চর্য্য। পরন্তু, বঙ্গীয় লাট বাহাদুর যে ভাবে উহা কার্য্যে পরিণত করিতে চাহিতেছেন, তাহা ততোধিক আশ্চর্য্য। কিন্তু যাউক আপাততঃ একথা।

ড্রেণেজ ও ইরিগেসন বিলের পর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় (১৮৭২ খ্রীঃ) বিভিন্ন আকারে এম্ব্যাঙ্কমেণ্ট বিল নামক এক বিল উপস্থিত করা হয়। তখনও দিগম্বর মিত্র (৩য় বার) কৌন্সিলের মেম্বর। এই বিলের পরিবর্ত্তন ও সংশোধন সম্বন্ধে মিত্রজা মহাশয় অনেক সহায়তা করেন। ১৮৭৩ সালে, ইহা আইনে পরিণত হয়। এই এম্ব্যাঙ্কমেণ্ট আইনানুসারে কার্য্য হইলে বিশেষতঃ দিগম্বর মিত্র উহার কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে যেরূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন, সেই ভাবে কার্য্য হইলে, এ সম্বন্ধে আর কোনও আইন করিবারই আবশ্যক হয় না। কিন্তু, কার্য্য করা ও করাইবার প্রবৃত্তি অপেক্ষা গবর্ণমেণ্টের অনর্থক আইন করার ইচ্ছাই প্রবল। কাজেই, এই সাংঘাতিক স্যানিটারী আইনের অবতারণা হইয়াছে।

১৮৭৬ সালে দ্বিতীয় বার এপিডেমিক কমিসন বসে;—সরকারি সেরেস্তায় ম্যালেরিয়া দমনের নানা কল্পনা জল্পনা হইতেছিল বটে, কিন্তু ম্যালেরিয়া তাহাতে ত আর ভয় পায় না। দুই এক বৎসর একটু গা ঢাকা থাকিয়া আবার দাবাগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিতেছিল। এই দ্বিতীয় কমিসনেও দিগম্বরকে ডাকা হয়। তিনি শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ কমিসনে উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য করিতে পারেন নাই। কতকগুলি মন্তব্য লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এই কমিসনের সভাপতি হয়েন ডাক্তার লেথব্রিজ। লেথব্রিজ ড্রেণেজ-থিওরী প্রায় একেবারে উড়াইয়া দেন। তাঁহার মতের আভাস আমরা অগ্রেই দিয়াছি।

স্বাস্থ্যে ড্রেণ এবং ড্রেণে স্বাস্থ্য বিষয়ক ব্যাপারের পূর্ব্ব ইতিবৃত্ত এই। আলোচ্য বিলের অব্যবহিত পরবর্ত্তী ইতিবৃত্ত ১৮৯২ সালের ১৮ই জুলায়ের বেলভিডিয়ার সভা। এই সভার চতুর্থ মন্তব্যে এই বিলের অঙ্কুর। ঐ মন্তব্যের মর্ম্ম এই যে, দেশের

কোনও স্থানে ম্যালেরিয়া জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইলে এবং তথাকার লোক আবেদন করিলে অথবা ড্রেণের অভাবে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু সংখ্যা অধিক হইতেছে সাব্যস্ত হইলে, গবর্ণমেণ্ট অধিবাসীদিগের অধিকের মত গ্রহণ পূর্ব্বক আইনানুসারে তথায় ড্রেণ করিতে ও তজ্জন্য কর স্থাপন করিতে অধিকারী হইবেন। কিন্তু এম্যাণ্ড মেণ্ট আইনে, অন্ততঃ তাহার কিছু কিছু সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়া কি এ কার্য্য সাধিত হইতে পারিত না? বলিবে, উক্ত আইন সর্ব্বব্যাপী নহে। কিন্তু ম্যালেরিয়াও বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির সর্ব্বত্র নাই। পূর্ব্ব বঙ্গে নাই। বিহারেও নাই। পরন্তু কেবল মাত্র ড্রেণ দ্বারা ম্যালেরিয়া নিবারিত হইতে পারে, ইহাও সাব্যস্ত হয় নাই। পুনশ্চ, আলোচ্য বিল ও তল্লিখিত ড্রেণের ব্যাখ্যা এই মন্তব্যের ঠিক অনুরূপ নহে। দৃষ্টান্ত, বিলের ১ম খণ্ডের ২য় অধ্যায়ের ৩য় ধারা। ফলতঃ এই বিলের অঙ্কুরেই অনবধানতা। আর এই অঙ্কুর হইতেই রাজনীতি ও প্রজা নীতি, বিশেষতঃ সুরেন্দ্রনাথ বাবু প্রমুখ প্রজা নীতি যেরূপ ভাবে চলিয়াছে, তাহা বস্তুতই অদ্ভুত। রাজনীতি অনাবশ্যক সত্ত্বেও এক অতিরিক্ত ও অন্যায় আইনের সূচনা করিলেন। সূচনায় মন্তব্য হইল একরূপ, আইনের খশড়া হইল অন্যরূপ, তাহার ব্যাখ্যা হইয়াছে তৃতীয় প্রকারের। এক পক্ষের প্রজানীতি পূর্ব্বাপর না ভাবিয়া সূচনায় সমর্থন করিলেন, কংগ্রেসের প্রাদেশিক কনফারেন্সে দুই নৌকায় পা দিলেন। এখন কর দিতে আপত্তি করিতেছেন। কেন? করের কথা ত সূচনাতেও ছিল। তবে সমর্থন করিলে কি বুঝিয়া? ফলতঃ রাজনীতি ও সুরেন্দ্র বাবুর প্রজা-নীতি এ ব্যাপারে, এক এক দিন এক এক তালে নাচিতেছে।

এই বিলের ইতিবৃত্ত আমরা কিছু বিস্তারে বলিয়াছি। ইহার মূল তত্ত্বের কথা সংক্ষেপে বলা ভিন্ন উপায় নাই। মূল তত্ত্ব ম্যালেরিয়া। অর্থাৎ তন্নামধেয় অথবা ম্যালেরিয়া-জাত জ্বর। কিন্তু, এই জ্বর যে কেবল ম্যালেরিয়া সঞ্জাত, তাহার প্রমাণ কি? এবং ম্যালেরিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে পদার্থই বা কি? তাহা বাকটেরিয়া ব্যাসিলি, পলিত পঙ্কের বিষ বাষ্প, অথবা ধাতব, জান্তব কিম্বা বিকার প্রাপ্ত উদ্ভিদ পদার্থ হইতে উদ্ভূত, অথবা এ সকলের সমবায়ে সৃষ্ট, অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে কি? ম্যালেরিয়া পানীয় জলে, ভূমধ্যস্থ পলিত পঙ্কে, মনুষ্যের ব্যবহার্য্য বায়ুতে অথবা ম্যালেরিয়া কেবল মনে? শুনিতে পাই, ম্যালেরিয়া পীড়িত রোগীর শোণিতের রক্তকোষাণুতে এক প্রকার অনুবীজ (red corpuscles) জন্মে।* কিন্তু তাহা কিরূপে কোথা হইতে উৎপন্ন হয়, অদ্যাবধি কোনও পরীক্ষার দ্বারা তাহা নির্ণীত হয় নাই। ডাক্তার স্বচ্ প্রভৃতির জীবন ব্যাপী অনুসন্ধানেও অদ্যাপি কলেরা ব্যাসিলি সম্পূর্ণরূপে নিরূপিত হইল না, আর বিনা অনুসন্ধানেই ভিজা মাটি খুঁড়িয়া ম্যালেরিয়া-ব্যাসিলি বাহির হইয়া পড়িল, ইহা যারপর নাই আশ্চর্য্য বটে। ছোটলাট স্যর চার্লস ইলিয়ট তদীয় ঢাকা বক্তৃতায় অম্লান বদনে বলিয়াছেন যে,—

"The disease itself was without doubt due to a special bacillus bred chiefly in low lying parts where there was much decaying vegetable matter, but which no doubt spread to other healthier parts through human agency" অর্থাৎ ম্যালেরিয়া জ্বর এক

* নব্যভারত ১২শ খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা ১৭২ পৃঃ ফুটনোট।

বিশেষ বীজাণু হইতে জন্মে এবং সে বীজাণু, নিম্নভূমি কি না, বিল জোল জলার পলিতোন্মুখ উদ্ভিজ পদার্থ হইতে উদ্ভূত এবং মনুষ্য কর্তৃক স্বাস্থ্যকর স্থানেও নীত।।

এই উক্তির আরম্ভেই বঙ্গেশ্বর চিকিৎসা-শাস্ত্র ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের আধুনিক উন্নতির দোহাই দিয়াছেন। কিন্তু চিকিৎসা শাস্ত্র ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান কবে ও কোথায় এ অভিনব তত্ত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছে, তাহা কিছুই বলেন নাই। তাহা বলিলে অনভিজ্ঞ লোকের কিছু উপকার হইতে পারিত। স্যর চার্লস ইলিয়ট যেমন অন্য কর্তৃক উদ্ধৃত প্রমাণের (authority) পরিচ্ছেদ ও পৃষ্ঠা তাহাদের নিকট হইতে পাইতে প্রত্যাশা করেন; অন্যেও তেমনি তাঁহার কথার প্রমাণ কোথায় প্রাপ্তব্য জানিতে প্রার্থনা করিতে পারে।

নর্দ্দামার পচানি-প্রসূত বেসিলি বাবতে প্রবেশ করিতে পারে না, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান শুনিতে পাই, পরীক্ষার দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছে। অথচ নিম্নভূমির মধ্যস্থিত অবিচলিত বেসিলি বহির্বায়ুতে অবাধে প্রবেশ করিয়া মানুষের প্রাণবায়ু দষিত করে, ইহাই আবার (স্যর চার্লসের অবিত) স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের মত হইতে পারে, বিনা প্রমাণে লোকে কিরূপে বিশ্বাস করিবে?

ফলতঃ স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান অদ্যাপি সূতিকা-গৃহ পার হয় নাই। বাকটিরিয়া-তত্ত্বও এখনও তাহার বিজ্ঞান-জননীর জঠরাভ্যন্তরে অবস্থিত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বেঙ্গল কৌন্সিলের আইন করার জাঁতা কল অনিবার্য্য। আবিষ্কারের পূর্ব্বেই অনুষ্ঠান। তা, অনুষ্ঠান দ্বারা এক্সপেরিমেণ্ট আবশ্যক বটে। কিন্তু সেটা ধন-কুবেরের ধনে, ও সরকার বাহাদুরের নিজ অর্থে সম্পন্ন হইলেই কোনও কথা থাকে না। দরিদ্র রায়তের হৃদ্‌পিণ্ড নিঙ্গড়ান রক্তের দ্বারা তাহা করা হয় বলিয়াই ত এত বাগ্‌বিতণ্ডা।

পরন্তু, যে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের কথা তুলিয়া ড্রেণ করার প্রস্তাব, সেই স্বাস্থ্যবিজ্ঞানই ত আবার পক্ষান্তরে যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহেন যে, ভূপৃষ্ঠস্থ বায়ু ড্রেণ দ্বারা বিতাড়িত করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ঘোর অনিষ্টকর। হায়েজেনিক ডাক্তার ও স্যানিটারি ইঞ্জিনিয়ারেরাই ত ইহা বলিয়া থাকেন। অভিমত অক্ষরে অক্ষরে উদ্ধৃত করিতে পারিতাম। কিন্তু স্থান হইবে না! বঙ্গদেশ যখন ম্যালেরিয়ায় মর মর; বিহারে তখনও উহা ছিল না। কিন্তু, আরার ইরিগেসন কেনাল হইয়া আরা ও গয়া জিলায় ম্যালেরিয়া হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অন্যের কথা যাউক। গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্ত সেক্রেটারী মিঃ অডলিং নিজেই প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইরিগেসন কেনাল-সলিলের কৃত্রিম সন্নিপাতে স্বাস্থ্যের পীঠস্থান আরা ও গয়ায় ম্যালেরিয়া জ্বর উৎপন্ন করিয়াছে *। এখন বক্তব্য এই যে, ইরিগেসন কেনাল ও ড্রেণেজ ক্যানাল স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রায় একই পর্য্যায়ভুক্ত। অপিচ, জলীয় বাষ্প বা সর্দ্দি সংযুক্ত বায়ুর ইষ্টানিষ্ট সম্বন্ধেও হঠাৎ একটা হটকারী সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় না।

স্বাস্থ্য শাস্ত্রবিদ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডাক্তার Parkes তাঁহার Hygiene নামক গ্রন্থে বলেন, শ্বাস কাশ প্রভৃতি হৃদরোগ সাধারণতঃ শুষ্ক

। কেন না অস্বাস্থ্যকর ও স্বাস্থ্যকর স্থান সর্ব্বত্রই কৃমিকবটী হওয়া চাই। ইহাকেই বলে এক তীরে দুই পক্ষী মার।

* Vide his lecture in Sibpur Civil Engineering College.

বায়ুতেই বর্দ্ধিত হয়। উহাদের চিকিৎসা ও উপকারার্থে সর্দ্দি-সিক্ত বায়ু (moist climate) অতীব ইষ্টকর।

অতএব দেখা যাইতেছে, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান মূলতঃ মতভেদের আকর। ম্যালেরিয়া সম্বন্ধীয় মত সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অনির্দ্দিষ্ট ও অন্ধকারময়। এ সম্বন্ধে কোনও কথাই অসন্দিগ্ধচিত্তে ও একান্ত নিশ্চয়তার সহিত বলা যায় না। ম্যালেরিয়ায় আদৌ রোগ জন্মে কি না, তাহাই এখন অনিশ্চিত। স্যর জোসেফ্ ফেরার বলেন ;—

"The truth is that the whole subject of causation of disease by maismata of this or similar character is too much involved in obscurity to satisfy dogmatic assertion that such is the case."

বিলের মূল তত্ত্ব এই ; এবং মূল তত্ত্বেই মর্ম্মান্তিক মতভেদ ; সপক্ষ অপেক্ষা বিপক্ষ মতেরই অধিক আধিপত্য। বিলের অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা অপর একটী প্রবন্ধে করা যাইবে। ইত্যবসরে, আমরা আশা করি, এই বিল ব্যবস্থায় পরিণত হইয়া, বঙ্গীয় কৃষকের মস্তকে বজ্রাঘাত করিবে না। (ক্রমশঃ)

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

অন্ধকার।

১

অন্ধকার—ঘোর অন্ধকার !
গ্রাসি ধরণী, গ্রাসি গগন,—
তিমির-গহ্বর ব্যাদান যেমন
রক্তবীজ বধে কালিকার !
ঘোর অন্ধকার !—
অনন্তের মূর্ত্তি, কৃতান্তের ছায়া,
অনাদি পরম কারণের কায়া,
অসীমে সসীমে একাকার !

২

জগৎ চরাচর যে দিন না ছিল,
ব্যোম উপরে মহাব্যোম বিথার,
স্তব্ধ প্রকৃতি সনে অনাদি পুরুষ
বিশ্বসৃজন তরে করিল বিহার,—
না ছিল শব্দ, স্পর্শও না ছিল,
রূপ নাহিক ছিল অভিন্নতায়,
নিরম্বু শূন্যে রস নাহি সম্ভবে,
অক্ষিতি-মধ্যে গন্ধ কোথায় ?—
কেবল সে ছিল অন্ধকার !—
প্রকৃতির যেন এই বিশ্ব প্রসব তরে
দিগন্ত ব্যাপিয়ে গর্ভের প্রায় !

৩

আবার সে হবে অন্ধকার !—
শম্ভু নিনাদিত প্রলয় বিষাণে
শব্দ তরঙ্গিত ক্ষুব্ধ আকাশ ;
বিচ্যুত-কক্ষ গ্রহগণ খসিয়ে,—
চূর্ণ বিচূর্ণিত রূপ বিভাস,—
অনন্ত শূন্যে যে দিন মিশিবে ;
লুকাবে যে দিন দেশ ও কাল
ব্রহ্ম-সুষুপ্তির নিশ্বাস-মাঝে ;—
সে দিন ফিরিবে তিমির করাল !

৪

এখন ত নাহি অন্ধকার ;
ক্ষুদ্র, বৃহৎ বা, সসীম সকলি,
ব্যক্ত নয়নপথে ধরিয়ে আকার,—
অমানিশা কোলে তারকা হাসে,
গভীর ঘনগলে বিদ্যুৎ-হার !
কোথা অন্ধকার !

৫

এসো অন্ধকার!
বিনাশ সীমা, প্রসার হৃদয়,
নিবার ভিন্নতা, ক্ষুদ্রতা আর,—
অনন্ত অব্যয় আলোক তুমি যে,
অভেদ-কারণে দৃষ্টির পার!

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

সৌন্দর্য্য।

নয়ন-প্রীতিকর গুণ অথবা গুণসমষ্টির নাম সৌন্দর্য্য। সৌন্দর্য্য কাহাকে বলে? এ সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। কিন্তু ঐকমত্যই অধিক, মতভেদ অল্প। কোন সুন্দর জিনিষ বা মানুষকে অধিকাংশ লোকেই সুন্দর বলে। যাহাকে অধিকাংশ লোক 'সুন্দর' বলে, এবং যাহা বহুলোকের নয়নতৃপ্তিকর হয়, তাহাই 'সুন্দর' বলিয়া পরিচিত। সক্রেটিস্ তাঁহার মোটা নাককে সুন্দর বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। তাঁহার মতে যাহা প্রয়োজনীয়, তাহাই সুন্দর। এমন কি, গোময় ফেলাইবার কদর্য্য টুকরিও তাঁহার মতে সুন্দর। কিন্তু জনসাধারণ তাঁহার মতে সায় দেয় না। সক্রেটিসের ন্যায় যদি সকলের মত হইত, তবে লোকে মণি মুক্তার জন্য লালায়িত হইত না, হীরক বা স্বর্ণাভরণের জন্য অজস্র অর্থব্যয় করিত না। গোলাপ সুন্দর কেন? দুর্ব্বাদল-বিলম্বী নীহার-বিন্দু সুন্দর কেন? বালকের হাসি সুন্দর কেন? এই সকল ত বড় একটা কাজে আসে না। ইহা বুঝা যায় না বলিয়া সক্রেটিসের মতের সহিত সায় দেওয়া কঠিন। 'সুন্দর' 'সুন্দর' বলিয়া জগৎ ব্যাকুল, সুন্দরের জন্য সকলেই অস্থির। বহুদিন হইল একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম,

"সুন্দরে হৃদয় কাহার মাতে না?"
কোন্ পোড়া প্রাণ সুন্দর চাহে না?"

প্রকৃতই ঠিক কথা। কিন্তু সুন্দর জিনিষটা কি, তাহা কি বুঝান যায়? ইহাকি 'মুক্তা ফলে ছায়ার তরলতার' ন্যায় কোমলত্ব না আর কিছু? ইহা বুঝান যায় না বটে, কিন্তু বুঝা যায়। তুমি 'সুন্দর কি,' এই কথা যদি না বুঝিবে, তবে কিসের জন্য এত লালায়িত? সৌন্দর্য্যকে নয়ন-তৃপ্তিকরগুণ অথবা তদ্রূপ গুণের সমষ্টি বলা হইয়াছে। নয়নের তৃপ্তি কিসে হয়? নয়ন দ্বারা যে পদার্থ বা দৃশ্য দেখিলে মনে আনন্দের উদয় হয়, তাহাই সুন্দর। কুৎসিৎ পুত্র সন্তান, যাহাকে বহুকাল দেখিতে পাওয়া যায় নাই, তাহাকে দেখিলে কি মনে আনন্দ হয় না? কাজেই দেখা যায়, কেবল চক্ষে নয়, ইহার অভ্যন্তরে আরও কিছু আছে। কবি লিখিয়াছেন—

Love sees Hellen's beauty on the brow of Egypt"

যাহা সকলের নিকট সুন্দর নয়, তাহাও অবস্থা বিশেষে কোন কোন লোকের নিকট সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। রূপকে অনেকে অসার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অসার হইতে পারে, কিন্তু তা বলিয়া কয়জন রূপ তুচ্ছ করিতে পারিয়াছে? বঙ্কিমচন্দ্র স্ত্রী লোকের সৌন্দর্য্যকে নারিকেলের ছোবার সহিত তুলনা করিয়াছেন। বলিয়াছেন, দুইই অসার। নারিকেলের ছোবায় রজ্জু হয়, তাহা দ্বারা রথ টানা যায়; রূপও ভারী ভারী মনোরথ টানিয়া থাকে। রূপের মোহিনী

শক্তি কেহই অস্বীকার করিবেন না। তবে তাহাকে অসার অপদার্থ জিনিষ বলিয়া কেহ কেহ কেবল মুখের বড়াই করিয়াছেন। যখন নবীন প্রেমিক রূপের মোহ অতিক্রম করিতে না পারিয়া মর্ম্মান্তিক স্বরে বলেন—

"Is this her fault or mine?
The tempter or the tempted who sins most? Ha?
Not she; nor doth she tempt &c."

আমরা কি তাঁহাকে একটা বিকৃত-বুদ্ধি পশু বলিয়া মনে করি? এইরূপ মনের অবস্থা স্থল বিশেষে স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। পার্থিব অপরাপর জিনিষের মত সৌন্দর্য্যও জ্ঞানীর চক্ষে অসার হইতে পারে, কিন্তু ঐরূপ জ্ঞানীর সংখ্যা অল্প। রূপের মোহে সংসারে কতই না অনর্থ ঘটিয়াছে? সীতার জন্য লঙ্কা বিধ্বস্ত হইল, ক্লিওপেট্রার রূপে মোহিত হইয়া বীর এণ্টনি সকল হারাইলেন, হেলেনার জন্য ট্রয় ধ্বংশাবশেষ হইল। পৃথিবীতে এইরূপ কত ঘটনা প্রতিদিন ঘটিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

সৌন্দর্য্য লইয়া কিন্তু কাহাকেও সুখী হইতে দেখিলাম না। সকল স্থানেই দেখিলাম 'Beauty and anguish walking hand in hand.' যেখানে সৌন্দর্য্য, সেইখানেই লাঞ্ছনা দেখিলাম। সীতাদেবী, হেলেনা, ক্লিওপেট্রা, কেহই সুখে কাল কাটাইতে পারে নাই। পদ্মিনী সৌন্দর্য্যের অপবাদে জলন্তচিতা আরোহণ করিলেন; নুরজাহান স্বামীহন্তাকে পতিত্বে বরণ করিলেন। ইঁহাদের অপরাধই বা কি? ধন সম্পত্তির অধিকারীরা যেরূপ নিশ্চিন্তে কাল কাটাইতে পারেন না, সুন্দরী রমণীগণেরও সৌন্দর্য্য সম্পত্তি থাকাতে তদ্রূপ অবস্থা। "Beauty provoketh thieves sooner than gold." কেবল রমণীগণের কথা বলিতেছি কেন? সকল স্থলেই এইকথা প্রযুজ্য। সুন্দর পাখীটী কেন খাঁচায় পুরিয়া রাখি? সুন্দর কুসুম কেন বৃন্তচ্যুত করিয়া শুকাইতে দিই? ঐশ্বর্য্যশালী লোকদিগের সম্মান আছে, গৌরব আছে, অনেক সুবিধা আছে। সৌন্দর্য্যের অধিকারীদিগেরও তাই। তাহারা না চাহিতে আদর পায়, প্রশংসা পায় এবং স্তুতি পায়। অতএব সৌন্দর্য্য একটা সম্পত্তি ও ইহার অধিকার স্পৃহনীয়। 'সুন্দর' সম্বন্ধে মতভেদও যথেষ্ট আছে। এই বিভিন্নতা দেশ বিশেষে, বয়স বিশেষে এবং ব্যক্তি বিশেষে পরিলক্ষিত হয়। কেহবা সুন্দর করিবার জন্য লৌহ বেষ্টন দ্বারা পা ছোট করিয়া বাঁধিয়া রাখে। কেহবা কটিদেশ সরু করিতে করিতে মৃতপ্রায় হয়। কাহারও মতে শাদা দাঁত ভাল দেখায়, কাহারও মতে বা কাল দাঁত ভাল। ইত্যাদি ইত্যাদি।

ছোট শিশু লাল জিনিষটা বড় সুন্দর দেখে; উজ্জ্বল একটা কিছু দেখিলে আনন্দে উৎফুল্ল হয়। তাহারা জিনিসের আর কিছু মূল্যামূল্য নিরূপণ করিতে সমর্থ নহে এবং উহার অধিক আর কিছু হইতে পারে, ইহাও অবগত নহে। যুবক আবার যে সৌন্দর্য্যে মোহিত, বৃদ্ধ হয়ত সে সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃক্‌পাত করে না। অজ্ঞান যাহাকে সুন্দর বলে, জ্ঞানী তাহা সুন্দর মনে করিতে না পারেন। গুণকে রূপ হইতে শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে সকলেই বলেন এবং তাহা অবশ্যই কর্ত্তব্য। কিন্তু যেখানে রূপ ও গুণের একত্র সমাবেশ, সেই থানেই স্বর্গ হইল। কেবল সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হওয়া জ্ঞানী জনোচিত নয়, ইহা সহজেই বোধগম্য হয়। প্রজ্জলিত অগ্নিতে পতনশীল পতঙ্গ ঐরূপ অজ্ঞানতার নিদর্শন।

শ্রীঅক্ষয় কুমার সেন।

ধ্যান ও ধারণা।

চঞ্চল কনকধারা তরঙ্গিনী-উপকূলে
ভ্রমর গুঞ্জিত মধুবন ;
নিরজন, জগতের বনহান প্রান্তদেশ,
নাহি নীতি বাধ কি বন্ধন —
কোমল সৈকত মাটী নব তৃণ পরিপাটী,
প্রকৃতির খুমঘোরা ললিত বিলাস
নয়ন-নন্দন রূপ অলোক-প্রভাস !!

দশবারে ফুলে ফুল লতার সীমন্ত-শোভা
সুফলে আচ্ছন্ন তরুশির ;
সৌরভ-সুধার স্রোত শূন্য ব্যাপি বহিতেছে
বসন্তের শয়ন-মন্দির !!
প্রভাতে বকুল ঝোরে পাছে দেছে পথ কোরে
রাশি রাশি, শুভ্র, শিশু, বেদীর আকার --
হেথা হোথা পদ-চিহ্ন বন-দেবতার।

শাখীতে অজস্র পাখী শতকণ্ঠে করে গান,
মন্দ মন্দ মধু সমীরণ —
পাখী যত গায় তত ফুলের উন্মাদ, করে
করে শত প্রাণে সুধা বিতরণ।
সে বনে অমর চাঁদ, জ্যোৎস্নার অনন্ত সাধ
পূর্ণ তথা কান্তমুখী অনিদ্রা সুহাস
অবিশ্রান্ত কোথা হতে ভেসে আসে বাঁশী।

সে বনে সে নদীকূলে বকুলের পথে, এক
ঘুমাইয়া অনিন্দ্য-সুন্দরী --
অঙ্গে অঙ্গে জ্যোৎস্না, এলোমেলো দেহবাস,
খুলে খুলে পড়িছে কবরী।
পবন নিরখি তাকে কুসুমে না অনুরাগে,
তটিনী চমকি থামে ফুল নাহি ফোটে,
জ্যোৎস্না ভাবে "বিক মোরে রূপসী ওবটে"!!

জীবন হইবে হেন কল্পনার কুঞ্জবন
মমতা-বারিধি-বেলা 'পরে—
শ্রান্তিহীন, শঙ্কাহীন, দ্বেষ-ক্লেশ-শেষ-হীন,
ছিল সুখ-কল্পনা কৈশোরে।
চিত্ত-শাখী-অঙ্গ'পরে আশালতা শোভা কোরে
আকাশে নক্ষত্র মত ফুটাইবে ফুল ;
সুচিন্তা-সুগন্ধ প্রাণ করিবে আকুল।

হৃদয় হইবে শুভ্র পাপ-তাপ-বৃন্তহীন
বাসনা-বকুল-বৃন্দাবন—
কক্ষে কক্ষে প্রেমপাখী অমিয়া-ঝঙ্কারে মত্ত
উদ্ভ্রান্ত করিবে অনুক্ষণ।
শান্তি-শশধর-করে জীবন রাখিবে ভরে,
চেতনে নিদ্রায় শ্রমে বিশ্রামে কি ধ্যানে
সুখের মহন বাঁশী সদা রবে কাণে।

সে জীবন আলো করে ঘুমাবে মোহিনী মোর
স্বপ্ন হাসি-প্রফুল্ল-শয়ানে ;
প্রভাত-কমল-ভাঙ্গা দেহ-লতা লগ্ন রবে
বাসনা-কুসুম-উপাধানে।
তারে দেখ হবে ভুল আশার ফোটাতে ফুল,
চিত্ত গতি-হীন স্তব্ধ তাহার পশ্চাতে ;
না পাব আপনা খুঁজি ডুবিয়া তাহাতে।

* * *

কোথা কল্পনার নিধু-অরণ্য আমার—
মধু-মমতার মন্দাকিনী কই ?
এ যে ঘোর মরুভূমি তপ্ত বালু-সিন্ধু
নাহি অভিশাপ-অগ্নিবৃষ্টি বই।
হৃদয় জ্বলন্ত খার ভস্ম পাশে একাকার,
কোকিল-কণ্ঠ কি ওই শিবার কল্লোল ?
একি এ প্রেতের হাট পিশাচের গোল ?

এই চিতা ধূমাচ্ছন্ন করাল শ্মশান, এই
প্রিয়-স্মৃতি-কঙ্কাল-বেষ্টন,
এই মানবের সৃষ্টে শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ? এই
মানবের পরম জীবন?
প্রতি পদে বজ্রবোধ ডোবাডুবি শ্বাসরোধ—
গাত্রে ভুজঙ্গের বিষ দগ্ধ শলা শিরে—
এই কামনার পদ্ম জীব-জন্ম-নীরে?

এযে পিপাসার এক প্রখর দাহন, তীব্র
যাতনার ক্রূর ক্ষয়কাশ—
এযে মাত্র পুড়ে পুড়ে ক্ষয়ের পদ্ধতি এক,
প্রাণঘাতী অনল উচ্ছ্বাস।
এ কেবল দীর্ঘযাত্রা যমদণ্ডাঘাত যাত্রা—
এ জীবন অশ্রুহীন ব্যথিতের শূল,
ভ্রমণ কণ্টকবনে অন্ধের আকুল।

কোথা সে কৈশোর? কোথা অনন্ত জীবন-সাধ?
কোথা শুভ্র সবল কল্পনা?
কোথা সে দিনের আমি? কোথা সে হেমাঙ্গী
মোর?
মনোময়ী চম্পক-গঠনা।
আজি কেন যাই যাই কেন প্রাণে সাধ নাই
কোন্ ভুলে এ গভীর পতন আমার?
তুমি জান—তুমি মাত্র জীব জন্ম কার।।

শ্রীরামলাল বন্দোপাধ্যায়।

বঙ্গের আদি কবি শ্রীচণ্ডীদাস ঠাকুর। (১)

আমরা ভক্তি শাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখিতে পাই, এবং বিজ্ঞজন মাত্রেই বলিয়া থাকেন, মহাত্মা চণ্ডীদাসই বঙ্গের আদি কবি। তাঁহা হইতেই বঙ্গ ভাষার অত্যুজ্জ্বল মধুর পদাবলী কীর্ত্তনের সৃষ্টি। তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে সংস্কৃত ভিন্ন কোন ভাষা-গ্রন্থ ছিল না।

কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ত্রি অশীতি বৎসর পূর্ব্বে মহাত্মা চণ্ডীদাস এই বঙ্গভূমির রাঢ়দেশে অর্থাৎ বীরভূম জেলার মধ্যস্থিত নান্নুর গ্রামে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালাবধি এখন পর্য্যন্ত ঐ গ্রামে অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীশ্রীবিশালাক্ষি বা বাশুলী নামে "শিরোপরি সংস্থিতা" পাষাণময়ী চতুর্ভুজা চণ্ডীদেবীর প্রতিমূর্ত্তি, যথা, "নান্নুরের মাঠে হাটের নিকটে ইত্যাদি" বিরাজমান আছেন। পূর্ব্বে চণ্ডীদাসের পিতা ঐ দেবী আরাধনা করিয়া পুত্ররত্ন চণ্ডীদাসকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দেবী দত্ত বলিয়াই "চণ্ডীদাস" নামকরণ হইয়াছিল। পরন্তু, চণ্ডীদাসের পিতা মাতা বিধিকৃত বিড়ম্বনায়, চণ্ডীদাসের উপনয়নাদি সংস্কার না হইতে হইতেই কাল প্রবাহে পুত্ররত্ন-সুখ লাভে বঞ্চিত হইয়া একে একে গোলোকধামে গমন করেন।

চণ্ডীদাস বাল্যকালে মাতা পিতার বিয়োগে অসহায় ও নিরাশ্রয় হন্। পরন্তু, "একটী প্রসিদ্ধ কথা আছে "নিরাশ্রয়ের রক্ষক জগদীশ্বর"। ঐ গ্রামে বিস্তর রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণের বসতি ছিল, তাঁহারা দয়াপরতন্ত্র হইয়া চণ্ডীদাসকে যত্ন পূর্ব্বক প্রতিপালন করেন। পশ্চাৎ চণ্ডীদাসের উপনয়নের কাল সমুপস্থিত হইলে যাবতীয় ব্রাহ্মণগণ সমবেত হইয়া বিধিপূর্ব্বক চণ্ডীদাসের উপনয়নাদি সংস্কার

কার্য্য সম্পন্ন এবং ব্রাহ্মণের যে সকল কর নীয় কার্য্য, অর্থাৎ পূজা, পদ্ধতি ও গায়ত্রী ও সন্ধ্যাবন্দনাদি ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম সকল শিক্ষা দিয়া, শেষে তাঁহাকে তাঁহারই পৈতৃক ঐ দেবী পূজার কার্য্যে পূজারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। চণ্ডীদাস তৎকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া প্রতিদিন দেবী পূজা করিতেন। আর দেবীর নিত্য সেবার বরাদ্দ অন্নাদি পাক করিয়া দেবীকে ভোগ দিতেন। এবং সেই ভোগ সেবাইত দিগকে বিতরণ করিয়া শেষে নিরামিষ প্রসাদ পাইতেন। আর দেবীর শ্রীমন্দিরের নিকট মঠের মধ্যে অর্থাৎ নির্জ্জন স্থানে পাতের কুটীর বাঁধিয়া থাকিতেন। পদে আছে,—

নান্নুরের মাঠে পাতের কুটীর নিরজন স্থান অতি।
বাশুলী আদেশে চণ্ডীদাস তথা ভজন করয় নিতি॥
* * * পদসমুদ্র।

সেই সময় রামমণি, নামান্তর রামিণী বা রামী নামে একটী রজকী কন্যা বালিকাবস্থায়, মাতা পিতার বিয়োগে অভিভাবক শূন্য হইয়া, আহারান্বেষণে ইতস্ততঃ ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত ও কোথাও অন্ন ও কোথাও বা অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী যাহা কিছু যাচিঞা করিয়া পাইত, তাহাই আহার করিয়া উদর পূর্ণ করিত। আর "শয়ন হট্টমন্দিরে" হাটে বাজারে অনাবৃত স্থানে পড়িয়া থাকিত। ক্রমে বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে (রামমণি) যখন একটুকু চতুর ও কাজকর্ম্ম করিতে পটু হয়, তখন গ্রামস্থ সকলে দয়া করিয়া তাহাকে (রামমণিকে) দেবীমণ্ডপ সংস্কার কার্য্যে নিযুক্ত করেন। পদে আছে,—

অল্প বয়সে দুখিনী রামিণী কাজেতে নিযুক্ত হল।
চণ্ডীদাস কহে প্রসাদ ভুঞ্জিয়ে ক্রমে বাড়িতে লাগিল॥

রামমণি পরিচারিকা স্বরূপ কাজে নিযুক্ত হইয়া প্রতিদিন গোময় লেপন ও মার্জ্জনী দ্বারা (দুবেলা) দেবী মণ্ডপ পরিষ্কার করিতেন। আর সেই কার্য্যের বৃত্তি স্বরূপ প্রাত্যহিক একপাত করিয়া পানড়া অর্থাৎ প্রসাদ অন্ন পাইতেন। এবং তাহাই স্বচ্ছন্দে আহার করিয়া কাল কাটাইতেন। আর কোন উদ্যম করিতে হইত না। দেবীর প্রসাদ অন্ন ভোজন করিয়া রামমণি হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া ক্রমশঃ শশীকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া যৌবন অবস্থা প্রাপ্ত হন। কিন্তু বয়স্থা হইয়াও তিনি বিবাহ কি অন্য পতি সঙ্গ করেন নাই। বড়ই শুদ্ধমতি ছিলেন। দেবীর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। ঐ প্রদেশের লোক (ঝির পরিবর্ত্তে) বাড়ীর চাকরাণীকে কামীন বলে। এজন্য সকলেই আহ্লাদ করিয়া রামমণিকে কামীন বলিয়া ডাকিত। পদে আছে,—

'রামিণী কামিনী, কাজেতে নিপুণা, সকলের প্রিয়তমা।
চণ্ডীদাস কহে, তাহার পিরীতি, জগতে নাই উপমা॥'
* * * * পদসমুদ্র

সংক্ষেপে রামমণির পরিচয় এই পর্য্যন্ত। এখন অন্য বাশুলীর কথা, পদে আছে,—

সালতোড়গ্রাম, অতিপীঠস্থান নিত্যের আলয় যথা।
ডাকিনী বাশুলী, নিত্যাসহচরী, বসতি করয় তথা॥
চণ্ডীদাস কহে সে এক বাশুলী প্রেম প্রচারের গুরু।
তাঁহারি চাপড়, নিদ ভাঙ্গিল, পিরিতি হইল সুরু॥
* * * * পদসমুদ্র।

কিম্বদন্তী, পূর্ব্বকালে সালতোড়া নামক গ্রামে বনদেবী অর্থাৎ শ্রীশ্রীনিত্যা নামে প্রস্তরময়ী মনসা দেবীর প্রতিমূর্ত্তি ছিল। অভিধানে দৃষ্ট হয়, নিত্যা শব্দে "মনসাদেবী" অপর নাম পোদ্মা কুমারী। সেই কালে ঐ দেবী বড়ই প্রভাবশালিনী ছিলেন।

এমন কি, ঐ দেবীর নামে দোহাই দিয়া অর্থাৎ "কার আজ্ঞা, পোদ্মাকুমারীর আজ্ঞা"

এই বাক্যের সহিত মহামন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে ঝাড় ফুক করিলে তৎক্ষণাৎ বিষক্ষয় ও রোগী আরোগ্য হইত। এখনও সেই সকল মন্ত্র আছে, কিন্তু প্রভাব নাই।

এ কথা প্রসিদ্ধ আছে, ঐ দেবীর শ্রীমণ্ডপের নিকট একটী পঞ্চ মুণ্ডির আসন ছিল; তন্ত্রে আছে ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, যবন, এই তিন নরকপাল, আর শৃগাল ও বানর এই দুই পশু কপাল অর্থাৎ এই পঞ্চ মুণ্ডে যে বেদী নির্ম্মাণ হয়, তাহারই নাম পীঠ। তাহারই নাম "পঞ্চমুণ্ডি" আসন। অনেক সাধকে সেই বেদীতে বসিয়া মন্ত্র সাধনা করিতেন ও নায়িকা সিদ্ধ হইতেন।

নিত্যাদেবীর পরিচারিকা স্বরূপ, কয়েকটী ডাকিনী ছিল, দেশ বিদেশ হইতে সর্প ওঝাগণ তাহাদের নিকট আসিয়া সর্পমন্ত্র শিক্ষা করিত। জ্যৈষ্ঠমাসে দশহারার যোগে ঐ মনসাদেবীর ঝাপান নামে এক পর্ব্ব অর্থাৎ মহা মেলা হইত। ঝাপান শব্দে "সর্প লইয়া ক্রীড়া করণ।"

নানা স্থান হইতে ব্যালগ্রাহীগণ নানাজাতি বিষধর সর্প লইয়া ঐ কালে দর্শকদিগকে নানা প্রকার ক্রীড়া কৌতুক দেখাইত। ঐ কালে পরস্পর গুণীনে গুণীনে মন্ত্র পরীক্ষা হইত। ওঝাগণ মন্ত্রবলে সর্পকে নির্জীব করিত, আবার মন্ত্র বলে জাগাইত। কেহ কেহ সর্পের মুখ হইতে গরল বাহির ও তাহা ভক্ষণ করিয়া মন্ত্র বলে বা জটাবুটী দ্রব্যগুণে অনায়াসে বিষ জীর্ণ করিত। কেহ বা হডপি-স্থিত সর্প মন্ত্রবলে উড়াইত, কেহ বা রজ্জুকে সর্প করিয়া মঞ্জুষা মধ্যে পুনঃ স্থাপন করিত।

এখন আর সেকাল নাই, সে খেলাও নাই, সে গুণীনও নাই, কালে সকলই লোপ হইয়াছে। দেবদেবীও এক প্রকার নিদ্রিতা হইয়াছেন। ঐ সালতোড়া গ্রাম জেলা বাকুড়ার অধীন থানা গঙ্গাজলঘাটীর নিকট।

আর এক কথাও প্রসিদ্ধ আছে। উক্ত দেবী ঝুমুর গান শুনিতে বড়ই ভালবাসিতেন। গণিকাগণ দলপুষ্টি হইয়া যে রঙ্গরসের গান করে, তাহার নাম ঝুমুর বা খেউড়। সেই সকল গানে কেবল পিরীতের কথা। দেবী সেই গান শুনিয়া অধিক প্রীত হইতেন। এখনও ঐ প্রদেশের স্থানে স্থানে ঝুমরের দল আছে, এখনও বনজাতিগণ দলে দলে স্ত্রী, পুরুষে মিলিত হইয়া মাদল বাজাইয়া খেউড় গান করে। নিত্যাদেবীর যে কয়েকটী সহচরী বা ডাকিনী ছিল, তাহার মধ্যে বাশুলী নামা দ্বিজ কন্যা প্রধানা ছিলেন।

একদা, শ্রীশ্রীনিত্যাদেবী ঝুমুর গানের পরিবর্ত্তে শ্রীশ্রীবৃন্দাবনের শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা ঘটিত পবিশুদ্ধ গীত চলন ও যাহাতে সহজ ভজন সর্ব্বত্র প্রচার হয়, বাশুলীর প্রতি সেই আজ্ঞা করেন, বাশুলী তদনুসারে, এক দিন ভ্রমণ করিতে করিতে নান্নুর গ্রামে উপনীত হইয়া এবং ক্ষেত্রে চণ্ডীদাসকে নিদ্রিত অবস্থায় নির্জ্জন গৃহে পাইয়া তাঁহার পৃষ্ঠ দেশে চাপড় মারেন। সেই চপেটাঘাতে চণ্ডীদাসের নিদ্রা ভঙ্গ হয়; বাশুলী সেইকালে চণ্ডীদাসকে আধ্যাত্মিক তত্ত্বোপদেশ দিয়া শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরুর আশ্রয়ে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলা-রসের গীত প্রচার করিতে ও শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে পরামর্শ দেন। আর রামীর সহিত প্রবৃত্ত হইতে বলেন। এ তত্ত্ব পদে আছে; যথা—

"নিত্যের আদেশে, বাশুলী চলিলা সহজ জানাবার তরে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে নান্নুর গ্রামেতে প্রবেশ যাইয়া করে॥

বাশুলী আসিয়া, চাপড় মারিয়া, চণ্ডীদাসে কিছু কয়।
সহজ ভজন, করহ যাজন, ইহা ছাড়া কিছু নয়॥
ছাড়ি যপ তপ করহ আরোপ একতা করিয়া মনে।
যাহা কহি আমি, তাহা কর তুমি ভজহ চৌষট্টি সনে॥

"বতি পরকিয়, যাহাকে কহিবা, সেই সে আরোপ সার
ভজন তোমারি রজক ঝিয়ারি, রামিণী নাম যাহার॥

* * *

চণ্ডীদাস ইহা শ্রবণে আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, হে দ্বিজ কন্যে! আমি উত্তম কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, রামীর সহিত সাধ্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে আবার কোন্ বর্ণ প্রাপ্ত হইব? যে বৃন্দাবনের কথা বলিতেছেন, সে বৃন্দাবন কোথায়? আর কিশোর কিশোরী কোথায় আছেন? সে সাধনার অঙ্গ কি? এই বলিয়া যে একটী পদ্য প্রকাশ করেন, তাঁহা এই,—

প্রবর্ত্ত দেহের সাধনা করিলে, কোন্ বরণ হব।
কোন বর্ণ যাজন করিলে, কোন্ বৃন্দাবনে যাব॥
নব বৃন্দাবনে নব নাম হয়, সকল আনন্দময়।
কোন্ বৃন্দাবনে, ঈশ্বর মানুষে, মিলিত হইয়া রয়॥
কোন্ বৃন্দাবনে, বিযোজ্য বিলাসে,তরু লতা চারি পাশে।
কোন্ বৃন্দাবনে, কিশোরা কিশোরী, শ্রীরূপ মঞ্জরী সাথে॥
কোন বৃন্দাবনে, রস উপদয়ে সুধার জনম তায়।
কোন বৃন্দাবনে, বিকশিত পদ্ম, ভ্রমরা পশিছে তায়॥
গোপনের পথ, না হয় যাকত রসিক জনার সনে।
উপাসনা ভেদ, যাহার হয়েছে, সেই সে মরম জানে॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস, না জানিয়ে তাতে, কেমনে হইবে পার।
উত্তম কুলেতে লভিয়া জনম, ছি? নীচ সহ ব্যবহার॥

পদসমুদ্র।

বাশুলী শুনিয়া প্রশ্ন দ্রুত পদে উত্তর করিলেন,—

'বাশুলী কহিছে শুনহে দ্বিজ।
কহিব তোমার সাধন বীজ॥
প্রথম দুয়ারে মদের গতি।
দ্বিতীয় দুয়ারে, আসক স্থিতি॥
তৃতীয় দুয়ারে, কন্দর্প বয়।
কন্দর্প রূপেতে শ্রীকৃষ্ণ কয়।
আসক রূপেতে শ্রীকৃষ্ণ কই।
মদরূপ ধরি, আশ্রিত হই॥
সাতাইস আঁখরে, সাধিতে তিনে।
একত্র করিয়া আপন মনে॥
রতির আকৃতি অনেকে রয়।
রসের আকৃতি কন্দর্প হয়॥
তিনটী আঁখরে রতিকে যজি।
পঞ্চম আঁখরে বানকে ভজি॥
দ্বিতীয় আসকে, সামান্য রতি।
তবে সে পাইবে, বিশেষ স্থিতি॥
চতুর্থ আঁখরে, সামান্য রস।
তাহাতে কিশোরা কিশোরী (বশ)
বাশুলী কহয়ে, এই সে সার।
নিত্য বৃন্দাবন বেদান্ত পার॥

* * * পদ-সমুদ্র।

চণ্ডীদাস এই সমস্যা শুনিয়াই মূর্চ্ছিত হইলেন। বাশুলী সেই অবস্থায় কৃতকার্য্য হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান অর্থাৎ নিত্যাস্থানে গমন করেন। পদে আছে,—

চণ্ডীদাস প্রেমে, মূর্চ্ছিত হ'ল।
বাশুলী চলিয়া নিত্যতে গেল॥"

বাশুলীর এইরূপ প্রত্যাখ্যানে, মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর চণ্ডীদাসের মন উচাটন হয়। চণ্ডীদাস লেখা পড়া জানিতেন না। পরন্তু "বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য ছিলেন," তিনি কাহারও নিকট দীক্ষিত হন নাই। দেবীর প্রতি তাঁহার দৃঢ় ভক্তি ছিল। কে তাঁহার গুরু হইবেন, কেই বা সাধক শিক্ষা দিবেন, উত্তম কুলে জাত হইয়া কেমন করিয়া নীচাশ্রয় হইবেন, এই চিন্তায় আকুল হইলেন।

পাঠক, এই বাশুলী সেই ডাকিনী বাশুলী নহে, "নান্নুরের স্বয়ং অধিষ্ঠাত্রীদেবী," তিনি চণ্ডীদাস ও রামীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক "রাধাকৃষ্ণ" এই চতুরাক্ষর মহামন্ত্র দান করেন। আর গৌতমী তন্ত্র অর্থাৎ নির্য্যাস তন্ত্রের মতানুসারে সাধনা করিতে

বলেন। এবং তাহার প্রণালী অর্থাৎ ক্রম সকল স্বয়ং গুরুরূপে শিক্ষা দেন। বলা-বাহুল্য, এই সাধন তত্ত্বের নাম "গোপীভজন"। ইহা এক প্রকার সর্প লইয়া খেলা। অনন্তর চণ্ডীদাস ও রামী শ্রীশ্রী বাশুলীদেবীর কৃপায় সেই মন্ত্রাশ্রয় করিয়া উভয়ে সাধন শিক্ষায় প্রবৃত্ত হন। অনুক্ষণ সেই মন্ত্র যজন যাজন করিতেন। মহামন্ত্র ও সাধনার প্রভাবে রামীর দর্শনে এবং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল রূপের ভাবোদ্দীপনে চণ্ডীদাসের বদন হইতে ব্রজলীলার, মধুর মধুর পদ গান স্ফুরিত হইত। তিনি, রামীকে আশ্রয় করিয়াই (গোপী ভাবে) সঙ্গীতোপযোগী পদ রচনা করিতেন। রামিণী সেই সকল পদ কণ্ঠস্থ ও নিজকৃত কোন কোন পদের সহিত যোগ করিয়া তান, মান, লয়, ও সুর সংযোগে ঘরে ঘরে গান করিয়া বেড়াইতেন।

নান্নুরের ব্রাহ্মণগণ সকলেই দেবীভক্ত ছিলেন। চণ্ডীদাসের পদ ও রামমণির গীত, তাহাদিগকে বড় ভাল লাগিত না; বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গে পিরীতি ভাবের গীত শুনিলে তাহাদিগের কর্ণজ্বালা ও অঙ্গজ্বালা হইত। সেই সকল গান শুনিলে অন্তঃপুর-চারিণী ললনাগণের চিত্ত বিচলিত হইবার সম্ভব, এইজন্য ঐ সকল গীত যাতে রহিত ও চণ্ডীদাস ও রামমণি স্থানান্তরিত হয়, সেই চেষ্টায় সকলে একটা ঘোট করেন। সেই ঘোটে এই এই কথাগুলি উত্থাপন হয়, যথা"—(১) চণ্ডী ও রামী উভয়েই অনূঢ়, (২) পরস্পর সংঘটনে সঙ্গ অর্থাৎ উভয়েই সঙ্গ দোষে দোষী, (৩) রামী ধোপার মেয়ে, চণ্ডীদাস ব্রাহ্মণ হইয়া যখন নীচগামী হইয়াছে, তখন চণ্ডীর সহিত আহার ব্যবহার ও পংক্তি ভোজন ও তাঁহার হস্তের পাক অন্ন দেবীকে অর্পণ করা কর্ত্তব্য নহে, (৪) উভয়কেই গ্রাম হইতে দূর করিয়া দেওয়া ও অশ্লীল গান রহিত করা কর্ত্তব্য, (৫) অন্যান্য গ্রামে গিয়া উহারা কোন আশ্রয় না পায়, তজ্জন্য এ কথা ঘোষণা দিয়া গ্রামে গ্রামে রাষ্ট্র ও সকলকে সাবধান করা উচিত।" গ্রামের কি ছোট কি বড়, সকলেরই এই প্রস্তাবে একমত হওয়ায় তাহাই কার্য্যে পরিণত হইল। সেই দিন হইতে দেশচক্রে চণ্ডীদাস পড়িলেন ও দেবী সেবার কার্য্যে অধিকার চ্যুত ও দেবীর প্রসাদ অন্নে রামমণি বঞ্চিতা হইলেন।

অনন্তর, ঢক্কার বাদনে উভয়ের ঐ কলঙ্ক দেশে বিদেশে রাষ্ট্র হইল; ইহাতে রামমণি মিছা কলঙ্কে অত্যন্ত দুঃখিতা ও ম্রিয়মাণা হইয়া খেদোক্তি দ্বারা চণ্ডীদাসের নিকট নিজ মনোগত ভাব পদ্যে প্রকাশ করেন, যথা,—

"কি কহিব বঁধুহে, কহিতে না যুয়ায়।
কাঁদিয়া কহিতে, পোড়া মুখে হাসি পায়॥
প্রেমের পশরা মোর, দরিয়ায় ভাসে হে।
না পাইনু না ছুঁইনু, সোতে ভেসে যায় হে॥
অনামুখ মিনসেগুলার, কিবা বুকের পাটা।
কলঙ্ক রটায় আর, কুলে দেয় বাটা॥
ঢাক পিটিয়া সহজ বাদ, গ্রামে গ্রামে দেয় হে॥
চক্ষে না দেখিয়া মিছে, কলঙ্ক রটায় হে॥
ঢাক ঢোলে যে জন, সুজন নিন্দা করে।
বজর্ঝনা না পড়ে কেন, মস্তকোপরে।
অবিচার পুরী দেশে আর না রহিব।
যে দেশে পাষণ্ড নাই, সেই দেশে যাব॥
বাশুলী দেবীর যদি, কৃপা দৃষ্টি হয়।
মিছা কথা সেঁচা জল, কতক্ষণ রয়॥
আপনার নাক কাটি, পরে বলে বোঁচা।
সেভয় করে না রামী, নিজে আছে সাঁচা॥"

পদসমুদ্র

চণ্ডীদাস শুনিয়া উত্তর করিলেন;—বিদগ্ধে! দুঃখ দ্বারা হতাশ হইও না। এইত অভিসারের সময়, যথা,

"রূপিলে বিষের গাছ, হৃদয় মাঝারে।
গরলে জারিল অঙ্গ, দোষ দিবে কারে॥
যদি ঘরে রৈতে নার, কর অভিসার।
চণ্ডীদাসেতে কহে, এই সে বিচার।"

পদসমুদ্র

আরো বলিলেন, শ্যাম-কলঙ্কী হওয়া ভাল, কিন্তু শ্যাম বৈরী হওয়া ভাল নয়। রামমণি বলিলেন, সে আবার কি? চণ্ডীদাস উল্লাসে বলিলেন; –

"চণ্ডীদাস বলে, শুনলো সুন্দরী একথা বুঝিবে পাছে।
শ্যাম বন্ধুগণ পিরীতি করিয়া কেবা কোথা সুখে আছে॥
আপনা বুঝিলে, লাপে এক মিলে ঘুচিলে মনের ধাঁদা।
চণ্ডীদাস বলে পাবে হাতে হাতে চারি অক্ষরে থাক বাঁধা

* * * *

চারি অক্ষর কি? শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ চতুরাক্ষর মহামন্ত্র। এই চারি অক্ষর মহামন্ত্রে বাঁধা থাকিলে সকল আপদ বালাই দূর হয়। যথা; –

"রাধাকৃষ্ণ পদে ভক্তি, কা চিন্তা মরণে রণে"

এই কথায় রামমণিকে আশ্বস্ত করিয়া গুপ্তভাবে থাকিতে বলিলেন। অনন্তর, লোক শিক্ষা দিবার নিমিত্ত চণ্ডীদাস পীড়ার ভান করিয়া কুটিরের মধ্যে শয়ন করিয়া রহিলেন। আর বমনের ছলে সতৃষ্ণ হইয়া প্রতিবাসীদিগের নিকট মুহুর্মুহু জল যাজ্ঞা করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রাতিবাসীগণ সেই কালে এতদূর দুষ্ট ব্যবহার করিল, যে জল দান দূরের কথা, চণ্ডীদাসের কাতরোক্তি শুনিয়াও শুনিল না; পীড়া দেখিয়াও দেখিল না; এমন কি, চণ্ডীদাসের আশ্রম পর্য্যন্ত মাড়াইল না।

চণ্ডীদাস এই অবস্থায় দুই দিন অনসনে কুটির মধ্যে শয্যায় পতিত থাকিয়া কাল কাটাইলেন। তৃতীয় দিন উপস্থিত, সেই দিন চণ্ডীদাসের পূর্ব্ববৎ আর সাড়া নাই, শব্দও নাই। পশ্চাৎ ঐ কথা গ্রামস্থ লোকের কাণে উঠিল। সকলে প্রকৃত বিষয় অনুসন্ধানের নিমিত্ত উগ্রচণ্ডাগোচ জনকয়েক ব্রাহ্মণকে চণ্ডীদাসের আশ্রমে পাঠাইলেন।

ব্রাহ্মণগণ কুটিরের নিকট উপস্থিত হইয়া দ্বারদেশে উঁকি মারিয়া দেখিলেন, চণ্ডীদাস প্রকৃত মৃত্যুমুখে পতিত। পুনঃ পুনঃ উচ্চ ডাকেও উত্তর নাই, নিকটেও কেহ নাই; কেবল কুটির মধ্যে খট্টাসনে কতিপয় শ্রীশালগ্রাম শ্রীবিষ্ণু এবং ধাতু নির্ম্মিত শ্রীবাস গোপাল প্রতিমূর্ত্তি বিনা সেবা পূজায় উপবাসী আছেন। তদ্দৃষ্টে তদ্দণ্ডেই গ্রামস্থ লোককে সেই কথা জানাইলেন। তৎশ্রবণে তৎকালে সকলের একটা বিষম দায় উপস্থিত হইল। দায় কি?

শাস্ত্রে আছে, গণ্ডকি-জাতঃ শীলারূপী শ্রীসালগ্রাম শ্রীবিষ্ণু যে কোন জাতির গৃহে থাকুন না কেন, ব্রাহ্মণ মাত্রেই তাঁহার সেবা পূজা করিবার অধিকারী। নীচাশ্রমে থাকিলে যদি কোন ব্রাহ্মণ তাচ্ছিল্য বা অগ্রাহ্য করিয়া সেবা পূজা না করেন,মহাপাপ ও মহা অপরাধ হয়, সে অপরাধের মোচন নাই।

পক্ষান্তরে যে কোন জাতি হউক না কেন, গ্রামের মধ্যে কোন গৃহস্থের বাটীতে বিনা সংকারে মড়া অর্থাৎ মৃত কায়া পড়িয়া থাকিলে যাবৎ সেই শবের সংকার, অথবা সেই শব স্থানান্তর না হয়,তাবৎ গ্রামে শ্রীবিষ্ণু পূজাদি কার্য্য একেবারে নিষিদ্ধ। কারণ তৎসময়ে সেই মৃতাশৌচ সকলকেই স্পর্শকরে।

চণ্ডীদাস নিজে অনূঢ় বিশেষ পতিত, তাহার আত্মীয় অর্থাৎ আপনার বলিতে কেহই নাই; কে তাহার গতি কার্য্য করিবে। কেমনেই বা ধর্ম্ম রক্ষা ও বিষ্ণুপূজা হইবে? এই ভাবনায় সকলে বিষম সঙ্কটে পতিত

হইয়া শেষ ব্যবস্থার নিমিত্ত অধ্যাপকের নিকটে গমন করেন। অধ্যাপক মহাশয়, ব্রাহ্মণগণ প্রমুখাৎ সকল কথা অবগত হইয়া বলিলেন, "চণ্ডীদাস ব্রাহ্মণ, তাঁহার গতিকার্য্য করিতে শূদ্রের অধিকার নাই; সংহিতাকার যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মণের গতি ব্রাহ্মণ," তাঁহার দাহন বহন ব্রাহ্মণকেই করিতে হইবে। যাবৎ চণ্ডীদাসের গতিকার্য্য না হয়, তাবৎ বিষ্ণুপূজা নিষিদ্ধ, অতএব সকলে মিলিয়া চণ্ডীদাসের মৃত দেহ শ্মশান ভূমে লইয়া গিয়া অগ্নি দাও, পশ্চাৎ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সকলে শুদ্ধি হইবে, অন্যথা বিষ্ণুপূজা হইবে না।" (ক্রমশঃ)

শ্রীহারাধন দত্ত।

ফরিদপুরের দুর্ভিক্ষ।

ইতিহাস।

১৩০০ সাল ফরিদপুরের পক্ষে অতি দুর্বৎসর। ১৩০০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের অসাময়িক প্লাবনে ফরিদপুরের বহুস্থানের ধান বিনষ্ট হইয়া যায়। এজন্য ভাদ্র মাসে সমস্ত জেলায় হাহাকার উঠে। আষাঢ় মাসে (১৩০০) ফরিদপুর সুহৃদসভার সম্পাদক বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী জলপ্লাবন দেখিতে গমন করেন। পরিদর্শনান্তে, তিনি কলিকাতা পৌঁছিয়া, সুহৃদসভার নিকট ভাবী আশঙ্কার কথা উল্লেখ করেন এবং শ্রীযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট এক খানি পত্র লেখেন। তাহার উত্তরে তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গ্রাউজ সাহেব ৪ঠা আগষ্ট, ১৮৯৩ যে উত্তর প্রদান করেন, তাহা এই;—

"Sir, I have the honour in reply to your letter of the 1st instant to inform you that although it seems from the expression used therein that you take an exaggerated view of the distress that is likely to occur in the southern portion of this district, it has already engaged my attention, and I have just returned from a tour in those parts and you may rest assure that necessary measures will be taken." Sd. E. F. Growse, Magistrate. No. 1739—4th August, 1893.

ভাদ্রমাসে আশঙ্কা কার্য্যে পরিণত হইলে, চতুর্দ্দিকের অবস্থা জ্ঞাত হইবার জন্য, নানাস্থানে মুদ্রিত পত্র প্রেরণ করা হয়। মুদ্রিত পত্র পাওয়ার পর চতুর্দ্দিক হইতে রাশি রাশি পত্র পাওয়া যাইতে লাগিল। এই কার্য্যে শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় অগ্রণী হইয়াছিলেন। গোপালগঞ্জ ও কোটালিপাড় থানা বাদে, ফরিদপুরের অন্যান্য থানার বহুগ্রাম হইতে অন্ন কষ্টের বিবরণ সহ ৫০।৬০ খান পত্র আসিয়াছিল। তাহাতে জানা যায় যে, প্রায় ১০০০ গ্রামে অন্নকষ্ট। এই সময় কি করা যাইবে, খুব চিন্তার বিষয় হইল। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত স্থানে যাইয়া কাজ করিতে পারেন, এমন ৮।১০ জন উপযুক্ত লোকের অনুসন্ধান করা হইল, দুঃখের বিষয়, তাহা পাওয়া গেল না।

তখন নিরুপায় হইয়া, সমস্ত বিবরণের সংক্ষিপ্ত চুম্বকসহ, ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট ও বোর্ডে আবেদন প্রেরণ করা হইল, এবং এই কথা মুদ্রিত পত্রদ্বারা সমস্ত দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানে ঘোষণা করা হইল। এই সময়ে ম্যাজিষ্ট্রেট কুল তিলক শ্রীযুক্ত বিটসন্ বেল সাহেব ফরিদপুরের অফিসিয়াটিং ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং সহৃদয় বাবু হরিশচন্দ্র সেন ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের ভাইসচেয়ারম্যান ছিলেন। বোর্ড হইতে ২৫শে আগষ্ট (১৮৯৩) পত্র পাওয়া

গেল যে,বোর্ড বিবিমত চেষ্টা করিতেছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ১৯শে সেপ্টেম্বর,১৮৯৩, যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত আশাপ্রদ। তিনি লিখিয়াছিলেন ;—

"Sir, with reference to your letter of the 15th instant, I have the honour to inform you that a sum of Rs. 5000 has been given by the District Board as a loan to the people in distress and a further sum of Rs. 20,000 has been asked from Government for the purpose. Besides some of the resident and non-resident Zemindars and well-to-do men of this District were requested to contribute something for the immediate relief of the distressed people. Some of them have already complied with the request and the other are expected to do so shortly.

2. I beg also to state that some of the gentlemen have been requested to arrange to supply rice to those who are absolutely indigent and unable to work from age, infirmity or sex, or to send some money that rice may be bought for this purpose.

3. A Committee has also been formed for proper distribution of Rs. 300 given in addition by Maharajah Sir Jotindra Mohan Tagore, K. C. S. I., especially for the relief of his ryots in the Ainpur Thanah.

4. Two native Doctors have been sent to the Palong quarters for the treatment of cholera patients." Sd. B. Bell., off. Magistrate, Faridpur, 19th Sep. 1893.

ইহার পর তদানীন্তন কালের অফিসিয়াটিং ছোট লাট সাহেব, ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ খ্রীঃ এক বিস্তৃত রিজলিউসনে লেখেন,—(২৬ শে সেপ্টেম্বরের ষ্টেটস্‌ম্যান, ১৮৯৩।)

"In the Dacca Division there is a small tract known as the *Bil* country, in the Backerganj and Faridpur Districts, with a population of about 40,000 persons, in which there is likely to be some scarcity, possibly even distress. * * *

* * * * * * *

The supply of fish is inexhaustible and part of the population being fishermen, food i. procurable by them independently of their rice crops. The remainder of the population consists mostly of Christians, Mussalmans and Namas. These have been accustomed to move elsewhere in search of labour; but as the *aus* crop is light, and as earth-work does not in these districts begin before December, these people, if not assisted, will be pinched, if not subjected to still greater distress. * * * They (complaints) have been again raised and Sir Antony Mac-Donnell has again ordered test relief works to be started. The District officers are carefully watching for signs of distress, and have been instructed to make agricultural loans and to take such other measures as they may on personal enquiry find to be necessary. In making agricultural loans care is necessary lest the amounts advanced are expended on payment of rent, and not in the support of the recipients."

ইহার পর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে পুনঃ যে পত্র লেখা হয়, তদুত্তরে তিনি লেখেন যে, "গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রচুর নহে ; পুনঃ টাকার জন্য লেখা হইয়াছে।" তাঁহার পত্র এই —

"Sir,—With reference to your note of 26th September, I beg to inform you that there is no change in the prospects of the district at present, except that the floods are gradually subsiding and the price of rice falling in the affected area, owing to increased importation. We are taking all necessary measures to cope with the distress.

A sum of Rs. 5,000 from the District Board and a sum of Rs. 3,000 from the Government is being distributed as loans to those in need. At present we are chiefly engaged in making enquiries to find out the really deserving cases: of course the applicants cannot all receive sums out of our small allotment. I am in daily hopes, however, of receiving more money from Government.

We are offering work at the rate of 2 annas per day to those in distress, but *none will accept our rates so far.* We are distributing rice to the infirm and widows, from funds raised by private subscriptions.

I am very grateful to those who have come forward to help us, but our funds for this purpose are always, as you may imagine, running short.

I start the day after to-morrow for a tour through the distressed area, and shall do all I can to alleviate the sufferers.

The Civil Surgeon is dealing with the cholera outbreak: he is at present sending down more men to cope with the work, and is probably going himself next week."

Yours sincerely,
N. D. BEATSON BELL,
offg. Magistrate.

Faridpur, Sept. 29. 1893.

এইরূপ ভাবে, বোর্ডের ও গবর্ণমেণ্টের

চেষ্টায় একরূপ দিন কাটিতে লাগিল। সুহৃদ্ সভার সম্পাদক বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়, বাবু রসিকলাল রায় মহাশয়ের সমভিব্যাহারে, কতক টাকা লইয়া, দুর্ভিক্ষের সাহায্য ও পালংথানায় ওলাউঠার ঔষধ বিতরণ করিতে কার্ত্তিক মাসে গমন করেন। ভাঙ্গা, মাদারীপুর থানার কতকাংশ দেখিয়া, তাঁহারা পালং থানায় গমন করেন। এই সময়ে সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয় যে, পালং থানায় ২০০০ লোক ওলাউঠায় মরিয়াছে, এই নিদারুণ সংবাদ পাইয়া তাঁহারা পালং গমন করিলেন। কোটালিপাড় থানায় আর যাওয়া হইল না। মাদারিপুর লোকাল বোর্ড যাহা যাহা করিয়াছেন, বিবরণ অবগত হইয়া তাঁহারা মনে করিলেন, এদিকের কার্য্য বেশ চলিতেছে। পালং থানার বহুগ্রাম পরিদর্শন করিয়া তাঁহারা দেখিলেন, সেদিকে দুর্ভিক্ষের তত আশঙ্কা নাই, কিন্তু অনেক লোক ওলাউঠায় মরিয়াছে ও মরিতেছে। থানায় যাইয়া মৃত্যুসংখ্যা জানিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহা জানিতে পারিলেন না, থানার লোকেরা বলিল যে, গবর্ণমেণ্ট হইতে বিবরণ দেওয়ার নিষেধ-পত্র আসিয়াছে। শেষে নানাগ্রামে ওলাউঠার ঔষধ বিতরণ করিয়া তাঁহারা ফিরিলেন। শীতকালে বোর্ড হইতে কোটালিপাড় একটী বড় রাস্তা ও ছোট ছোট গ্রাম্য রাস্তা হইতে লাগিল, এবং ধানভানার কাজ চলিতে লাগিল। তাহাতে একরূপ চলিতেছিল। কিন্তু ফাল্গুন মাসের শেষে আবার ভীষণ সংবাদ পাওয়া গেল যে, কোটালিপাড়ে খুব অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। বাবু কালীচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে রাধাগঞ্জ যাইয়া অতি ভয়ানক পত্র সকল লিখিতে লাগিলেন। লোক অনাহারে মরিতেছে, তাঁহার পত্রে অবগত হইয়া ফরিদপুর সুহৃদ্‌সভা হইতে, মাদারিপুরের সবডিভিসনাল অফিসার, ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, মাদারিপুর লোকাল বোর্ড এবং আরো বহু স্থানে পত্র লেখা হইল। গোপালগঞ্জের শ্রীযুক্ত বেঃ মথুরানাথ বসু, বি.এ, মাদারিপুর স্কুলের হেড্‌মাষ্টার বাবু কুলচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম.এ, উনসিয়া আর্য্যবিদ্যালয়ের কতিপয় পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত রেঃ জেমস্ সাহেব মহোদয়ের অধীনস্থ কতিপয় খ্রীষ্ট মিশনরী-প্রভৃতি মহাশয়গণের ও আরো বহু লোকের, এবং সর্ব্বোপরি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের পত্র পাইয়া সভা বড়ই দুঃখিত হইলেন। মাদারিপুরের সবডিভিসনাল অফিসার বা লোকাল বোর্ড উত্তর দিলেন না। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের পত্র এই,

From R. R. POPE Esquire C. S.,
Chairman, District Board, Faridpur,
To the Secretary, Faridpur Suhrid Sava,
Dated Faridpur, the 2nd April, 1894

Sir,

In reply to your vernacular letter of the 13th Chaitra, 1300 B. S. I have the honour to state that the District Board have taken all measures that lie in their power to put down the distress complained of. They have started relief works in the neighbourhood and introduced the system of husking Dhan by the old and poor women to help with certain amount of rice thus produced by them. The resources of the District Board have nearly been all exhausted and the Magistrate who has been on the spot personally, has written to the Commissioner of the division, a few days ago to ask help from Government.

I have the honour,
Sir,
Your most obedient Servant,
Sd. R. R. POPE,
Chairman

এই পত্রের পর আর অপেক্ষা করা উচিত নহে, মনে করিয়া, ফরিদপুর সুহৃদসভা, কিছু টাকা ঋণ করিয়া, বাবু বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে ২১শে চৈত্র, ১৩০০, কোটালিপাড় প্রেরণ করেন, এবং অর্থ সংগ্রহের জন্য বিশেষ

চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। বিহারী বাবু অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে প্রায় ৫০ খান গ্রামের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া, ৮ই শ্রাবণ পর্য্যন্ত উত্তর পাড় হাটে দরিদ্রদিগকে চাউল, বস্ত্র, পয়সা ইত্যাদি দান করিয়াছেন। তাঁহার নিঃস্বার্থ কাজের জন্য সভা চিরদিন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন। এরূপ পরিশ্রমী, কর্ত্তব্য পরায়ণ, পরদুঃখকাতর লোক আমাদের দেশে বিরল। কোটালিপাড়ের লোকের মুখে তাঁহার প্রশংসা ধরে না। তিনি যে সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট দিয়াছেন, এই প্রবন্ধের সহিত তাহা সংলগ্ন করিলাম।

এই সময়ে নানা কাগজে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পত্র লেখা হইয়াছিল। সেই সকল প্রার্থনাপত্রে দুর্ভিক্ষের যথাযথ অবস্থা বর্ণিত হইয়াছিল। তাহা পাঠ করিয়া, মাদারীপুরের সবডিভিসনাল অফিসার সভার নিকট যে পত্র লেখেন, তাহা এ স্থলে তুলিয়া দিলাম —

No. 238.—G.

From

MAULVI FAZLAL KARIM,

Sub-Divisional Officer, Madaripore.

To Babu Kali Prasanna Ray Chaudhuri.

Secretary, Faridpore Shurit Shabha.

Dated, Madaripore, the 16th May, 1894.

Sir,

In your communication published in the *Dainik* and *Samachar Chandrika* of the 5th April, 1894, it is stated that some people are dying of starvation and some are committing suicide in shere distress. I shall be much obliged if you would please give me the names and addresses of the persons therein referred to at an early date.

I have the honour to be,

Sir,

Your most obedient servant,

Sd. F. Karim.

Sub-Divisional Officer.

এই পত্রের উত্তরে, সুহৃদসভা হইতে, স্থানীয় বহু গণ্য ব্যক্তির পত্রের সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া, তাঁহার নিকট নিম্নলিখিত পত্র লেখা হয়; দুঃখের বিষয়, এ পত্রের উত্তর প্রদান করা দূরে থাকুক, তিনি প্রাপ্তিস্বীকারও করেন নাই।

ফরিদপুর সুহৃদ সভার কার্য্যালয়;
২১০।৪ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১।

মাননীয় শ্রীযুক্ত মাদারীপুর সবডিভিসনাল অফিসার
মহোদয় বরাবরেষু।

সসম্মান বিনীত নিবেদন,—

আপনার ২৩৮ জি নম্বর অঙ্কিত, ১৬ই মে (১৮৯৪) তারিখের বাবু কালীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর নামের পত্র পাইয়া সবিশেষ অবগত হইলাম। ফরিদপুর সুহৃদসভার সম্পাদক আমি বলিয়া এ পত্র খুলিয়াছি। আপনি দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের বিবরণ জানিতে চাহিয়া যে সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে অত্যন্ত বাধিত হইলাম। দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ ফরিদপুর সুহৃদ সভা হইতে বাবু বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রেরিত হইয়াছেন। তিনি উত্তরপাড় হাটে চাউল বিতরণ করিতেছেন। সাহায্যার্থ চাঁদা আদায় করিবার জন্য আমি যে আবেদন পত্র বাহির করিয়াছি, তাহা ইতিপূর্ব্বে মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়াছি। দৈনিকপত্রিকাতে উহাই ছাপা হইয়া থাকিবে। আমি স্বতন্ত্র কোন পত্র লিখি নাই। গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলে কখনও চলি নাই, কখনও চলিব ও না, গবর্ণমেণ্টই আমাদের ভরসা। আমি বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসে কোটালিপাড়, মাদারিপুর ও গোপালগঞ্জ থানা পরিদর্শন করি, ভাদ্র মাসে সমস্ত দেশের বিবরণ সংগ্রহ করি, তৎপর কার্ত্তিক মাসে পালং থানার অধিকাংশ গ্রাম পরিদর্শন করি। এ সকল স্থানের বিবরণ কোন কাগজে না লিখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট ও বোর্ডে প্রেরণ করি। বোর্ড এবং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব দেশের জন্য অনেক করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে, টাকার অভাবে রিলিফ ওয়ার্ক বন্ধ হইয়াছে, যখন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব লিখিলেন (২রা এপ্রেল, ১৮৯৪), তখনই সুহৃদ্ সভা সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা বুঝিলেন। এই সময়ে সভার হস্তে বহু পত্র উপস্থিত হয়। তন্মধ্যে কয়েকখানি পত্র হইতে কিছু কিছু তুলিয়া দিলাম। ইহাতেই, সাহায্য প্রার্থনার আবেদনের বর্ণিত কথা প্রতিপন্ন হইবে। এবং আমি ফরিদপুর সুহৃদ্ সভার প্রতিনিধি মহাশয়কে বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া

আপনার নিকট পাঠাইতে লিখিলাম, আপনি তাঁহার নিকট লিখিলেই তিনি সবিশেষ জানাইবেন। আপনি একটু চেষ্টা করিলেই স্থানীয় অবস্থা জানিতে পারিবেন। আশা করি, ইহাতেই আপনি পরিতুষ্ট হইবেন। স্থানীয় অবস্থা সম্বন্ধে আর আন্দোলন না করিয়া, আপনি যথাসাধ্য প্রতিবিধানের চেষ্টা করিলে একান্ত বাধিত হইব। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে আপনার নিকট (২৬শে মার্চ্চ, ১৮৯৪) পত্র লিখিয়া উত্তর না পাইয়া দুঃখিত আছি। আপনারা প্রতিবিধান করিলে দরিদ্র নিরন্ন ব্যক্তিদিগের জীবন ধারণের উপায় কি?

Extract. No 1. From the letter No. 1, dated 2nd April, 1894 of R. R. Pope Esquire, C. S. chairman District Board, Faridpur. "The resources of the District Board have nearly been all exhausted and the Magistrate who has been on the spot personally, has written to the Commissioner of the division, a few days ago to ask help from Government."

Ex. No. 2. From the letter, dated 17th April, 1894 of Babu Avinas Chandra Ray, Chairman, Local Board, Madaripore.

"ষোল সের ধান ভানিয়া /৯ নয় সের চাউল তাহারা ফেরত দেয়, বকী যাহা থাকে, তাহা তাহারা পায়। আপাততঃ ঐ কার্য্য বন্ধ করা হইয়াছে।"

Ex. No. 3. From the letter, dated 30th March, of Babu Kula Chandra Roy Chowdary, M.A., Head Master, Madaripore School.

"মদারীপুরের মিসন হইতে কয়েকটী খ্রীষ্টান আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা যাহা বলিলেন, তাহা শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। দুইটী লোক অন্নাভাবে আত্মহত্যা করিয়াছে। চারিদিকেই হাহাকার এবং আর্ত্তনাদ। তাঁহাদের সহিত ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রেরিত বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছে। তিনি যাহা পত্রিকায় লিখিয়াছেন, খ্রীষ্টান মিসনারীগণ তাহা সত্য বলিলেন।"

Ex. No. 4. From the letter, dated 2nd April, 1894, of Rev. M. N. Bose, B.A., B.L., Missionary of Gopalganj.—"The condition of Katawalipara is dreadful, several cases of suicide have taken place and many more will *surely* die if help be not at once. I am afraid Government is not going to do much for them."

Ex. No. 5. From the 2nd letter, dated 3rd May, 1894, of Rev. M. N. Bose, "why do you withdraw from the relief while the poeple are dying from hunger every week."

Ex. No. 6. From the letter, dated ২০শে চৈত্র, ১৩০০ of Pandit Revati Mohan Kabyaratna and Kali Das Bidyabinode of উনসিয়া।

"এমন কি, দুর্ভিক্ষ ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া রাধাগঞ্জ, গোয়ালন্দ এই দুই স্থানে ২টী লোক অকালে উদ্বন্ধনে জীবন ত্যাগ করিয়াছে। আমাদিগের সাধারণ বয়সে এরূপ দুর্ভিক্ষ আর দেখি নাই।"

Ex. No. 7. From the letter, dated Radhaganj, 28th March, 1894, of Babu Kasi Chandra Ghosal, delegate, Brahmo Samaj.

"না খেতে পেয়ে দুটী স্ত্রীলোক গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে। একটী একমাস হইল মরিয়াছে, আর একটী ১০।১২ দিন হইল মরিয়াছে। আর একটী স্ত্রী লোকও মাঠে মরিয়াছে, তাহার শব শেয়াল কুকুরে খাইয়াছে।

আজ ২০ দিন হইল এক মুসলমান মাঝির গলা কাটিয়া টাকা লইয়া গিয়াছে। রাধাগঞ্জের নিকট একটা বাড়ীতে ৮১ খানা ঘর পোড়াইয়া দিয়াছে। আরও ১ খানা বড় বাড়ী পোড়াইয়া দিয়াছে।

শুনিলাম আমবাড়ীতে একটী পুরুষ মরিয়াছে।"

Ex. No. 8. From the letter, dated Radhaganj, 3rd April, 1894, of Babu Chandra Kumer Sarkar and Babu Sasadhar Chakervarti, Missionaries.

"সাতমাস যাবৎ গরীব দুঃখীর উপকারার্থ উহাদিগেরই মধ্যে বাস করিতেছি। কোটালিপাড় সার্কেলে ৬১০০০ তেত্রিশ হাজার লোকের বাস, তন্মধ্যে কুড়ি হাজার লোকেরই ভয়ানক অন্নকষ্ট। এমন কি, কোলের ঝি বউ দুধের ছেলে মেয়ে ফেলিয়া পেটের জ্বালায় হাটে বাজারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়ায়। কাশী বাবুর পত্রে আপনারা যে সকল লোমহর্ষণ হৃদয়বিদারক কাণ্ড শ্রুত হইয়াছেন, তৎপরও ঐ প্রকার ঘটনা ঘটিয়াছে। অদ্য ৫দিন হইল গোয়ালন্দ নিবাসী লক্ষ্মী কুমার দে দাস নামক অনেক বড় পরিবারের কর্ত্তা, ১ দিনের মধ্যে আহারের সংস্থান করিতে না পারিয়া, গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।"

Ex. No. 9. From the letter, dated Radhaganj, 3rd Baisack, 1301 B. S. of Babu Behari Lal Chakervati, delegate F.S. Sava.

"শুনিলাম অদ্য ১০ দিন হইল বাইনারী গ্রামের ঈশ্বর চন্দ্র দাইড় নামক একটী লোক না খাইতে না খাইতে

মরিয়া গিয়াছে। তাহার পরিবারের মধ্যে ১২।১৩ বৎসরের বালকই অধিক বয়স্ক পুরুষ।”

একাগ্র বাধা, —শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, সম্পাদক।

আষাঢ় মাসের শেষাংশে বাবু বিহারী-লাল চক্রবর্ত্তী লিখিলেন যে, “অবস্থা কতক ভাল হইয়াছে, এখন কাজ বন্ধ করা যাইতে পারে।” সুহৃদসভা মনে করিলেন যে, স্থানীয় অবস্থা আর একবার পরিদর্শন করিয়া কাজ বন্ধ করা উচিত। ইহার পূর্ব্বে মাদরা হইতে বাবু শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, বি, এ, মহাশয় মাদ্রার দুর্ভিক্ষের কথা উল্লেখ করিয়া কয়েকখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। সে স্থান ও কোটালিপাড় পরিদর্শন করিবার জন্য সুহৃদ্‌ সভার সম্পাদক বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয় ২১শে আষাঢ় মফঃস্বল যাত্রা করেন। নানাস্থান পরিদর্শন করিয়া শেষে মাদ্‌রা পরি-দর্শন করেন। মাদ্‌রা অন্নক্লিষ্ট লোকদিগকে কিছু কিছু প্রদান করিয়াছিলেন। শশি বাবু তখন বাড়ীতে না থাকায় কোন বিশেষ বন্দো-বস্ত না করিতে পারিয়া, তিনি মাদারিপুর আসিয়া, লোকালবোর্ডের চেয়ারম্যানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মাদ্‌রার অবস্থা জ্ঞাত করেন। তৎপর আফাসী পরিদর্শন করেন ও কিছু কিছু সাহায্য প্রদান করেন। তৎপর কোটালি-পাড় উপস্থিত হন। কোটালিপাড়ের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার ধারণা হয় যে, কিছুতেই আপাততঃ সাহায্য বন্ধ করা উচিত নয়। লোকের যে কি দুঃখে দিন যাইতেছে, দেখিলে পাষাণও ফাটিয়া যায়। এইরূপ অবস্থা, অথচ বিহারী বাবুরও অধিক দিন থাকার যো নাই, কেন না, তাঁহার কলেজ খুলিয়াছে, অবশেষে লোকের বন্দোবস্ত করিতে, ফরিদপুর হইয়া, তিনি কলিকাতা প্রত্যাগত হন। গোপালগঞ্জ, উলপুর, উজানি, মুকসুদপুর প্রভৃতি স্থান ও তৎ পথের সমুদয় স্থান পরি-দর্শন করিয়াছেন। সেই সময়ে পাকা আউস ধান্য ডুবিয়া যাইতেছিল। বোরো ধান হওয়ায় গোপালগঞ্জ থানার অন্নকষ্ট অনেকটা থামিয়াছিল। কিন্তু আউস ধান্য ডুবিয়া যাওয়ায় আবার লোকের কষ্ট হই-তেছে। কিন্তু সে কষ্ট এখনও মারাত্মক নহে। ফরিদপুর যে দিন উপস্থিত হন, সে দিন ছোট লাট তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত করার জন্য শ্রীযুক্ত রেঃ মথুরানাথ বসু, বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার, বাবু কালীপ্রসন্ন সরকার ও বাবু দীননাথ দাস মহাশয়দিগকে তিনি বিশেষরূপ অনু-রোধ করিয়াছিলেন। লাট সাহেবকে যে অভিনন্দন দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে দুর্ভি-ক্ষের বিষয় উল্লেখ ছিল। তৎপর তিনি কলিকাতা আসিয়া কোটালিপাড় ও মাদ্‌রা লোক পাঠাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। লোক না পাওয়ায় বড়ই দুঃখিত হইয়া শেষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয়কে পত্র লেখেন এবং সঞ্জীবনীতে দুর্ভিক্ষের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে ৫ খান পত্র প্রকাশ করেন। ইত্যবসরে বিহারী বাবু কলিকাতা আগমন করেন। তৎপর কোটালিপাড় হইতে পত্র পাইয়া অবগত হওয়া গিয়াছে, একটী লোক ১৫৲ টাকায় একটী ছেলে বিক্রয় করিয়াছে, এবং একটী স্ত্রীলোক অনাহারে মরিয়াছে, তাহার মৃতদেহ শৃগালে খাইয়াছে, এবং আর একটী লোক অনাহারে মারা গিয়াছে। ইতি-মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের চেষ্টায় ৩জন সহৃদয় লোক পাওয়া গিয়াছে। বাবু হরিমোহন ঘোষাল, ব্রাহ্মসমাজের সাহায্য লইয়া মাদ্‌রা গিয়াছেন; এবং সুহৃদ্‌সভার সভ্য কুঞ্জলাল ঘোষ আর একটী ভাইকে লইয়া ঔষধ, বস্ত্র ও টাকা সহ ২৯শে শ্রাবণ উত্তরপাড় গিয়াছেন।

তাঁহারা যাইয়া চাউল, বস্ত্র ও ঔষধ বিতরণ আরম্ভ করিয়াছেন, দিন দিন ভিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। কোটালিপাড়ে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত প্রায় ২০০০ লোককে সাহায্য দিতে হইবে। তাঁহারা যতদিন থাকিবেন, সাহায্য প্রদান করা হইবে। তাঁহারা সহৃদয় ব্যক্তি, তাঁহাদের দ্বারা অনেক উপকার হইবে, আশা করা যায়। এস্থলে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজকে বিশেষরূপ ধন্যবাদ দেওয়া যাইতেছে।

দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে সুহৃদ্‌সভার কৃত কার্য্য।

সুহৃদ্ সভার প্রতিনিধি বাবু বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী তাঁহার কার্য্যের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা এই স্থানে সংলগ্ন করিলাম—

"আমি বিগত ২১ শে চৈত্র, মঙ্গলবার, ফরিদপুরস্থ সুহৃদ্‌সভার প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া কোটালিপাড দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত লোকদিগের অবস্থা পরিদর্শনার্থে কলিকাতা হইতে রওয়ানা হই। রাজবাড়ী, ফরিদপুর এবং মাদারিপুর প্রভৃতি স্থানে ক্রমে কয়েকদিন অতি বাহিত করি। মাদারিপুরে ৩ দিবস থাকিয়া তথাকার হেডমাষ্টার, সুহৃদ্‌সভার সভ্য বাবু কুলচন্দ্র রায় চৌধুরী, এম, এ, মহাশয়ের সাহায্যে কিছু চাঁদা সংগ্রহ করি। স্থানীয় উকীল বাবু ললিত মোহন সেন, বি, এল, মহাশয় আমার প্রতি বিশেষ যত্ন প্রকাশ করেন এবং আমার কার্য্যের সহায়তা করিয়া অনেক সংবাদাদি দেন। গত ২রা বৈশাখ (১৩০১) আমি কোটালিপাড থানার অধীন রাধাগঞ্জ নামকস্থানে উপস্থিত হই। অন্নাভাবে কোটালি-পাড়ের লোকের বহুল কষ্ট হইতেছে শুনিয়া সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কর্তৃপক্ষদিগের প্রাণে নিদারুণ আঘাত লাগে, তাঁহারা সমাজের পক্ষ হইতে অসহায় দরিদ্র-গণের সাহায্যার্থ বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়কে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। কাশী বাবু রাধাগঞ্জ হাটে থাকিয়া প্রতিদিন অসহায় দরিদ্রদিগকে বস্ত্র ও চাউল বিতরণ করিতেছিলেন।

আমি রাধাগঞ্জে যাইয়াই প্রথম কাশী বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমাকে অতি সাদরে গ্রহণ করিয়া, বড়ই আদর করিতে লাগিলেন। যদিও তাঁহার সহিত আমার কখনও আলাপ ছিল না, কিন্তু বহুদিন পরে সহোদর ভ্রাতার মিলনে যেরূপ সুখানুভব হয়, কাশীবাবু আমাকে পাইয়া সেইরূপ করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার ভালবাসা ও সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া যেন আত্মহারা হইলাম। কাশীবাবুর নিকট স্থানীয় অবস্থা অনেক অবগত হইয়া, পরদিন নিকটবর্ত্তী ৪। ৫ খানি গ্রাম পরিদর্শন করিয়া পুনরায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। কাশীবাবুর অনুরোধ মতে আমি সেই দিন কয়েকখানি নূতন বস্ত্র ক্রয় করিয়া বিতরণ করিলাম, পরে নিজে দেশের অবস্থা পরিদর্শন করিতে বাহির হইলাম। আমি যখন যেস্থানে উপস্থিত হইয়াছি, তখনই তথাকার সম্ভ্রান্ত, ধনী, দরিদ্র, সকল শ্রেণীর লোক কর্তৃক সাদরে গৃহীত হইয়াছি। আমাদের সুহৃদ্‌সভার অনেক সভ্য ও স্থানীয় অনেক ভদ্র লোকে আমার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এস্থলে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করা অসম্ভব। ফলে আমি তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়াছি। ১০। ১২ দিন এপ যাপ্ত পরিশ্রম করিয়া আমি প্রায় ৪০। ৪৫ খানি গ্রাম পরিদর্শন করি। তখন দেশের সাধারণ অবস্থা অতীব শোচনীয়। তখন যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা আমি জীবনে কখনও দেখি নাই—দেখিব কিনা, ভগবানই জানেন। আমি সংবাদ পত্রে তখনকার অবস্থা কিঞ্চিৎ বিবৃত করিয়াছিলাম। ফলকথা, যাহা দেখিয়াছিলাম ও যাহা অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা ভাষা দ্বারা ব্যক্ত করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে, এক মুষ্টি ভাতের জন্য বালক বালিকাগণের সকরুণ ক্রন্দন ধ্বনি ও কঙ্কালাবশিষ্ট দেহ বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া এবং যুবতী গণের কাতর উক্তি শুনিলে পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যায়।

গ্রাম পরিদর্শন কালে আমি স্থানে স্থানে চাউল, কাপড় ও পয়সা আদি দান করিয়াছি, সেই সময় আমি শুনিয়াছি যে, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ অন্ন বস্ত্রাদির ক্লেশ ভোগ করিয়া, অসহনীয় যাতনার হাত হইতে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে ও কেহ কেহ ক্রমাগত অনাহারের পর বন্য শাক সবজি দ্বারা উদরাগ্নির নিবৃত্তি করিতে যাইয়া কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া ইহলোক ছাড়িয়া দুঃখ কষ্টের অবসান করিয়াছে।

১। শশিমোহন দাস পিঞ্জরী

২। ঈশ্বরচন্দ্র সাইড় বাইনারি
৩। ফটিক দাই উত্তরপাড়া
৪। নিধিরাম ঢুলি তারাকান্দর
৫। দিনবাগানির স্ত্রী মাদারবাড়ী
৬। একটী স্ত্রীলোক লাখিরপাড়
৭। স্বরূপ দত্ত বাঁধাবাড়ী
৮। লক্ষণ মণ্ডল মাদারবাড়ী
৯। রূপচাঁদ বালা আঠাসিবাড়ী

আমি ১২ই বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া ৮ই শ্রাবণ পর্য্যন্ত, কোটালিপাড়ের অন্তর্গত উত্তরপাড় হাট খোলায় নিয়ত থাকিয়া, ৩ শত হইতে ৮ শত পরিবারকে প্রথমতঃ প্রতিদিন, পরে সপ্তাহে ২ দিন করিয়া চাউল বিতরণ করিযাছি। স্ত্রীপুরুষ বালক বালিকাতে কখন কখন ১৫০০। ২০০০ লোক চাউল লইত। সর্ব্ব সমেত প্রায় ৬০। ৬৫ খানি গ্রামের লোকে সুহৃদ্ সভার সাহায্য পাইত। অধিকাংশই স্ত্রীলোক। অন্নক্লিষ্ট ভদ্র লোকেরা গোপনে সাহায্য লইতেন।

এতদ্ভিন্ন যখন কোটালিপাড়ে ভয়ানক ওলাউঠার প্রকোপ আরম্ভ হয়, তখন বহুলোককে ঔষধাদি দিয়াছি। বলিতে কি, এই ঔষধে অনেক লোকের উপকার হইয়াছে। স্থানীয় অবস্থা সংবাদপত্রে ও ডিঃ বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট বিশেষ করিয়া লিখিয়াছি; তৎপর সবডিভিসনাল অফিসারের অনুরোধ মতে, আমি ক্রমে ৮।১০ দিন ভয়ানক পরিশ্রম করিয়া, ২৮ খানি গ্রামের মধ্যে প্রায় ৬ শত লোকের নাম ধাম ও জমির পরিমাণাদি সংগ্রহ করি, কারণ ঐ বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া গভর্ণমেণ্ট হইতে প্রজাদিগকে ঋণ দেওয়া হয়। আমার লিখিত লিষ্ট হইতে কতক লোক টাকা পায় এবং প্রায় ৮।৯ খানি গ্রামের লোকেরা, টাকা কম পড়ায়, কিছুই পায় না, এজন্য খুব দুঃখিত হয়। কোটালিপাড়ের রেভারেণ্ড মথুরানাথ বসু এবং মিঃ জেমস্ সাহেবের সঙ্গে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে আমার অনেক কথা হয়। এই কাজ ভিন্ন আমি উনশিয়া আর্য্যবিদ্যালয়, পিওলপাড়া বালিকা বিদ্যালয়, কাজুলিয়া স্কুল, বান্ধাবাড়ী বালিকা বিদ্যালয়, পিঞ্জরী পাঠশালা ও বালিকা বিদ্যালয় এবং উনসিয়া বালিকাবিদ্যালয় পরিদর্শন করি।

উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ হইতে নাপিত, ধোপা, মুচি, সাহা, নমশূদ্র, জিয়ানি, খ্রীষ্টান, মুসলমান, কারিকর, দাই, বাদ্যকর, বেহারা ও বাজারের বেশ্যা পর্য্যন্ত নিয়ত এইরূপ সাহায্য পাইয়াছে। ফলতঃ ১৬টী ভিন্ন সম্প্রদায়ে সাহায্য পাইয়াছে, বহুসংখ্যক স্ত্রীলোককে বস্ত্রাদিও দেওয়া হইয়াছে। নূতন বস্ত্র ১৮৪খানা ও পুরাতন বস্ত্র ১৮খানা দিয়াছি।

ব্যক্তিগতভাবে আমার নিজের ২।১ টী কথা এস্থানে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। এবার সুহৃদ্ সভা দ্বারা একটী মহদনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে, সন্দেহ নাই। সুহৃদ্ সভার কার্য্যভার সৌভাগ্যক্রমে আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল, আমি যথাসাধ্য স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ফলকথা, বলিতে কি, আমি সুহৃদসভার কৃপায় ধন্য হইয়াছি, আমার জীবনে আর এরূপ কাজ হয় নাই. হইবারও সম্ভাবনা নাই। নিজের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র শক্তি কেবল সুহৃদ্ সভার অনুগ্রহে, স্বদেশের উপকারার্থে ব্যয়িত করিতে পারিয়া স্বীয় জীবন সার্থক করিয়াছি। বলিতে কি, সুহৃদসভার সুযোগ্য সম্পাদক, আমার ঐকান্তিক শ্রদ্ধা-ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ই আমার জীবনের এই সদনুষ্ঠানের পথ-প্রদর্শক এবং শিক্ষা-গুরু। আমি তাঁহার নিকট চির ঋণে বদ্ধ রহিয়াছি এবং স্বীয় অকিঞ্চিৎকর প্রাণ বিনিময়েও যদি সুহৃদ্ সভার কার্য্য করি, তবুও ইহজন্মে সুহৃদ্ সভার ঋণ-মুক্ত হইতে পারিব না, ইহা নিশ্চয়।

কোটালিপাড়ের লোকের কথাও ভুলিতে পারিব না, তথাকার ছোট বড় ধনিদরিদ্র সকল শ্রেণীর লোকে আমার প্রতি যেরূপ ভালবাসা দেখাইয়াছে, তাহা অতুলনীয়। শ্রীবিহারীলাল চক্রবর্ত্তী,

সুহৃদসভার প্রতিনিধি।"

দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে বিহারী বাবু যাহা করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। এজন্য সভা হইতে তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন দেওয়া হইবে। পুষ্পমাল্য দ্বারা ভূষিত করিয়া তাঁহাকে বিশেষ রূপে অভ্যর্থনা করা হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় যাবতীয় কথা লিখিতে গেলে একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে। সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর নয়। তবে

একথা না বলিলে নয় যে, নানা স্থানের নানা ব্যক্তি দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তিদিগকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তন্মধ্যে চৌদ্দরশির বাবু রাজেন্দ্রচন্দ্র রায় ও মানিকদহের বাবু বিপিনবিহারী রায়ের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। রাজেন্দ্র বাবু ভাদ্র মাসে (১৩০০) ১৫ দিন অকাতরে ক্ষুধিতদিগকে অন্ন দান করিয়াছিলেন। সুহৃদ্ সভা হইতে এ জন্য তাঁহাকে বিশেষ অন্যবাদ দেওয়া হইয়াছে। তিনি এই কাজে যে মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। আর পরিচয়ের উপযুক্ত সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বেল সাহেব। তিনি দেবতার রূপ ধারণ করিয়া ফরিদপুরে, দারুণ দুঃখের দিনে, উপস্থিত হইয়াছিলেন। মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গ্রাউজ সাহেব ও তাঁহার চেষ্টায় গবর্ণমেণ্ট ২৩০০০৲ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, যাহাদের জমী ইত্যাদি আছে ও যাহারা জামিন দিতে পারিয়াছে, তাহারাই ঋণ পাইয়াছে। দুঃখিনী, নিরাশ্রয়া, অসহায়া স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ কিছুই উপকার হয় নাই। তৎপর শ্রীযুক্ত পোপ সাহেবের চেষ্টায় আর ৩০০০৲ দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বেল সাহেব ফরিদপুর যাহা পাইয়াছিলেন, সমস্ত দান করিয়া গিয়াছেন, কাদা ভাঙ্গিয়া, নিজে বাড়ী বাড়ী যাইয়া, অবস্থা দেখিয়া দান করিয়াছেন। এরূপ লোক প্রায় দেখা যায় না। ফরিদপুরের দুর্ভাগ্য যে, এরূপ সহৃদয় ব্যক্তি দীর্ঘকাল ফরিদপুর থাকেন নাই। বিধাতা তাঁহার মঙ্গল করুন। তারপর আমাদের বোর্ড। আমাদের বোর্ড দুর্ভিক্ষের জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। এমন সহৃদয়তার ছবি, শীঘ্র দেখা যায় নাই। বোর্ডের সভ্যগণ বিশেষ ভাবে কাজ না করিলে কত লোক যে মরিত, তাহার সংখ্যা নাই। তারপর দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল, মাদারিপুরের শ্রীযুক্তরেঃ জেমস্ সাহেব ও তাঁহার দলের লোক এবং গোপালগঞ্জের শ্রীযুক্তরেঃ মথুরানাথ বসু মহোদয়গণ যে কত কাজ করিয়াছেন, তাহার পরিমাণ হয় না। উক্ত জেমস্ সাহেব এখনও ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাজ করিতেছেন। তিনি দেবতার ন্যায় ব্যক্তি। গুয়াগ্রামের বাবু শশধর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও বরিশাল হইতে টাকা ও বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া অনেক লোকের উপকার করিয়াছেন। এই সকল মহোদয়গণকে বিশেষরূপ ধন্যবাদ দিতেছি। এবং সর্ব্বোপরি যে সকল সভা, এবং দেশের সহৃদয় ব্যক্তি অর্থ সংগ্রহ করিয়া সভার সাহায্য করিয়াছেন, এবং যাঁহারা অকাতরে অর্থ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ঋণ অপরিশোধ্য, কেবল ধন্যবাদে তাঁহাদের ঋণ শোধ হয় না। লক্ষ্ণৌ বাবু যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং ফরিদপুর বাবু শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য, বিদেশী লোক হইয়াও, যেরূপ ক্লেশ সহ্য করিয়া, টাকা ও বস্ত্র আদায় করিয়াছেন, ভাবিলে চক্ষের জল পড়ে। এইরূপ কষ্ট সকলে অন্ততঃ কিছু না কিছু করিয়াছেন। বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি এই সকল মহাজনদিগকে চিরশান্তি ও মঙ্গল বিধান করুন। আমরা অসহায়, নিরূপায়, আমাদিগের সম্বল কেবল বিধাতার কৃপা। যাঁহারা অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন ও করিতেছেন, নব্যভারতে তাঁহাদের নাম প্রকাশিত হইতেছে।

এদেশের সম্পাদক মহোদয়গণ, একবাক্যে, সম্বৎসর ধরিয়া, ফরিদপুরের দুর্ভিক্ষের কথা ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন। সকলকে এস্থলে ধন্যবাদ দিতেছি। বিশেষতঃ সঞ্জীবনী ও

অমৃতবাজার পত্রিকা, দরিদ্র ফরিদপুরের জন্য বহুস্থান দিয়াছেন। তাঁহাদিগকে দেশের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

সঞ্জীবনীতে আমার যে ৫ খান পত্র প্রকশিত হইয়াছে, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

দুর্ভিক্ষের বর্ত্তমান অবস্থা।

প্রথম পত্র—সঞ্জীবনী,—১৩ই শ্রাবণ, ১৩০১ সাল।

ফরিদপুরের ভীষণ দুর্ভিক্ষের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিবার জন্য, ২রা জুলাই (১৮৯৪) সোমবার কলিকাতা পরিত্যাগ করি। সদরপুর, মানিকদহ প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিয়া মাদারিপুর উপস্থিত হই। মাদারিপুর সবডিভিসনই দুর্ভিক্ষের প্রধান দুর্গ, ওলাউঠায় এবং দুর্ভিক্ষে এই সবডিভিসনের কত গৃহে যে হাহাকার উঠিয়াছে, সংখ্যা নাই। পালং থানায় ওলাউঠায় প্রায় ৬০০০ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। বিগত কার্ত্তিক মাসে এই থানার বহুগ্রাম পরিদর্শন করিয়া ঔষধ বিতরণ করিয়াছিলাম। এখন পালং থানায় ওলাউঠা থামিয়াছে, কিন্তু গোপালগঞ্জ, মাদারিপুর ও কোটালিপাড় থানায় দুর্ভিক্ষের ভীষণ পরাক্রম সম্বৎসর ধরিয়া চলিয়াছে। ভূতপুর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বেল সাহেব, গ্রাউজ সাহেব মহোদয়গণের চেষ্টায় এবং ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সভ্যগণের সহৃদয়তায় অনেক দরিদ্র ব্যক্তি এবার রক্ষা পাইয়াছে। তদুপরি, খ্রীষ্টান মিসনরিগণের চেষ্টায়, ব্রাহ্মসমাজের চেষ্টায় এবং ফরিদপুর সুহৃদ্ সভার চেষ্টায় অনেক লোক রক্ষা পাইয়াছে; কিন্তু তবুও অনাহারে অনেক লোক মরিয়াছে। মাদারিপুরের সবডিভিসনাল অফিসার মহোদয় দুর্ভিক্ষের প্রকোপ কিছুই দেখেন না—তিনি গবর্ণমেণ্টের প্রশংসা পাওয়ার জন্য সব চাপা দিতে প্রস্তুত। যাঁহারা সংবাদ পত্রে মধ্যে মধ্যে পত্রাদি লিখেন, তিনি তাঁহাদিগকে ধমকাইতেও ছাড়েন না। তাঁহার তিরস্কারে আমাকেও একবার পড়িতে হইয়াছিল। তাঁহার ভয়ে সকলে যেন সঙ্কুচিত। এদিকে মাদারিপুরের চতুর্দ্দিকে হাহাকার ধ্বনি; কত লোক যে দুই তিন দিন ধরিয়া উপবাস করিতেছে, সংখ্যা নাই!!

আমি কলিকাতা থাকিতেই, মাদারিপুরের খুব নিকটবর্ত্তী মাদরা নামক গ্রামের দুর্ভিক্ষের কথা শুনিয়াছিলাম। আমি মাদারিপুর পৌঁছছিয়াই একখানি ডিঙ্গি ভাড়া লইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে মাদরা যাত্রা করিলাম। মাদরা পৌঁছছিতে রাত্রি হইল। মধ্যে ঝাউদি প্রভৃতি গ্রামের অবস্থা অবগত হইলাম। শুনিলাম, বহু লোক, কাঁচা কলা, কচু, পাটপাতা সিদ্ধ করিয়া খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। এ অঞ্চলে আউস ধান্য প্রায়ই হয় না—আমন ধান্যের অবস্থা মন্দ নয়, কিন্তু তাহা পৌষ মাসে পাকিবে। এই সময় পর্য্যন্ত কত লোক যে অনাহারে মরিবে, বিধাতাই জানেন।

রাত্রে মাদরা যাইয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দিগের বাড়ীতে অবস্থিতি করিলাম। যে বন্ধু কলিকাতায় আমার নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন, তিনি তখন বরিশাল চলিয়া গিয়াছেন। আমি একটু অসুবিধায় পড়িলাম। কিন্তু কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তির নিকট কতকটা অবস্থা জ্ঞাত হইলাম। পর দিন রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র দেখিলাম, সংবাদ পাইয়া, বহু অনাহারক্লিষ্ট লোক আমাকে আসিয়া বেষ্টন করিয়া ফেলিল। তাহাদের কাতরোক্তি শুনিয়া, জীর্ণ শীর্ণ মলিন কঙ্কালবিশিষ্ট শরীর ও পরিধানের বস্ত্র দেখিয়া প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। আমি সকলকে আশ্বাস দিলাম এবং কেবল আশ্বাসে জীবন রক্ষা হয় না মনে করিয়া উপস্থিত সকলকেই

কিছু কিছু দিলাম। তৎপর গ্রামের অবস্থা দেখিতে চলিলাম। গ্রাম জলে ডুবিয়া গিয়াছে, সুতরাং নৌকায় উঠিয়া বাড়ী বাড়ী যাইতে হইল। যে দৃশ্য দেখিলাম, লিখিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ৮টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত বাড়ী বাড়ী ঘুরিলাম, ইহার মধ্যে কোন বাড়ীতেই রান্নাঘরে আগুন দেখিলাম না। আহার-বিষয়ে সব লোকই নিশ্চিন্ত। কোন কোন বাড়ীতে দেখিলাম, রাশিকৃত কলার খোলা পড়িয়া আছে, কোথাও কাঁচা কলার বাকল, কোথাও কচুর বাকল। অনেককে জিজ্ঞাসা করিলাম, কাল কি খাইয়াছ, কেহ বলিল কচু, কেহ বলিল থোর, কেহ বলিল কাঁচা-কলা সিদ্ধ করিয়া খাইয়াছি, দুই তিন জন বলিল যে একবেলা ভাত খাইয়াছি। অবস্থা শুনিয়া চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারিলাম না—ডাকিয়া ডাকিয়া সকলকেই কিছু কিছু দিলাম। দেখিলাম, অনেক বাড়ীতে কেবল স্ত্রীলোক ও ছোট ছেলে মেয়ে আছে; জিজ্ঞাসা করিলাম, বাড়ীর পুরুষেরা কোথায়? অনেক স্থলেই উত্তর পাইলাম, ছেলে মেয়ে পরিবারকে উপবাস করিতে দেখিয়া, সহ্য করিতে না পারিয়া, ফেলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, খবর নাই। কি শোচনীয় ব্যাপার! মানুষ ছেলে মেয়ের মমতা ছাড়িয়া পলায়ন করিতে পারে, এ অবস্থা প্রায়ই দেখা যায় না—কিন্তু যখন প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়ে, তখন মানুষের আর কোন হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, মানুষ পশুর অপেক্ষাও হেয় হয়। ছেলে মেয়েরা পেট ভরিয়া না খাইতে পাইয়া শুকাইয়া গিয়াছে—স্ত্রীলোকদিগের উদরে অন্ন নাই—পরিধানে লজ্জা নিবারণের বস্ত্র নাই, কেহ কাঁথা, কেহ ছিন্নবস্ত্র পরিয়াছে—শুষ্ক শরীরে, মলিন মুখের ডগণ্ড বহিয়া কেবল চক্ষের জল পড়িতেছে। এই অবস্থা দেখিতে দেখিতে ও কিছু কিছু দিতে দিতে শুনিলাম, এক স্থানের স্বামী-পরিত্যক্তা একটী স্ত্রীলোক ৩।৪টী শিশু লইয়া ৩ দিন কলার পাতা খাইয়া আছে। সেই স্থানে গেলাম। লজ্জায় সে স্ত্রীলোকটী আমাদের নৌকার নিকটে আসিল না। অনেক স্ত্রীলোককে যখন পয়সা দিতেছিলাম, তখন তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ, সুদ সহ পয়সা আবার ফেরৎ দিতে হইবে, এই আশঙ্কায় নিতে চাহিতেছিল না। বারম্বার বলিলেও বিশ্বাস করে না—কিছুতেই ইহার বিনিময়ে যে কিছুই দিতে হইবে না, একথা বুঝান যায় না। ইহার কারণ এই, নিঃস্বার্থ ভাবে কেহ কিছু দিতে পারে, এ ধারণা এদেশের লোকের নাই। যাহারা ধান দেয়, দেড়গুণ, চতুর্গুণ আদায় করে; যাহারা টাকা ঋণ দেয়, টাকায় ৵০, ৶০, ।০ আনা সুদ আদায় করে। এই দারুণ দুর্ভিক্ষে বহুলোক এইরূপ ব্যবসা করিয়া বড় ধনী হইয়া উঠিতেছে। অনেক স্থলে শুনিলাম, ৪০।৪৫ তোলা রূপা বন্ধক রাখিয়া ৮। ১০৲ টাকা মহাজনেরা দিতেছে; থালা বাসন আর বড় কেহ রাখে না। গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে কোন কোন স্থলে যে টাকা দেওয়া হইয়াছে, সুদসহ তাহাও আদায় করিতে হইবে। জমীদারেরা কোথাও কোথাও যে সাহায্য দিতেছেন, তাহাও প্রতিদান করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট কোটালিপাড়ে ১৲ টাকার ধান দিয়া, বাজার দরে যে এক টাকার চাউল গ্রহণ করিতেছেন, তাহাতে কাহারও ৴১॥ সেরের অধিক চাউল প্রাপ্য হয় না। এই অবস্থায়, কেহ নিঃস্বার্থ ভাবে পয়সা দিতেছে কেন, ইহাতে তাহাদের সন্দেহ হইবারই কথা। সেই স্ত্রীলোকটী আসিতে সঙ্কুচিতা হইল দেখিয়া, বাড়ীর আর আর

সকলের নিকট অবস্থা শুনিয়া ১৲টী টাকা দিলাম। সলজ্জ ভাবে হাত পাতিয়া তাহা লইল। বাড়ীর অন্যান্য সকলকেও কিছু কিছু দিলাম। এইরূপ দিতে দিতে প্রায় ২টার সময় বাড়ীর দিকে ফিরিতে লাগিলাম। পথের মধ্যে আবার নৌকায় উঠিয়া দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। দূরবর্ত্তী গ্রামের লোকও আসিতে লাগিল। সকলেরই নিবেদন এই "বাবু, আমাদের অবস্থা একবার দেখিয়া যান।" বেলা অধিক হইতে লাগিল বলিয়া, সকলের অনুরোধ রক্ষা করিতে না পারিয়া, চাটুয্যে বাড়ীতে ফিরিয়া দেখিলাম— সেখানে ৬০। ৭০ জন লোক বসিয়া রহিয়াছে। আমার নিকট যে টাকা ছিল, সব ফুরাইয়া গিয়াছিল। আর উপায় না দেখিয়া, হাওলাত করিয়া কয়েকটী টাকা লইলাম এবং তাহা সকলকে দিলাম। এদিন আর আহার করিতে ইচ্ছা হইল না—অতি কষ্টে চাটুয্যে মহাশয়দিগের অনুরোধে কিছু আহার করিলাম, আহারান্তে লোকদিগকে কিছু ২ দিয়া বিদায় করিয়া, নৌকায় উঠিয়া, মাদারিপুরে গেলাম। তথাকার লোকাল-বোর্ডের চেয়ারম্যান মহাশয়ের নিকট সবিশেষ বলিলাম। তিনি সবডিভিসনাল অফিসার বাহাদুরের কীর্ত্তির কথা বলিয়া আক্ষেপ করিলেন। হা বিধাত, দরিদ্রদিগের যে জগতে কেহ নাই, তুমি একবার সদয় হও।

রাত্রেই আফাসী যাত্রা করিব, মনস্থ করিয়াছিলাম, কিন্তু মাদরার যে বন্ধু বরিশাল গিয়াছিলেন, তাঁহাকে আনার জন্য টেলিগ্রাম করা হইয়াছিল, সেই টেলিগ্রামের প্রতীক্ষায় ৯টা রাত্রি পর্য্যন্ত মাদারিপুর থাকিতে হইল। তার পর মাদারিপুরের বন্ধুগণ, চোর ডাকাতের বড় ভয় হইয়াছে বলিয়া, নৌকা খুলিতে দিলেন না। সমস্ত রাত্রি আর চক্ষে ঘুম আসিল না। আহারেও মন উঠিল না। পরদিন প্রত্যূষে আফাসী রওনা হইলাম। আফাসীর অন্য নাম চর-কুনিয়া। আফাসী মাদারিপুরের পশ্চিমে অবস্থিত। আফাসী একখানি দরিদ্র পল্লী। আফাসীর অবস্থা যাহা দেখিলাম, সংক্ষেপে লিখিতেছি। এইরূপ অবস্থা মাদারিপুরের চতুর্দ্দিকস্থ বহু গ্রামের।

আমি যে ডিঙ্গিতে ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম, এই ডিঙ্গির মাঝীর বাড়ী এই আফাসী গ্রামে। মাঝী না বলিয়া, গ্রামের অবস্থা দেখাইতে, নৌকা এই পথে আনিয়াছে। মাঝীর বাড়ীর ঘাটে যখন নৌকা পৌছিল, তখন চিৎকার করিয়া বাড়ীর লোকেরা কাঁদিয়া উঠিল। আমি মনে করিলাম, কেহ বুঝি মারা গিয়াছে। পরে শুনিলাম, তাহা নয়, মাঝী যে দুই দিন বাড়ী আইসে নাই, সেই দুই দিন উপবাস গিয়াছে। মাদরার চাটুয্যে বাড়ী হইতে মাঝী যে অন্ন পাইয়াছিল, তাহা না খাইয়া, কতক রাখিয়াছিল, আজ তৃতীয় দিনে সেই পর্য্যুষিত অন্ন ও পচা ডাইল বাড়ীর সকলকে আহারের জন্য তুলিয়া দিতেছে দেখিয়া, আমি ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিলাম না। আমি মানিকদহের বন্ধুর বাড়ী হইতে কয়েকখানি যে লুচি পাইয়াছিলাম, তাহা লোকের কষ্ট দেখিয়া আহারে প্রবৃত্তি না হওয়ায়, মাঝীকে পূর্ব্বদিন খাইতে দিয়াছিলাম। সেই কথা মাঝীর বৃদ্ধ পিতা শুনিয়া "আমার জন্য আনিলি না কেন" বলিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে যে কি মর্ম্মভেদী দৃশ্য, বর্ণনা করিতে পারি, আমার সে সাধ্য নাই। আমি কিছু দিলাম। তার পর দলে দলে বিধবা স্ত্রীলোকেরা কঙ্কাল-বিশিষ্ট ছেলে মেয়ে লইয়া আমার নিকট উপস্থিত

হইতে লাগিল। হায়, যে মুসলমান কুলবধূরা কখনও কোন বিদেশী লোকের নিকট যায় না, পেটের দায়ে দলে দলে তাহারা আসিতে লাগিল! আমি সকলকেই কিছু কিছু দিলাম। ক্রমেই জনতা বাড়িতে লাগিল—ক্রমেই অভাবের ক্রন্দন-উচ্ছ্বাস উঠিতে লাগিল। আমি অস্থির হইলাম। সকলকে কিছু কিছু দিলাম বটে, কিন্তু মন শান্তি পাইল না। না জানি, তাহাদের অবস্থা এখন আরো কত শোচনীয় হইয়াছে! সমস্ত দিন আমি আর কিছু আহার করিলাম না। আমি ১৫ দিন গ্রামে গ্রামে বেড়াইয়াছি, ইহার মধ্যে ৬ দিন কিছুই আহার করি নাই। নিজে চেষ্টা করিয়া কিছুই খাইতে ইচ্ছা হইত না। এই ১৫ দিনের মধ্যে ৩। ৪ রাত্রি বই ঘুমাইতে পারি নাই। যাহার দেশের লোকের এত দুরবস্থা, তাহার জীবন ধারণে প্রয়োজন কি, সর্ব্বক্ষণ কেবল এই চিন্তা মনে জাগিত। মনের কথা নীরবে বিশ্বপতির নিকটে বলিতাম। তিনি ভিন্ন কাঙ্গালের আর আশ্রয় কোথায়?

দ্বিতীয় পত্র, সঞ্জীবনী, ২০শে শ্রাবণ, ১৩০১।

আফাসী বিষণ্ণ মনে পরিত্যাগ করিয়া সেই দিন অপরাহ্ণে রাধাগঞ্জে পৌঁছিলাম। রাধাগঞ্জ কোটালিপাড় থানার অধীন একটি হাট। এই স্থানে ব্রাহ্মসমাজ হইতে বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় কিছুদিন থাকিয়া চাউল ও বস্ত্র বিতরণ করিয়া অনেক লোকের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন।

কোটালিপাড়, দুর্ভিক্ষের প্রধান দুর্গ। বোরোধান প্রচুর পরিমাণে হওয়ায়, গোপালগঞ্জ থানার অধিকাংশ স্থানের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, হাহাকার একটু থামিয়াছে,—এখন প্রধান দুর্গ কোটালিপাড়। কাশী বাবু কিছুদিন রাধাগঞ্জে থাকার পর, অসুস্থ হইয়া, কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হন। তাঁহার লেখাতেই আমরা ফরিদপুর সুহৃদ্‌সভা হইতে বাবু বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে কোটালিপাড় প্রেরণ করি। তিনি সাড়ে তিন মাস যাবৎ কোটালিপাড়ের অধীন উত্তরপাড় হাটে চাউল ও বস্ত্র দিতেছিলেন। উত্তরপাড় রাধাগঞ্জ হইতে চারিদণ্ড ব্যবধান। রাধাগঞ্জের অবস্থা সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া, আমি সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে, উত্তরপাড় হাটে পৌঁছিলাম, আমার জন্য বিহারী বাবু পথপানে তাকাইয়াছিলেন। আমাকে পাইয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। তাঁহার বিমল আনন্দ দেখিয়া আমি সমস্ত দিনের কষ্ট ভুলিলাম। বিহারী বাবু একজন জীবন্ত ব্যক্তি।

বিহারী বাবু আমার একজন বন্ধু, ফরিদপুর সুহৃদ্ সভার একজন সভ্য, তাঁহার কথা অধিক লিখিতে আমি সঙ্কুচিত হই। কিন্তু তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা, এই কথাসর্ব্বস্ব যুগে, প্রায় দেখি না। তিনি দরিদ্রের মা বাপ। নিজ সুখ পরিহার করিয়া, অশেষ ক্লেশ মস্তকে লইয়া, অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি কাজ করিয়াছেন। তাঁহার প্রশংসা কোটালিপাড়ের লোকের মুখে আর ধরে না। আমি বিহারী বাবুর বন্ধু, ইহা মনে করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছি। রাত্রে বিহারী বাবুর নিকট সমস্ত অবস্থা অবগত হইলাম। অনেক কথা হইল। শেষে বিশ্রাম করিলাম।

পরদিন প্রত্যূষে গ্রামের অবস্থা দেখিতে রওয়ানা হইলাম। সকল গ্রাম ডুবিয়া গিয়াছে, বলা বাহুল্য, নৌকায় উঠিয়াই যাইতে হইল। বিহারী বাবু ৫৬টী গ্রাম পরিদর্শন করিয়া দরিদ্রদের নাম সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই

৫৬টী গ্রাম হইতে পূর্ব্বে অনেক লোক অনাহারে মরিয়াছে। ইহার মধ্যের দুই একটী গ্রামে গেলাম। যাইয়া দেখি, বড ঘরের চালে ছোন নাই, বেড়া নাই, স্ত্রীলোকেরা গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিয়াছে। যাহারা উত্তরপাড় হইতে পূর্ব্বদিন চাউল আনিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কাহার কাহারও খোলা ঘর হইতে সেই চাউল চুরি গিয়াছে বলিয়া কাঁদিতেছে, দেখিলাম। অনেক স্ত্রীলোককে উলঙ্গবৎ দেখিলাম। অবস্থা দেখিয়া প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল, আমি কিছু কিছু দিতে লাগিলাম। বিহারী বাবু আমাকে বলিলেন যে, এরূপ করিয়া দিয়া পারিবেন না। বাস্তবিক কথা সত্য। কত লোকের যে শোচনীয় অবস্থা দেখিলাম, বর্ণনা করিতে অক্ষম। শেষে আর পয়সায় কুলায় না, যাহা ছিল, শেষ হইয়া আসিল। শেষ দৃশ্য যাহা দেখিলাম, তাহা লিখিয়া এবারকার কথা শেষ করি। শুয়াগ্রামের এক বাড়ীতে যাইয়া দেখিলাম, এক বারেন্দায় একটী দেড় বৎসর বয়সের শিশু, তিন বৎসর বয়সের বোনের গলা ধরিয়া কাদায় শুইয়া রহিয়াছে। তাহাদের শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছে। এই নিদ্রা যেন জীবনের শেষ নিদ্রা; পরস্পরের উপর এতই নির্ভর, উভয়ে পরস্পরের গলা ধরিয়া রহিয়াছে। সেরূপ স্বর্গীয় দৃশ্য এজীবনে আর কখনও দেখি নাই। দেখিয়া যেন জীবন ধন্য হইল। সেখানে ভালবাসা আর কবিত্ব, পবিত্রতা আর মধুরতা, পুণ্য এবং প্রেম যেন মেশামেশি হইয়া রহিয়াছে, অথবা মনে হয় যেন দুর্ভিক্ষ সেখানে প্রেমরূপ ধারণ করিয়া মূর্ত্তিমান। দেখিলাম এবং মজিলাম, অলক্ষিত ভাবে চক্ষের জল পড়িল। এই শিশুদের পিতা কোথায়, মাতা কোথায়, খোঁজ পাইলাম না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া শেষে বড় মেয়েটীকে তুলিতে চেষ্টা করা গেল; মেয়েটী দুই একবার চাহিয়া দেখিয়া দেখিয়া আবার চোক বুজিল। মৃত্তিকাশয্যা, অবসন্ন দেহের পক্ষে, বড়ই আরামদায়ক হইয়াছে। ইতাবসরে এই শিশুদের মা জল ঝাঁপাইয়া অন্য বাড়ী হইতে আসিলেন। শিশু দুটী মায়ের আগমন-শব্দে উঠিল। ছোটটী মাই খাইবার জন্য, বড়টী, মা কাপড়ে করিয়া যাহা আনিয়াছে, তাহা খাইবার জন্য ব্যস্ত হইল। পাখী-মাতা যেন নীড়ে শাবক রাখিয়া গিয়াছিল, মা আহার আনিয়াছে—শাবকেরা জাগিয়াছে। এ কি মধুর দৃশ্য! কিন্তু মায়ের সম্বল কি? মা বস্ত্র ভিজাইয়া, ভিক্ষা করিয়া এক পোয়া পরিমাণ চাউলের কুড়া (তুষের ন্যায় এক পদার্থ) আনয়ন করিয়াছেন! হা বিধি, এ কি দৃশ্য! মায়ের বয়স ১৭।১৮ বৎসরের অধিক হইবে না, কিন্তু বোধ হইল যে, ৬।৭ মাসের ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত রোগী—শরীরে রক্ত মাত্র নাই, মাংস নাই, তেজ নাই, স্ফূর্ত্তি নাই—আছে কেবল চর্ম্মাবৃত কয়েক খানি অস্থি। এই কঙ্কালধারিণী জননীর কোলে অবোধ ক্ষুধিত শিশু অমৃত পানে মাতোয়ারা, কিন্তু অমৃত কোথায়, দুধ কোথায়? হায়, মাতৃ ক্রোড়ে ক্ষুধা-কাতর শিশু দুধ না পাইয়া যখন কাঁদিতে লাগিল, আমি আর আত্ম সম্বরণ করিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, কাল কি খাইয়াছ, উত্তর করিল, কচু সিদ্ধ করিয়া খাইয়াছি। পরশ্ব কি খাইয়াছ; জিজ্ঞাসা করিলাম, উত্তর হইল, ভাতের মাড় ভিক্ষা করিয়া শিশুদের খাওয়াইয়াছি। এই কথা শুনিয়া এবং এই দৃশ্য দেখিয়া আত্মহারা হইলাম। যাহা সঙ্গে ছিল, দিলাম এবং "বুধবাব উত্তরপাড়ে চাউল ও কাপড় দেওয়া

হইবে, সেখানে যাইও” বলিয়া বিষাদ-মাখা প্রাণে উত্তরপাড়ে ফিরিলাম।

সোমবার বৈকালে ফরিদপুরের শেষসীমা দেখিলাম এবং বরিশালের কোন কোন গ্রাম দেখিলাম। মঙ্গলবার বৈকালে আবার উত্তরপাড় ফিরিলাম। দেশের অবস্থা সাধারণত এইরূপ। আমন ধান্য খুব হইয়াছে, পৌষ মাস আসিলে লোকের অবস্থা কতক ভাল হইবে। আউস ধান্য যাহা হইয়াছিল, অনেক ডুবিয়া যাইতেছে। গোপালগঞ্জ, মুকসুদপুর, ভাঙ্গা প্রভৃতি স্থানের আউস ধান্য একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে।

বুধবার উত্তরপাড়ে চাউল দিবার দিন ছিল। প্রাতঃকালে নৌকা করিয়া পুত্রকন্যা সহ দলে দলে স্ত্রীলোক আসিতে লাগিল। পূর্ব্বে প্রত্যহ চাউল দেওয়া হইত। লোক সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি হওয়ায়, এবং বর্ষায় আসিতে কষ্ট হয় বলিয়া, সপ্তাহে দুই দিন, রবিবার ও বৃহস্পতিবার দেওয়া হইতেছিল। আমার আগমন-উপলক্ষে, বিহারী বাবু, বৃহস্পতিবারের চাউল বুধবার দেওয়া হইবে, ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন। এই পরিবর্ত্তনের জন্য সকল লোক আসিতে পারে নাই, তবু ১০।১১ টার সময় দেখিলাম, প্রায় ৮০০।৯০০ স্ত্রীলোক ও শিশু উপস্থিত। অন্যান্য দিন শুনিলাম, ১২০০।১৫০০ লোক হইয়া থাকে। অধিকাংশই স্ত্রীলোক। এত লোকের মধ্যে কেবল ৩০।৪০ জন বৃদ্ধ, অকর্ম্মণ্য পুরুষ। এ এক কি দৃশ্য! দেখিলাম, বালিকা আসিয়াছে, বৃদ্ধ আসিয়াছে, যুবতী আসিয়াছে, প্রৌঢ়া আসিয়াছে, পেটের দায়ে লজ্জা শরম ডুবাইয়া, হায় হায়, কত কুলবধূ আসিয়াছে! শরীর জীর্ণ শীর্ণ, পরিধানে অনেকেরই বস্ত্র নাই বলিলে হয়। সে যে কি দৃশ্য, কে ব্যাখ্যা করিতে পারে? আমি অবস্থা জানিবার জন্য সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, আর দলে দলে স্ত্রীলোক আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া মনের কথা বলিতে লাগিল। আমি সে দিন যেন শত শত জননীর পুত্র হইয়াছি, আমি সে দিন যেন শত শত ভগ্নীর ভাই হইয়াছি। আমার এক একখানি হাত ২০।৩০ জন ধরিয়া টানিতেছে, আর কত নির্ভরের সহিত মনের কথা বলিতেছে, “বাবু, আমি কাল খাই নাই, আমার এই বাছাদের আর বাঁচাইতে পারিলাম না, বাবু, আমার নৌকা নাই, আমি আর চাউল নিতে আসিতে পারিব না, ঘরে মরিয়া থাকিব।” ইত্যাদি কতরূপ দুঃখের কথাই যে কত জন বলিল, আমি লিখিতে অক্ষম। এই দিন কিছু লবণ, চাউল এবং কয়েক খানি নূতন বস্ত্র দেওয়া হইল। কিন্তু সে বস্ত্রে কুলাইল না, আর ২০০ বস্ত্র হইলে কোনরূপে সে দিন মান ও লজ্জা রক্ষা করা যাইত। শেষে আমি বড়ই অপ্রস্তুত হইলাম। লোকের ক্রন্দনে অস্থির হইলাম। চাউল বিতরণের সময় বিষাদিত মনে দেখিতেছিলাম, একটী চাউল মাটীতে পড়িলে তখনই তাহা খুটিয়া বালক বালিকা ও বৃদ্ধেরা মুখে দিতেছে! এরূপ দৃশ্য আর জীবনে কখনও দেখি নাই। প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দলে দলে লোকেরা আমার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতে লাগিল। তাহাদের কাতরোক্তি, এ প্রাণে শেল সম বিদ্ধ হইতে লাগিল, আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া, শেষে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদিগকে কিছু কিছু ভাত দিয়া, উনদিয়া আর্য্য-বিদ্যালয় দেখিতে চলিলাম। সেখানে, বিদ্যালয় পরিদর্শনের পর, অনেক সহৃদয় ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাঁহারা বলিলেন যে, সুহৃদ্ সভার

সাহায্য প্রদত্ত না হইলে শত শত লোক মরিত। অনুসন্ধানে জানিলাম, ১৫ দিনের মধ্যে স্বরূপ দত্ত ও লক্ষ্মণ নামে দুই ব্যক্তির অনাহারে মৃত্যু হইয়াছে। দেশের অবস্থা ভাবিলে পাষাণও বিদীর্ণ হয়।

* * * *

সুহৃদ্ সভার অবস্থা নিতান্ত খারাপ—সহৃদয় ব্যক্তিগণের সাহায্যে সাড়ে তিন মাস বহু লোকের প্রাণ রক্ষা হইয়াছে—বিধাতা তাঁহাদের মঙ্গল করুন। কিন্তু এখন উপায় কি, কে অন্ন যোগাইবে, কে অসহায় রমণীদিগের বস্ত্র দিয়া লজ্জা নিবারণ করিবে? ১০০০ লোককে সপ্তাহে দুই দিন চাউল দিতে হইলে মাসিক অন্যূন ৭০০।৮০০৲ টাকার প্রয়োজন। সর্ব্বত্রই দেখিলাম, মোটা চাউলের মণ ৪৲। গড়ে প্রত্যেককে ৵১সের চাউল দিলেও সপ্তাহে ৫০ মণ চাউলের প্রয়োজন। এই সময়ে কে রক্ষা করিবে? ছোটলাট সাহেব ফরিদপুর গত সোমবার, ১লা শ্রাবণ, ১৮৯৪, উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমিও ছুটিয়া সেখানে গিয়া, সবিশেষ অবস্থা লাটসাহেবকে জানাইতে বন্ধুদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলাম; কিন্তু বর্ত্তমান ম্যাজিষ্ট্রেট, বালাছন হত্যাকাণ্ডের বিখ্যাত হেরাল্ড সাহেব এবং মাদারিপুরের কর্ত্তা বাহাদুর সব উড়াইয়া দিতে চেষ্টিত, লাটসাহেব যে কি করিবেন, জানি না। জেমস্ সাহেব ও মথুর বাবু মহোদয়গণ যথেষ্ট করিতেছেন, কিন্তু তাহা প্রচুর নহে। ১৲ টাকার ধানভানিতে দিয়া ১৲ টাকার চাউল গ্রহণে কোনই উপকার হয় না। এখন কে দরিদ্রদিগকে রক্ষা করিবে? যে দেশের সাধারণ লোকের অবস্থা বরাবর অন্য দেশ অপেক্ষা ভাল ছিল, যে দেশ অন্য দেশকে অনেক ধান চাউল যোগাইত, সেই দেশে হাহাকার উঠিয়াছে—কোলের ছেলে ফেলিয়া পিতা পলায়ন করিতেছে—কেহ বা বিক্রয় করিতে প্রস্তুত—কেহ আত্মহত্যা করিতেছে—কেহ না খাইয়া মরিতেছে! চতুর্দ্দিকে হাহাকার কিন্তু এদেশের ধনী শ্রেণী নিশ্চিন্ত, উদাসীন। ভারতসভা, আজ কোথায়? ব্রাহ্মসমাজ, গরীবের মা বাপ, আজ সহায় না হইলে আর রক্ষা নাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সুহৃদ্ সভার হস্তে ৫০৲ টাকা প্রদান করিয়া যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। কিন্তু এখন ব্রাহ্মসমাজ অগ্রসর হউন। মানবপরিবারের দুঃখে যাঁহাদের প্রাণে একটুও আঘাত লাগে; তাঁহারা এই সময়ে অগ্রসর হউন। সর্ব্বোপরি বিধাতা দরিদ্র দেশের সহায় হউন।

অদ্য পত্র দীর্ঘ হইয়া পড়িল, অন্যান্য স্থানের অবস্থা অবসর পাইলে পরে লিখিব।

তৃতীয় পত্র—সঞ্জীবনী, ৩রা ভাদ্র, ১৩০১।

অন্যান্য কথা বলিবার পূর্ব্বে, অদ্য দু চারিটী অপ্রাষঙ্গিক কথার উল্লেখ করিতেছি। আশা করি, পাঠকবর্গ ক্ষমা করিবেন।

আমি সঞ্জীবনীতে যে পত্র লিখিয়াছি, তাহা পাঠ করিয়া অনেক সহৃদয় ব্যক্তি পত্র লিখিতেছেন, কেহ কেহ কিছু কিছু প্রদান করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট চির কৃতজ্ঞ হইতেছি। আমি একদিন অপরাহ্নে কার্য্যালয়ে বসিয়া রহিয়াছি, এমন সময়, ৩টি ছাত্র আফিসে আসিয়া উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, দেবী বাবু কোথায় থাকেন? আমি বলিলাম, যাহা বক্তব্য আমাকেই বলিতে পারেন। তখন একটী ছাত্র বলিলেন যে, আমরা মেট্রোপলিটান বৌবাজার ব্রাঞ্চের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি। আমরা, ফরিদপুর দুর্ভিক্ষের জন্য, আমাদের শ্রেণী হইতে কিছু সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা আপ-

নার নিকট দিতে আসিয়াছি। ছাত্রটী তার পর পকেট হইতে ১১৸৴০ বাহির করিয়া আমার হাতে প্রদান করিল। আমি বালকগণের এই সহানুভূতি দেখিয়া অবাক্ হইলাম, চক্ষু হইতে জল পড়িল, টাকা কয়েকটী মস্তকে লইলাম, বিহ্বল চিত্তে বালকদিগকে ধন্যবাদ দিলাম। পূর্ব্বে এক সময়ে শুনিয়াছিলাম, কোন দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে ইংলণ্ডের বালকেরা চায়ের সহিত চিনি খাওয়া ছাড়িয়া পয়সা জমাইয়াছিল। আর আমাদের দেশের এই ঘটনা! বালকেরা দেবতা বিশেষ, সংসারের কুবাতাস বহিয়া উহাদিগকে অপবিত্র না করিলে, কত মহৎ কার্য্য উহাদের দ্বারা সাধিত হইতে পারে। ভাবিলাম, এইরূপ করিয়া সকল স্কুলের ছাত্রগণ যদি কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া,মহৎ কার্য্যে প্রদান করে, দেশের রাজারাজড়ারা যাহা না পারে, ইহারা তাহা করিতে পারে। বিধাতা বালকদিগের সহায় হউন।

টাঙ্গাইল হইতে বাবু রামপ্রাণ দত্ত তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ২৲টী টাকা দুর্ভিক্ষের জন্য প্রদান করিয়াছেন। ইহা দেখিয়াও অবাক্ হইয়াছি। অন্নবস্ত্রহীনা নিরাশ্রয়া রমণীগণের জন্যও যদি সকলে কিছু কিছু প্রদান করেন, কত বৃহৎ কার্য্য হইয়া যাইতে পারে। আর একজন বন্ধু বস্ত্রের জন্য ৩০৲ দিয়াছেন। কিন্তু এস্থানে একটী কথা। আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোক সকল বিষয়েই উদাসীন। বিপদের দিনে, প্রত্যেকের যে কিছু কিছু কর্ত্তব্য আছে, অনেকেরই ধারণা নাই। অনেক লোক বাক্যবাগীশ, কাজের বেলায় পাওয়া যায়—অতি অল্প লোক। তারপর পরস্পরের প্রতি অসদ্ভাব এবং অবিশ্বাস। এজন্য কোন মহৎকার্য এদেশে প্রায় সাধারণ চাঁদায় সম্পন্ন হইতে পারে না। আমি অত্যন্ত ব্যথিতপ্রাণে শুনিয়াছি, সঞ্জীবনীতে আমি যাহা লিখিয়াছি, তাহা পাঠ করিয়া কেহ বলিয়াছেন যে, আমি অতিরঞ্জিত করিয়া লিখিয়াছি, কেহ বলিয়াছেন যে, মফঃস্বলে গেলে সকল লোকই অভাব জানায়, দেবী বাবু সহৃদয় লোক, তাহা দেখিয়া গলিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ ইহার চেয়ে শক্ত ভাষাও প্রয়োগ করিয়াছেন। এ সকল কথা শুনিয়া দারুণ আঘাত পাইয়াছি। প্রথমতঃ আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহার শতাংশের একাংশ লিখিতে পারি, আমার এমন সাধ্য নাই। আমি পাষাণ, তবুও আমি রাত্রে ঘুমাইতে পারি না, দিবসে সুস্থির থাকিতে পারি না, দিবানিশি দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগের করুণ আর্ত্তনাদ প্রাণে জাগিতেছে। যাঁহারা বলেন,অল্প ঘটনা অতিরঞ্জিত করিয়াছি, তাঁহারা একবার মাদরা, আকাসী, কোটালিপাড় যাইয়া দেখুন, অবস্থা কি শোচনীয়, বুঝিবেন। দ্বিতীয় কথা, আমি কোন দরিদ্রের বাড়ী, পূর্ব্বে সংবাদ দিয়া, যাই নাই। বড় মানুষের মতও যাই নাই। সামান্য লোকের ন্যায় গিয়াছিলাম, তাহাতেই যাহা দেখিয়াছি, তাহার শতাংশেরও কম লিখিয়াছি। আজ এই পত্রের শেষে, আরো কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করিব।

আমাদের দেশের লোকেরা অবিশ্বাস করেন, ইহাতে বড়ই প্রাণে আঘাত লাগে। গবর্ণমেণ্টেরত কথাই নাই। গত বৎসর শ্রীযুক্ত গ্রাউজ এবং বেল সাহেবের চেষ্টায় সহৃদয় অস্থায়ী ছোট লাট ম্যাক্‌ডোনেল সাহেব বিল-প্রদেশের দুর্ভিক্ষের কথা উল্লেখ করিয়া যে অনেক সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

এবার আমাদের বর্ত্তমান লেপটেনেণ্ট গবর্ণর ইলিয়ট সাহেব, গত ১৭ই জুলাই, (১৮৯৪) সোমবার, ফরিদপুর গিয়াছিলেন। ঐ দিন আমিও ফরিদপুরে গিয়াছিলাম। আমাদের দেশের প্রধান প্রধান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া, মিউনিসিপালিটি হইতে তাঁহাকে যে অভিনন্দন দিয়াছিলেন, তাহাতে দুর্ভিক্ষের কথা উল্লেখ ছিল এবং গবর্ণমেণ্ট যে উপযুক্তরূপ সাহায্য করেন নাই, একথাও লিখিত ছিল। এই অভিনন্দন শ্রবণ করিয়া লাট সাহেব বলিয়াছিলেন যে, অভিনন্দনের দুর্ভিক্ষের কথা সত্য নহে। তাঁহার কথা এই :—

"They had said that the prevailing opinion about the distress was supported by successive District officers in that the measures hitherto adopted had been inadequate to the actual necessities of the occasion. He considered that statement to be inaccurate, for he was not aware of any such opinion expressed by the District officers". *Amrita Bazar Patrika*, 31st July, 1894.

ইহার পর ৩০শে ও ৩১শে জুলাই তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় সমস্ত পত্রাদি ছাপাইয়া দেখান হইয়াছে যে, লাট সাহেবের ঐ উক্তি নিতান্ত অমূলক। এ সম্বন্ধে ৬ই আগষ্টের (১৮৯৪) ইণ্ডিয়ান নেসন-সম্পাদক লিখিয়াছেন—

"Sir Charles Elliott, speaking at Faridpur, refused to accept unsupported statements in the Municipal address to the effect that local District officers have borne testimony to the distress in the district and the necessity of Government help. His Honour made some very caustic remarks, dwelling on the general and, so to say, voucherless character of the complaint. He wanted references to chapter and verse, or at any rate 'clues.' Two letters which appeared in the *Amrita Bazar Patrika* of Monday and Tuesday last furnish authorities enough. Since the commencement of the distress in July 1893, there have been four district officers:—Mr. E. F. Growse, Mr. Beatson Bell, Mr. R. Pope and Mr. J. L. Herald. The correspondent makes some extracts from the letters of Mr. Growse and Mr. Pope which bear out the statements in the address, and he states that if the letters written by the other two Magistrates to the Commissioner are called for, they also will be found to be to the same effect. A reply, which has been quoted, of the Commissioner to a letter of Mr. Herald's indicates pretty plainly the kind of views that must have been expressed in the letter."

সুহৃদ্ সভার সম্পাদকের নিকট মাজিষ্ট্রেটগণ যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার একখানি পত্র মাত্র অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য পত্র আমার নিকট আছে। তাহা প্রকাশ করিলে লাট সাহেব দেশের অবস্থার কথা শুনিয়া অবাক্ হইবেন। তাহাই বা কেন, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী লাট সাহেব যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন, অফিসরগণ এক বৎসর ধরিয়া ফরিদপুরের অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া আসিতেছেন। বিরোধী কেবল মাদারিপুরের সুযোগ্য ডেপুটী সাহেব! বিধাতা তাঁহার জন্য স্বর্গে রত্ন সিংহাসন নির্ম্মাণ করুন, এবং গবর্ণমেণ্ট নবাব উপাধিতে তাঁহাকে ভূষিত করুন। শুনিয়াছি, ইতি মধ্যেই গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। যে ব্যক্তি অফিসিয়াল পত্রেরও উত্তর প্রদান করেন না, তিনি সুযোগ্য কর্ম্মচারীই বটে। আমি সুহৃদ সভার সম্পাদকরূপে তাঁহাকে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে যে সকল পত্র লিখিয়াছি, এক খানিরও তিনি উত্তর দেন নাই। দুর্ভিক্ষে লোক মরিয়াছে, ইহা কাগজে লিখিয়াছিলাম বলিয়া একবার কর্কশ ভাষায় আমার নিকট কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় কোটালিপাড়ের বর্ত্তমান অবস্থা চাপা রহিয়া যাইতেছে। দুটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

কোটালিপাড়ে, আমি যখন, অনাহারে

কেহ মরিয়াছে কি না, অনুসন্ধান করিতে-ছিলাম, তখন অনেকেই বলিতে সঙ্কুচিত হইতেছিল। একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক যখন বলিল যে, লক্ষ্মণ ও স্বরূপ দত্ত সম্প্রতি মরিয়াছে, তখন চতুর্দ্দিক হইতে আর আর স্ত্রীলোকেরা বলিতে লাগিল, "বলিলি কেন, ইহার পর সরকার হইতে শাস্তি পাইবি।" বৃদ্ধা মিনতি করিয়া তখন আমাকে বলিল যে, "বাবু দেখিও যেন আমরা, অবলা, বিপদে না পড়ি।" আমি বলিলাম, কোন ভয় নাই। চাউল বিতরণের দিন, কোটালিপাড়ের পুলিস-দারোগা মহাশয় একটী চুরির অনুসন্ধান করিতে উত্তরপাড় হাটে আসিয়াছিলেন, তিনি রমণীগণের দুর্দ্দশা ও শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া শেষে এত ব্যথিত হইয়াছিলেন যে, অপরাহ্নে অনেককে একটী করিয়া পয়সা দিয়াছিলেন। তিনি এক জন সহৃদয় ব্যক্তি, তিনি বন্ধু বিহারী বাবুর নিকট বলিয়াছিলেন, 'সকলই দেখি-তেছি, সকলই বুঝিতেছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছুই লিখিবার যো নাই।" এমনই কঠিন আদেশ।

যাক্, পর নিন্দায় আর কাজ নাই। সহৃদয়তার কথা স্মরণ করি, এই দুঃখের দিনে অনেক সান্ত্বনা পাওয়া যাইবে। ব্রাহ্ম-সমাজকে সাহায্য করিতে আহ্বান করিয়াছি-লাম, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অগ্রসর হইয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এদেশের গরিবের মা বাপ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের লোক সাহায্য লইয়া মাদরা গিয়াছেন, আর সুহৃদ্‌সভা হইতে দুই জন সহৃদয় ভাই কোটালিপাড় গিয়াছেন। ইঁহারা যাইয়া চাউল, ঔষধ, ও বস্ত্র বিতরণ করিতেছেন। এখন দেশের সহৃদয় ব্যক্তিগণ অগ্রসর হউন। অবিশ্বাস, অসদ্ভাব দূরে রাখিয়া অগ্রসর হউন। আমাদিগকে অবিশ্বাস করেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট টাকা প্রেরণ করুন; তাঁহাদিগের প্রতি সদ্ভাব না থাকে, সুহৃদ্‌সভার সম্পাদকের নিকট ২১০।৪ কর্ণ-ওয়ালিস্‌ষ্ট্রীটে প্রেরণ করুন। ৫ ১০ পয়সা করিয়া সংগ্রহ করিলে কত টাকা হইয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট কিছু করুন বা না করুন, সে বিচারে কাজ নাই। বিদেশী গবর্ণমেণ্ট যাহা করেন, তাহাই ভাল। আমাদের কর্ত্তব্য আমরা করিয়া ধন্য হই। সহৃদয় ব্যক্তিগণের শ্রীচরণে একান্ত অনুরোধ, অগ্রসর হউন, উপহাস, অবিশ্বাসের সময় আর নাই; দুঃখী বিপন্নের সহায় হউন। একবার চাহিয়া দেখুন, কি শোচনীয় অবস্থা!!

আমি এক বাড়ীতে যাইয়া দেখিলাম, ঘরে একটী বৃদ্ধ শুইয়া কাঁদিতেছে, পাড়ার লোকেরা বলিল, "বাবু, ঐ বৃদ্ধ অনাহারে মরিতেছে, উহাকে কিছু দাও।" আমি কাছে গেলে, হাউ হাউ করিয়া বৃদ্ধ কাঁদিতে লাগিল। দেখিয়া সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল, চক্ষু হইতে জল পড়িল, কিছু না বলিয়া কয়েকটী পয়সা দিলাম। আর এক বাড়ী যাইয়া দেখিলাম, আর একটী বৃদ্ধ কাঁদিতেছে, অনাহারে তাহার শরীর শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, ঘরে বেড়া নাই, চালে ছোন নাই। ভিক্ষার চাউল কে যেন চুরি করিয়া লইয়াছে, তাই দুই দিন আহার হয় নাই, আমা-দিগকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। তাহাকেও কিছু দিলাম। কোন কোন লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, সভার সাহায্য না হইলে তোমরা কি করিতে? তাহাতে তাহারা উত্তর করিল, মরিয়া এত দিন জলে ভাসিয়া বেড়াইতাম! এক জন সহৃদয় বন্ধুকে

জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহারা এই দেশে ভিক্ষা পায় না? বন্ধু বলিলেন, ভিক্ষা দিবে কে? অনেক ভদ্র লোকের দু-বেলা আহার জুটে না—চৌদ্দ আনা ঘরে অন্নকষ্ট—এরূপ অবস্থা কোটালিপাড়ে কেহ কখনও দেখে নাই। এইরূপ কথা যে কত লোকের নিকট শুনিয়াছি, সংখ্যা নাই। বন্ধু বলিলেন, "এক জন ভিখারী সমস্ত দিন ভিক্ষা করিয়া সন্ধ্যার সময় আমাকে দেখাইল—এক মুষ্টি চাউলও সংগ্রহ হয় নাই। কি শোচনীয় ব্যাপার!! ক্ষুধায় যখন বালকেরা অস্থির হইয়া, পিতা মাতার কাপড় ধরিয়া টানে, তখনকার পিতা মাতার নিরাশার ক্রন্দন শুনিয়াছি। পিতা মাতা কাঁদিয়া বলিতেছে—"বাবু, এই ছেলে পিলে তোমাকে দিলাম, লইয়া যাও।" তখন আমার পাষাণ সদৃশ প্রাণও ফাটিয়া গিয়াছে। কলিকাতা আসিয়া আমার বন্ধু, মাণিকদহের জমিদার বাবু বিপিনবিহারী রায় মহাশয়কে বলিয়াছিলাম, "আমি পাষাণ, তবু আমি অস্থির হইয়াছি, আপনি গেলে না জানি কেমন হইয়া যাইতেন।" বাস্তবিক হৃদয় যাঁহার আছে, তাঁহার গলিবেই গলিবে। হরিণহাটীতে একটী ১৩ বৎসরের বালিকার উপর তিন চারিটী ভাই ভগ্নীর ভার পড়িয়াছে। দুঃখিনীর এ পৃথিবীতে আর কেহ নাই। ঘর ছিল না, শুনিলাম, ফরিদপুরের ইঞ্জিনিয়ার, আমার বন্ধু নিবারণ বাবু তাহাকে একখানি কুঁড়ে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। সেই বালিকাটীর এমন অবস্থা যে কাঁদিতেও পারে না। দেড় প্রহর জল ঝাঁপাইয়া উত্তরপাড় চাউল লইতে আসিয়া থাকে। যাহারা চাউল নিতে আসে, তাহারা বৃষ্টি মানে না, ঝড় মানে না, বর্ষার প্লাবন মানে না! দেখিয়া বোধ হইল, ঐ বালিকাটী ছয় মাসের মধ্যে মাথায় তেল দেয় নাই। আমি একটী পয়সা তেল কিনিয়া মাথায় দিতে দিয়াছিলাম, দুঃখিনীর আর আনন্দ ধরে না। আধ আধ ক্রন্দন স্বরে সে বলিয়াছিল—'বাবু, ছোট ভাইদের যখন খাইতে দিতে পারি না, তখন তাহারা আমার চুল, আমার কাপড় টানিয়া ছিঁড়ে ও আমাকে প্রহার করে।" দুঃখিনী প্রহারের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখাইল। তাহার চুল নাই বলিলেই হয়, সমস্ত ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। বস্ত্র মলিন, ছিন্ন, আর্দ্র। ইহাকে একখানি নূতন বস্ত্র দেওয়া হইয়াছিল। ১৲ টাকা হইলে একখানি নৌকা পাওয়া যায়; দুঃখিনী একখানি নৌকা পাইলে, ভিক্ষা করিতে আসিতে পারিবে, এই কথা বলিয়া সমস্ত দিন আমাকে কাঁদাইয়াছিল। *

শুয়াগ্রামের যে জননীর কথা আমি পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম, সে আমার নিমন্ত্রণ অনুসারে উত্তরপাড়ে আসিয়াছিল। তাহাকে একখানি নূতন বস্ত্র, ৪।৫ সের চাউল এবং প্রায় একসের লবণ দেওয়া হইয়াছিল। জননী আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিলেন। ৭।৮ শত জননীর কথা লিখিতে পারি, সে সাধ্য আমার নাই, সংবাদপত্রে সে স্থানও নাই। প্রতি জনের বিষাদের কাহিনী শুনিলে পাষাণও বিদীর্ণ হয়। হাটের বারবনিতারা পর্য্যন্ত তাহাদের কষ্ট দেখিয়া ম্রিয়মানা। ৩০। ৪০ জন নিরাশ্রয়া জননী ও পিতা শিশুদের আনিয়া উত্তরপাড়ে আশ্রয় লইয়াছে।

* এই ঘটনাটী পাঠ করিয়া আমার বন্ধু বাবু বৈকুণ্ঠনাথ রায়, এই বালিকার নৌকা ও চাউল কিনিতে ২টী টাকা দিয়াছেন। বৈকুণ্ঠ বাবুর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, তাহার চক্ষু দুটী গিয়াছে। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আমার পূর্ব্বের ন্যায় চক্ষু থাকিলে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতাম।" কি সহৃদয়তার ছবি!!

বিহারী বাবু যে দিন আগমন করেন, সে দিন তিনি যখন বলিলেন—"আজ আমি যাইব," তখন ১০০০ লোক উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া আকাশ কাঁপাইয়াছিল। বিহারী বাবু বলেন, সে ক্রন্দন, সে বিষাদের স্বর এখনও তাঁহার কাণে বাজিতেছে।

পত্র বড় হইল, আজ আর না। বলিয়াছি, সুহৃদসভার সভ্য বাবু কুঞ্জলাল ঘোষ, একজন বন্ধু সমভিব্যাহারে, ঔষধ, বস্ত্র, ও সাহায্য লইয়া সুহৃদসভা হইতে উত্তরপাড়—কোটালিপাড় গিয়াছেন এবং দেশের মা বাপ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে বাবু হরিমোহন ঘোষাল সাহায্য লইয়া মাদ্রা (মাদারিপুর) গমন করিয়াছেন। ইঁহারা উভয়ই সহৃদয় ব্যক্তি। গরিব দুঃখীর জন্য কিরূপ খাটিতে হয়, উভয়ই জানেন। বিধাতা ইঁহাদের ও আমাদের সহায় হউন। দেশের সহৃদয় ব্যক্তিগণ অগ্রসর হউন, দুর্ভিক্ষের ভীষণ অনলে যাহারা দগ্ধ হইতেছে, তাহাদিগকে উদ্ধার করুন।

৪র্থ পত্র—সঞ্জীবনী, ১০ই ভাদ্র, ১৩০১।

* * * * *

দুর্ভিক্ষের প্রথম অবস্থা হইতে এপর্য্যন্ত আমি মফঃস্বলের বহুপত্র পাইয়াছি। বিগত ভাদ্র (১৩০০) মাসে একবার বিবরণ সংগ্রহ করি। জ্যৈষ্ঠ (১৩০০) মাসে একবার মফঃস্বল পরিভ্রমণ করি। তার পর কার্ত্তিক (১৩০০) মাসে আর একবার মফঃস্বল পরিদর্শন করি। এ সকল ভ্রমণের কথা কোন সংবাদপত্রে আমি লিখি নাই। আমার নিকট বহুস্থানের কষ্টের কথা-সম্বলিত পত্র আছে, অনাহার-ক্লিষ্ট মৃত্যু-কাহিনীর বিবরণ আছে; সে সকল কিছুই উল্লেখ করার আবশ্যকতা বুঝি নাই। আমি পূর্ব্বে যে সকল অনাহারের মৃত্যুসংবাদ পাইয়াছি, তাহাও লিখি নাই। কিন্তু এবার স্বচক্ষে দেখিয়া আমার প্রাণ কেমন হইয়া গিয়াছে, সেজন্য আর নিরস্ত থাকিতে পারিতেছি না। ৮ই শ্রাবণ চাউল বিতরণ করিয়া বিহারী বাবু চলিয়া আসিয়াছেন। ২৯শে শ্রাবণ বাবু কুঞ্জলাল ঘোষ কোটালিপাড় গিয়াছেন। ইহার মধ্যে যে সকল পত্র আসিয়াছে, তাহা অত্যন্ত শোচনীয়। অধিক স্থান নাই, ৩ খানি পত্র হইতে একটু একটু তুলিয়া দিতেছি। উনসিয়া আর্য্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রেবতীমোহন কাব্যরত্ন আমাকে লিখিয়াছেন ;—

২০শে শ্রাবণ, ১৩০১—"যাহারা এপর্য্যন্ত সুহৃদসভার অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছে, তাহারা বর্ত্তমান সময় অন্নাভাবে মৃতপ্রায় আছে এবং কবে বাবু আসিবেন, নিরত অনুসন্ধান করিতেছে।" শ্রীযুক্ত রাধাচরণ দাস, উত্তরপাড় হাট হইতে বিহারী বাবুকে লিখিয়াছেন—২৬শে শ্রাবণ, ১৩০১, "আর মহাশয়কে নূতন সংবাদ কি লিখিয়া জানাইব, সমস্ত লোক অন্নাভাবে এই সমস্ত কাজ করিতেছে, জানিবেন যে, এখান হইতে যখন যান, তখন কটিক মণ্ডল বাগানার ছেলে ২০৲টাকায় বিক্রয় করিত, কিন্তু আপনার জন্য পারিয়াছিল না, এক্ষণ তিন দিন অনাহারে থাকিয়া ছেলেটাকে শয্যাগত করিয়া, না বাঁচা ইতে পারিয়া, উত্তরপাড় বাজারে আসিয়া সমস্তকে বলিল, যেরূপ হউক আমি এক্ষণ পর্য্যন্ত একবেলা খাইয়া বাঁচিয়াছিলাম, এক্ষণ আমি বাঁচি না ও ইহাদের বাঁচাইতে পারি না। পরে পূর্ব্বপাড় নিবাসী শ্রীচণ্ডীচরণ বাড়ৈকে সকালে বলিয়া, তাহার নিকট হইতে ১৭৲ টাকা লইয়া ছোট ছেলেকে বিক্রয় করিয়াছে। আর শুনিতে পাইলাম যে, দেড় আনী জমীদারের বাজার খোলাতে একটা লোক অন্নাভাবে জীবন ত্যাগ করিয়াছে।"

বাবু শশধর চক্রবর্ত্তী বিহারী বাবুকে লিখিয়াছেন—১০ই আগষ্ট, ১৮৯৪—"দেশের অবস্থা দিন দিন আরো ভীষণ হইতেছে। সে দিন বাজার খোলা স্কুল ঘরের সামনে একটা লোক আহারাভাবে পড়িয়াছিল, প্রাতে সকলে দেখিতে পাইল যে, শেয়ালে তাহাকে খাইয়া ফেলিয়াছে। অবশিষ্ট কুকুরে খাইতেছে। হায় রে অন্ন। * * আমি ঐ স্ত্রীলোকটার নাম জানিয়া লিখিব।"

আমি যেরূপ অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছিলাম, না জানি, এই কয়েক দিনে কত লোকের ঐরূপ দশা হইয়াছে! তাহাদের বিবরণ সংগ্রহ করে, এমন লোকও নাই; সকলেই আপন আপন চিন্তায় অস্থির। দিনব্যাপী ব্যবধান ৬০। ৭০ খানা গ্রাম হইতে লোক আসিয়া চাউল নিত, এত গ্রামের বিবরণ কে লিখিবে? ১০৲ টাকায় ছেলে বিক্রয়ের কথা শাত্র শুনা যায় নাই। কত লোকের মান ইজ্জত, কত সতীর সতীত্ব, কত লোকের ধর্ম্ম পুণ্য, পেটের দায়ে লোপ পাইতেছে, কে জানে? ছেলের আহার কাড়িয়া মা খাইতেছেন, এ দৃশ্য আর দেখি নাই, এবার দেখিয়াছি। অন্নাভাবে জননীকুল, কোটালিপাড়ে উন্মাদের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে। একজন স্ত্রীলোককে শৃগালে খাইয়াছে, সংবাদ পাইয়াছি; কিন্তু কত স্ত্রীলোক, কত দূরবর্ত্তী গ্রামে যে এই সময়ের মধ্যে মরিয়াছে, কে লিখিবে? কত অসংখ্য ছেলে-মেয়ের চক্ষের জলে জননীর চক্ষের জল মিশিতেছে—রজনী প্রভাত হয়ত দিন কাটে না; দিন কাটে ত রাত্ পোহায় না—উদরের জ্বালায় কত উষ্ণ নিশ্বাস যে আকাশে উঠিতেছে—৬০। ৭০ খানা গ্রামের সংবাদ কে জানাইবে? আর কেই বা অসংখ্য রমণীর দারুণ জ্বালা নিবারণ করিবে? আমি আজ জননীকুল, ভগিনীকুলকে, জননী ভগিনীদিগের কথা একবার ভাবিতে অনুরোধ করিতেছি। সমবেদনা, সমদুঃখী ভিন্ন কে বুঝিতে পারে? ছেলে মেয়ের আহার দিতে না পারিলে, মায়ের কত কষ্ট, তাঁহারাই জানেন; ছোট ভাই ভগিনীর আহার যোগাইতে না পারিলে, কত দুঃখ, তাঁহারাই বঝিতে পারেন। রমণীকুল দয়ার জলধি—দয়া মায়া যাহা কিছু দেবযোগ্য জিনিস, তাহা তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়াই রহিয়াছে। তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, কোটালিপাড়ের জননী ভগিনীদিগের অভাব দূর করিতে তাঁহারা চেষ্টা করুন। তাঁহারা চেষ্টা করিলে, না হইতে পারে, এমন কাজ নাই। বিধাতার দোহাই, তাঁহারা অসহায়াদিগের, নিরাশ্রয়াদিগের সহায় হউন। আর দুঃখ দূর করিতে, অভাব মোচন করিতে, রমণীকুলের লজ্জা নিবারণ করিতে, আমি বঙ্গের দীনজননী, দরিদ্রের আশ্রয়দায়িনী **শ্রীশ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ীকে** আহ্বান করিতেছি! তিনি দয়া না করিলে আর দেশ রক্ষা পায় না।

পত্র বড় হইয়া উঠিল, সুতরাং আজ আর না। পত্র বড় হয়, কিন্তু কথা ফুরায় না।

৫ম পত্র—সঞ্জীবনী, ১৭ই ভাদ্র, ১৩০১।

* * * * *

আজ কাল দেশের সহৃদয়তার কথা ভাবিতেছি, আর চক্ষের জলে ভাসিতেছি! মৈমনসিংহের অধীন কালিকাপুরের জমীদার বাবু ধরণীকান্ত লাহিড়ী মহাশয় ১০০ খানি নূতন বস্ত্র দিয়াছেন। আরো বহু সহৃদয় ব্যক্তি কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছেন। বাবু হরিপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় দরিদ্রদের জন্য অস্থির হইয়া, কলিকাতার বাড়ী বাড়ী, রাস্তায় রাস্তায়, ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছেন। বোধ হয় যেন বিধাতা দরিদ্রদের জন্য দয়ারূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন!!

আমি যাহা দেখিয়া আসিয়াছি, তাহার একটু একটু আভাস দিয়াছি। আজ যে বন্ধুরা মাদরা ও কোটালিপাড় গিয়াছেন, তাঁহাদের চারিখানি সুদীর্ঘ পত্রের একটু একটু স্থান

তুলিয়া দেখাইব, দিন দিন অবস্থা কিরূপ ভীষণ হইতেছে। কিন্তু হৃদয় থাকিতে যাঁহারা হৃদয়শূন্য, কর্ণ থাকিতে যাঁহারা বধির, কে তাঁহাদিগকে গলাইতে পারে? পূজা আসিতেছে, কতলোক, কত নরনারী, আনন্দে পূর্ণ হইতেছেন! আর এই সময়ে শত শত জননী, পুত্র কন্যার অন্তিম-অবস্থা চিন্তনে অশ্রুজলে ভাসিতেছেন। সে সকল দৃশ্য কে ভাবিয়া সুখ বিসর্জ্জন দিবে? ঘটনা স্মরণ করিলে প্রাণ অস্থির হয়! বিধাতঃ! আর যে সহিতে পারি না!!

উত্তরপাড়ের দোকানদারদিগের ঘরে বহু বৎসরের কতকগুলি মসুরি ও ছোলার ডাইল ছিল, তাহা বিবর্ণ হইয়াছিল, সার ভাগ পোকায় খাইয়াছিল, অবশিষ্ট রাবিসে পরিণত হইয়া মুদিদের দোকানের কোণে কোণে পড়িয়াছিল। তাহার একমুষ্টি হাতে লইয়া দেখিয়াছি, হাত ধুইলেও দুর্গন্ধ যায় না। এই রাবিসগুলি, জঠরানল নিবৃত্তির জন্য, নিরাশ্রয়া রমণীরা কিনিয়া খাইয়াছে!! পাখী যাহা খায় না, মানুষে তাহা খাইয়া প্রাণধারণ করিয়াছে! কেহ এ কথা বিশ্বাস করিবেন কি? সত্য ঘটনা, উত্তরপাড়ে অনুসন্ধান করুন, জানিবেন।

এক জন বৃদ্ধার বাড়ীতে গিয়াছিলাম। বৃদ্ধা আমাদিগকে দেখিয়া বলিল, "বাবা, চাউল দেওয়ার সময় সন্দেহ করিয়া থাক, আজ দেখিয়া যাও, আমার ঘরে কি আছে, আর আমি কি সুখে আছি!" বৃদ্ধা ব্যাকুলচিত্তে ঘর দেখাইতে লইয়া চলিল। ঘরের চালে ছোন নাই, বেড়া নাই, সেত দূরের কথা; দেখিলাম, ঘরে একখানি ছিন্নবস্ত্র বা ছিন্ন শয্যা বা একটী মেটে জলপাত্র, একটী হাঁড়ি বা কোন আসবাব নাই—বলিতে কি, কিছুই নাই। জীবনে কখনও এরূপ শূন্য ঘর দেখি নাই; দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই। বৃদ্ধাকে কিছু দিয়াও আশ মিটে নাই।

এক ঘরে বেলা আনুমানিক ১১টার সময় দেখিলাম, একটী জীর্ণা শীর্ণা যুবতী শুইয়া আছে। উঠিতে পারে না, নড়িতে পারে না। পার্শ্বের ঘরে জিজ্ঞাসা করিলাম, ঐ মেয়েটী ওরূপে পড়িয়া রহিয়াছে কেন? উত্তর হইল, তিন দিন আহার নাই!!

একটী বৃদ্ধা ও একজন বৃদ্ধ উত্তরপাড় হাটে চাউল নিতে আসিয়াছিল। ঐ বৃদ্ধ, ঐ বৃদ্ধার স্বামী। তিন চারিটী পুত্র কন্যা, বৃদ্ধ অন্ধ। দুই প্রহর দূর হইতে ইহারা আসিয়াছিল। বৃদ্ধা বুকে পীঠে করিয়া পুত্র কন্যা লইয়া যখন আসিয়াছিল এবং কাঁদিয়া মনের দুঃখ, কষ্টের কথা বলিতেছিল, আমি ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারি নাই। একখানি বস্ত্রের জন্য, সমস্ত দিন, আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া কাঁদিয়া ২ আমাকে কাঁদাইয়াছিল। বস্ত্র ফুরাইয়া গিয়াছিল বলিয়া দিতে পারি নাই। এখন পাঠাইয়াছি।

স্নান করিবার সময় দেখিলাম, তিন চারিটী ছেলেমেয়ে লইয়া এক জননী, ভিক্ষার চাউলসহ জল ঝাঁপাইয়া যাইবার সময়, একটী ছেলেকে জলে নিমগ্ন করিয়া বলিতেছিল— "মরিয়া যা, আমি আর সহিতে পারি না!" আমি দেখিয়া ঠিক থাকিতে না পারিয়া, তাহাকে জল হইতে তুলিয়া, কাকুতি মিনতি করিয়া, এক মাঝীর দ্বারা জলপার করাইয়া দিয়াছিলাম।

আমার কথা আজ এই খানেই থাকুক। আমি অতিরঞ্জিত করিয়াছি, এই অভিযোগ উঠিয়াছে, ভাল কথা। কোটালিপাড় হইতে বাবু কুঞ্জলাল ঘোষ, এবং মাদরা হইতে বাবু হরিমোহন ঘোষাল কি লিখিতেছেন, দেখুন।

বাবু কুঞ্জলাল ঘোষের প্রথম পত্র—উত্তরপাড়, ১৬ই আগষ্ট, ১৮৯৪। "কোনমতে কাল সন্ধ্যার পূর্ব্বেই এখানে

আসিয়া পৌঁছিয়াছি। কিরূপে জানি না, আমি আসিবার পুর্ব্বেই খবর পাইয়া, অনেক লোক উপস্থিত ছিল। উপস্থিত লোকের অবস্থা দেখিয়া এবং সকলের মুখে দুঃখের সমাচার শুনিয়া প্রাণে অসীম যন্ত্রণা পাইলাম। যে কয়েক মুষ্টি আউসধান হইয়াছিল—তাহা তো হাতির মুখে দুর্ব্বাঘাস। তাহা কেবল এ হতভাগ্যদের জঠরানল আরো জ্বালাইয়া দিয়া গিয়াছে !

আজ প্রাতঃকাল হইতে জল ঝাঁপাইয়া বুকে পিঠে সন্তানগুলি বহন করিয়া কত দুখিনী উপস্থিত হইতেছে। আজ বড়ই দুর্দ্দিন। নানা স্থান খুঁজিয়া এক মোণ বই চাউল পাওয়া গেল না। তাহা ত মুষ্টিতে মুষ্টিতে শেষ হইয়া আসিল।

স্থানীয় যাঁহারা কিছু বুদ্ধিমান এবং একটু হৃদয়বান লোক (বলিয়া বোধ হইতেছে) তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে বলিতেছেন—পূর্ব্বাপেক্ষা অবস্থা মন্দ হইয়াছে। ভাদ্র ও আশ্বিন, এই দুই মাস উত্তরোত্তর অবস্থা আরো শোচনীয়তর হইবে। এই দুই মাস পিতা যদি ইহাদিগকে বাঁচান, কার্ত্তিক মাসে ইহারা ঘরের বাহির হইতে পারিবে, —মাঠে কাজ করিয়াও অনেক লোক উদরান্ন সংগ্রহ করিতে পারিবে। ঘরে পড়িয়া মরার কথা শুনিয়াছেন—কি? আজ কালকার অবস্থা ঠিক তাহাই। দেখিয়া শুনিয়া আমারও বিশ্বাস জন্মিয়াছে—ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা দুঃসময়। * * *

এই পর্য্যন্ত লিখিতে লিখিতে রাজিন্দ্রপাড়ার ভরতের মা, ভরত এবং দুটী বালক উপস্থিত হইল। তাহারা বলিল—" তিন দিন পেটে ভাত নাই।" দেহ কখানি কঙ্কাল সার, চাহিয়া দেখা যায় না। বৃদ্ধদেহে বস্ত্র নাই, বৃদ্ধা কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমাকেও কাঁদাইল। তাহারা আর বলিবে কি—দেখিয়াই সব বুঝিলাম। খাতা খুলিয়া দেখিলাম—বস্ত্র দিবার কথা আছে। চাউল ও বস্ত্র দিয়া বিদায় করিলাম। দাদা, অনেক সহিতে শিখিয়াছি—তবু এ সব সহ্য হয় না!"

বাবু কৃষ্ণলাল ঘোষের দ্বিতীয় পত্র—২০ আগষ্ট, ১৮৯৪—"কাল রবিবার গিয়াছে। কি বিষম দিন। আমার আসার সমাচার সুদূর স্থানে পৌঁছে নাই। তথাপি ৬৫০ জন ভিক্ষার্থী উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্ব্ব হাটের কেনা চাউলের মধ্যে প্রায় ৯ মোণ চাউল ছিল। উপস্থিত লোক দেখিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল, প্রাণ অস্থির হইল। আধসের চাউলে এক জনের ৩।৪ দিন কি হইবে, আমি কি করিয়া ইহা তাহাদের হাতে দিয়া বিদায় করিব, এই চিন্তা আমাকে অবসন্ন করিয়া ফেলিল। যখন চাউল দিয়া যাইতে লাগিলাম, চারি দিক হইতে হাহাকার উঠিল। "আজ দুদিন পেটে কিছু নাই, "ঘরে ৭৮টা গুঁড়োগাড়া" ইত্যাদি ইত্যাদি কত কাকুতি মিনতি! অন্যদিকে। আমার ভাণ্ডার শূন্য, ইচ্ছা থাকিলেও উপায় করিতে সাধ্য নাই, কি পরিতাপ! কি পরিতাপ! দাদা, ডাকিয়া আনিয়া এ যাতনায় আমাকে কেন ফেলাইলেন? আপনি নিজে কখনই এ দৃশ্য সহিতে পারিতেন না, নিশ্চয়ই বাড়ীঘর বেচিয়া, ইহাদিগের অন্ততঃ এক সন্ধ্যা পেট ভরিয়া খাইবার যোগাড় না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তবে আমাকে এ বিপদ সাগরে ভাসাইলেন কেন? চক্ষুর অগোচরে যাহা হইবার হইতেছিল, সাম্নের উপর ইহা কে দেখিতে পারে? আমি আপনাদের কাছে এমন কি অপরাধ করিয়াছিলাম, যাহার জন্য এ দুরন্ত শাস্তি বিধান করিয়াছেন? আমি আপনাদের পায়ে ধরিয়া বলিতেছি, ত্বরায় ৭০০ শত লোকের সপ্তাহে এক সন্ধ্যা পেট ভরিয়া খাইবার আয়োজন করুন, নতুবা মানুষের জীবন লইয়া এ খেলা খেলিতে আমি পারিব না। এই হতভাগ্যদিগের ক্ষুধানলে ঘৃতাহুতি দিবার জন্য আমি কখনও এখানে জীবিত থাকিতে পারিব না।

আজ ৬ দিন এখানে আসিয়াছি। ইহার মধ্যেই অভিজ্ঞতার একশেষ হইয়াছে। এ দুরন্ত অভিজ্ঞতা যদি না হইত!। ভদ্রাভদ্র অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইয়াছে। সকলেই একই কথা বলেন—"এমন মন্বন্তর কখনহ হয় নাই।" যাঁহারা অতিশয় বৃদ্ধ, তাঁহারা বলেন "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দেখিয়াছি—তাতেও লোকের এত কষ্ট হয় নাই।" আমি জীবনেও মানুষের এমন দুর্দ্দশা দেখি নাই। ৩০টী টাকায় এক হতভাগ্য পুত্র বিক্রয় করিয়াছে।। বিহারী বাবুর এ স্থল পরিত্যাগ এবং আমার আসার মধ্যে ২টা লোক অনাহারে মরিয়াছে!। কিন্তু "অনাহার" নামক একটী রোগের নাম চিকিৎসা-শাস্ত্রে নাই বলিয়া, থানাওয়ালারা, নিতান্ত নাচার হইয়া, অন্য headয়ে এ মৃত্যু গণনা করিয়াছে!

একটী মুসলমান বালককে তাহার পিতা মাতা

আহার দিতে না পারিয়া বাজারে ফেলিয়া গিয়াছিল। আমি তাহাকে নিজস্ব করিয়া লইয়াছি।"

বাবু কুঞ্জলাল ঘোষের তৃতীয় পত্র—২৪শে আগষ্ট, ১৮৯৪—"কালকার মহাযজ্ঞ প্রভু সমাপন করিয়াছেন। প্রায় ১২টার সময় যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, প্রায় ১২০০ (বার শত) ভিক্ষার্থী উপস্থিত। আমার পুঁজি ১২ মোণ চাউল বই নয়। * * * ভাই জগন্নাথ প্রসাদ সাত হাঁড়ি ভাত রান্না করিয়া বালকবালিকাদিগের কান্না থামাইলেন। তার পর বস্ত্র দানের পালা। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর কার্য্য। ৮৫ খানা কাপড় ভাণ্ডারে ছিল। আপনাদের নির্দ্দিষ্ট কয়েকজনকে পূর্ব্বেই দিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। অবশিষ্ট লোক লিষ্ট এবং চেহারা দেখিয়া মনোনীত করি। সকল কাপড় মুহূর্ত্তের মধ্যে নিঃশেষ হইল। লোকের আর্ত্তনাদে থাকিতে না পারিয়া, দুখানি কাপড় এখান হইতে কিনিয়া দিলাম। তারপর একখানি একখানি করিয়া আমার পরিধানের ২ খানি এবং জগন্নাথের ১খানিও দিলাম। আমাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া ও সন্ধ্যা হইয়া গেল দেখিয়া সকলে সে দিনের মত গৃহে ফিরিয়া গেল। সমস্ত দিন ব্যাপী নিদারুণ মনোবেদনায় আর আহার করিতে প্রবৃত্তি হইল না। পিতাকে ডাকিয়া শয্যায় আশ্রয় লইলাম। * * * সে দিন জগন্নাথ প্রসাদ ৮।১০ খানি গ্রাম পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। যে সমাচার পাইয়াছি, তাহাতে প্রাণ অস্থির হয়। নৌকার অভাবে অনেক লোক সাহায্য লইতে পারিতেছে না। কেহ তিন দিন, কেহ চারি দিন খায় নাই, কেহ চাউলের ভুষী, কেহ নাইল ও কচু এবং পাতা সিদ্ধ করিয়া খাইয়া কোন প্রকারে বাঁচিয়া আছে। জগন্নাথ এক মোণ চাউল লইয়া গিয়াছিল, তাহাদিগকে দিয়া আসিয়াছে। মধ্যবিধ ঘরের স্ত্রীলোক কেহ কেহ ছেঁড়া কাঁথা পরিয়া তাহাকে দুঃখ জানাইতে আসিয়াছিল। ইহারা ঘরের বাহির হইতে পারে না—আর ভিক্ষায় আসিবে কি।।

*** আর একটী বিশেষ কথা। অনেক লোক ৪।৫ তোলা রূপা বন্ধক রাখিয়া একটী টাকা মাসিক ৵০ সুদে কর্জ্জ লইতেছে। বহু সংখ্যক লোক যথাসর্ব্বস্ব বন্ধক দিয়া এইরূপ ঋণ গ্রহণ করিয়াছে। পূর্ব্বে এক বিঘা জমি বন্ধক রাখিয়া ২০।২৫ টাকা পাইত, এবার ধান সহিত এক বিঘা জমি বন্ধক রাখিয়া মাত্র ৫ টাকা পাইতেছে। বহু সংখ্যক লোক এই প্রকার করিতেছে। ইহার পরিণাম ইহাই দেখিতেছি, ধান উঠিবা মাত্র এই সমস্ত লোক ঋণদায়ে সর্ব্বস্বান্ত হইবে এবং আগামী বৎসরও ইহারা অনাহারে মরিবে। আমার বোধ হয়, এ অত্যাচার গবর্ণমেণ্টে জ্ঞাপন করা উচিত। এরূপ সর্ব্বনেশে সুদের হার কখনই ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। সুহৃদ্‌সভা হইতে ত্বরায় গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন প্রেরিত হওয়া কর্ত্তব্য। আগামী বৈশাখ মাসের মধ্যে যাহারা ঋণ শোধ করিতে পারিবে, তাহাদিগের নিকট হইতে ন্যায্য সুদ আদায় করা হয়, এই প্রকার বন্দোবস্ত হওয়া কর্ত্তব্য। নতুবা আগামী বৎসরও এইরূপ দুর্দ্দশা দেখিতে হইবে এবং দুর্ভিক্ষের সাহায্য করিতে হইবে।"

বাবু হরিমোহন ঘোষালের দ্বিতীয় পত্র, মাদ্রা, ২২শে আগষ্ট,—১৮৯৪,—"সঞ্জীবনীতে আপনার চিঠি দেখিয়া কেহ কেহ অতিরঞ্জিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কেহ কেহ একেবারেই অবিশ্বাস করিয়াছেন, এজন্য আপনি দুঃখিত হইয়াছেন। কিন্তু আমি দুঃখিত হইবার কোন কারণ দেখি না। কারণ ঘরে বসিয়া বিজ্ঞের ন্যায় এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা এদেশের লোকের স্বভাব। একজন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া, নানারূপ কষ্ট সহ্য করিয়া, লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়া তাহাদের শোচনীয় অবস্থা স্বচক্ষে দেখিলেন এবং তাহা মোচনের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, আর স্বীয় গৃহ প্রাচীরের সীমানায় যাহারা বাহির হয় নাই, অনায়াসে তাহারা তাহা অতিরঞ্জিত বলিয়া অবিশ্বাস করিল। এরূপ বিজ্ঞতা প্রকাশ আমাদের দেশেই সম্ভব।

আমি দৃঢ়তার সহিত আহ্বান করিতেছি, কে আসিবেন আসুন, অনাহারে লোকের কেমন ভয়ানক আকৃতি হইয়াছে, একবার আসিয়া দেখুন। স্বামী উদরের জ্বালা ও পরিজনের কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, আর দুঃখিনী রমণী সন্তান গুলিকে লইয়া এবাড়ী ও বাড়ী জল ঝাঁপাইয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছে, কেহ এক মুষ্টি অন্ন দিতেছে না, শেষে পাটপাতা, শালুক, কলা সিদ্ধ খাইয়া কোনও মতে সন্তান গুলিকে রাখিয়াছে, নিজে মৃতপ্রায়, এ ভয়ানক

দৃশ্য কে দেখিতে চাহেন, আসুন এই খানে, আমি এরূপ কত পরিবার দেখাইয়া দিব। আমি মাদ্রা, ব্রাহ্মণদি, ঝাউদি, কলাইমারা প্রভৃতি এগার খানা গ্রামের অধিকাংশ লোকের বাড়ীতে গিয়া দেখিয়াছি, তাহারা অনেকেই একবেলা খাইতে পায় না। এই সকল লোক যদি এখন সাহায্য না পায়, তবে মারা যাইবে। * * * * * যদি কেহই সাহায্য না দেন, তবে অবিলম্বে আমি এস্থান পরিত্যাগ করিব, লোকের এ কষ্ট আর দেখা যায় না। সর্ব্বদা দলে দলে লোক আসিয়া আমার নিকট কাঁদিতেছে, তাহাদের চেহারা দেখিলে পাষাণও গলিয়া যায়। কাল এরূপ প্রায় ২৫ জন দুঃখীকে ফিরাইয়া দিয়াছি, কিছু ছিল না। প্রাণে যে কি যাতনা পাইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। * * *

অধিকাংশ স্ত্রীলোকেরই কাপড় নাই, লজ্জায় ঘরের বাহির হইতে পারে না। আমি তাহাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া কাপড় দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি। আপাততঃ এক শত খণ্ড কাপড় চাই। মহালানবিশ মহাশয়কে লিখিয়াছি, আপনিও দেখিবেন, শীঘ্র এই কাপড় চাই। সমাজ দিতে না পারিলে, আপনারা যেরূপেই হউক, যোগাড় করিয়া দিবেন।"

আমার কথা যাঁহারা অবিশ্বাস করিয়াছেন, তাঁহারা এই সকল পত্র পড়িয়া কি বলিবেন, জানি না। বোধ হয়, অনেকের অবিশ্বাস দূর হইবে। এই দারুণ বর্ষার সময় ঘরের চালে ছোন নাই, বেড়া নাই, অনাবৃত স্থানে, বর্ষার ধারা মাথায় পাতিয়া লইয়া ছেলে মেয়ে সহ কত পরিবার অনাহারে থাকিতেছে, সংখ্যা নাই। পূজা আসিতেছে, বঙ্গে মহা আনন্দ-উৎসবের আয়োজন হইতেছে; ঠিক এই সময়ে, কত পরিবার মৃত্যু-সঙ্কটে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে! সহৃদয় ব্যক্তিগণ মহোৎসবের খরচের তালিকায়, নিরন্নদিগের জন্য কিছু কিছু লিখিবেন, এই তাঁহাদের শ্রীচরণে অনুরোধ। নচেৎ চক্ষের জলে, উষ্ণ নিশ্বাসে বঙ্গ ডুবিয়া যাইবে। যিনি যাহা দিবেন, তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী,
২১০।৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

চিকিৎসা-সম্মিলনী।—৯ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা। কবিরাজ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বহু দিন হইতে এই পত্রিকাখানি যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে। ডাক্তারী, কবিরাজী, উভয়বিধ চিকিৎসা-প্রকরণ ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু এ সকল কথা বলিবার জন্য এ সমালোচনা করিতেছি না। এই সংখ্যায়, দেশীয় স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের ভোজনানুসারে সত্বাদি গুণভেদ সম্বন্ধীয় চরক হইতে কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া অতি সুন্দর মত অভিব্যক্ত হইয়াছে। শ্লোকগুলি এত সুন্দর যে, পড়িলে বিমোহিত হইতে হয়। আমাদের ইচ্ছা ছিল যে, প্রবন্ধটী আমূল উদ্ধৃত করি, দুঃখের বিষয়, স্থান হইল না। দুটী শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম, পাঠকগণ ইহাতেই বুঝিতে পারিবেন, শ্লোকগুলি কেমন সুন্দর—

"শুদ্ধস্য সত্বস্য সপ্তবিধং ভেদাংশং বিদ্যাৎ কল্যাণাংশত্বাৎ তৎ সংযোগাত্তু ব্রাহ্ম্যমত্যন্তশুদ্ধং ব্যবস্যেৎ।"

অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ত্বের সপ্ত প্রকার ভেদ জানিবে; তন্মধ্যে ব্রাহ্মসত্ব শুভকারী ও অত্যন্ত শুদ্ধ বলিয়া জানিবে। নিম্নে শুদ্ধসত্ত্বের সাত প্রকার ভেদ ও লক্ষণ বলা হইতেছে।

"শুচিং সত্যাভিসন্ধং জিতাত্মানং সংবিভাগিনং জ্ঞানবিজ্ঞানবচনপ্রতিবচনসম্পন্নং স্মৃতিমন্তং কামক্রোধলোভমানমোহের্ষ্যামর্ষাপেতং সমং সর্ব্বভূতেষুব্রাহ্ম্যংবিদ্যাৎ।"

অর্থাৎ যিনি শুচি, সত্যসন্ধ, জিতেন্দ্রিয়, যাঁহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিভাগ করণে উৎকৃষ্ট বুদ্ধি বিদ্যমান থাকে, যিনি জ্ঞান, বিজ্ঞান, বচন ও প্রতিবচন বিষয়ে উৎকৃষ্ট শক্তিসম্পন্ন, স্মরণশক্তি বিশিষ্ট, যিনি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঈর্ষা এবং অমর্ষ প্রভৃতি দোষে দূষিত নহেন, এবং যাঁহার সর্ব্বভূতেই সমান জ্ঞান, তাঁহাকে ব্রাহ্ম্য বলিয়া জানিবে।"

স্থানাভাব প্রযুক্ত অন্যান্য পুস্তকের সমালোচনা কম্পোজ হইয়াও এবার গেল না; গ্রন্থকারগণ ক্ষমা করিবেন।